বাঙ্গালার ধর্ম্ম-গুরু

দ্বিতীয় খণ্ড

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধিহুমে আধ্।
তুলসী সঙ্গত্ সন্তকি হরে কোটি অপরাধ্॥

বাঙ্গালীর বল, বাঙ্গালার ধর্ম্ম-গুরু—প্রথম খণ্ড, দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালী, আশী দিনে ভূপ্রদক্ষিণ, মৃত্যুর পরপারে প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রণেতা
সাহিত্য-সরস্বতী, পুরাতত্ত্বরত্ন, বিদ্যাভূষণ

রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ

সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
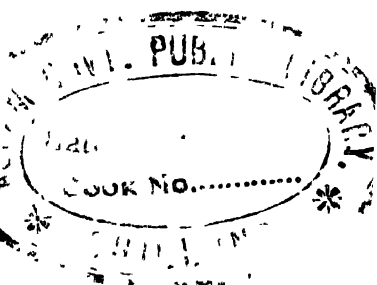
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
১৩৫৪

মূল্য—তিন টাকা

প্রকাশক
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
৭৭, হ্যারিসন রোড কলিকাতা

মুদ্রাকর—
শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩ এ, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা

ওঁ

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বাঙ্গালীর বল (২য় সংস্করণ)	৪৲
বাঙ্গালার ধর্ম্ম-গুরু, প্রথম খণ্ড (সচিত্র)	৩৲
শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত	॥০
বাঙ্গালার প্রতাপ	॥০
রাণী ভবানী	১৲
আশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ (সচিত্র)	১॥০
বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ (সচিত্র)	১॥০
পাতালে (সচিত্র)	১॥০
চন্দ্রলোকে যাত্রা (সচিত্র)	১৲

বিষয় সূচী

অবতরণিকা

পংচ পরবান্ পংচ পরধান্।
পংচে পাবহি দরগহি মান ॥
পংচে শোহৈ দর্ রাজান্।

....

যে কো কহৈ করৈ বিচার।
করতে কি করণৈ নহি সুমার ॥

(জপজী—গুরু নানক)

সত্য, সন্তোষ, দয়া, ধর্ম ও শৌচগুণযুক্ত সাধুগণ (পংচ) পবিত্র (পরবান্) এবং সর্ব্বদা মাননীয় (পরধান্); শ্রীহরির দ্বারেও (দরগহি) তাঁহারা সম্মান (মান) পাইয়া থাকেন এবং রাজ রাজেশ্বর শ্রীভগবানের (রাজান্) দ্বারকে (দর্) সুশোভিত করিয়া (শোহৈ) অধিষ্ঠিত রহেন। যদি কেহ তাঁহাদিগের কথা কহিতে যায় (যে কো কহৈ)—ভগবান্ যে সাধুদিগের মধ্যে অপার (নহি সুমার) গুণরাশি সম্মিলিত করিয়াছেন, ভগবানের (করতে) সেই কার্য্যেরই (করণৈ) সে ব্যক্তি বিচার করিয়া থাকে (করৈ বিচার)।

এই 'পংচ' বা সাধু সঙ্গ একান্তই দুর্লভ। ইচ্ছা করিলেই যে উহা লাভ হয় তাহা ত নহেই—অনেক সময় চেষ্টা করিলেও হয় না। সংসারাশ্রমের বদ্ধজীব আমরা, নানা বিঘ্ন আসিয়া আমাদিগের সাধু-সঙ্গের পথ রোধ করে। কিন্তু পরম শ্রেয়োলাভের জন্য "মহাপুরুষসংশ্রয়" তেমনিই প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন "মনুষ্যত্ব" এবং "মুমুক্ষত্বের"।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। সাধু-সঙ্গ করিতে করিতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। সাধু-সঙ্গ—যেমন চাল-ধোয়ানি জল। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে তাকে যদি চালের জল খাওয়ান যায় তা' হ'লে তার নেশা কেটে যায়। সেইরূপ সংসার-মদে যারা মত্ত হয়েছে তাদের নেশা কাটবার একমাত্র উপায় সাধু-সঙ্গ সাধু ও ভক্ত দেখলে

ভগবানের উদ্দীপন হয়। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। মন কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক দিয়েছ, তাই সর্ব্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধু-সঙ্গ প্রয়োজন।"

মহাতাপস শ্রীশ্রীমৎ বালানন্দ স্বামিজি একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন— 'দূর দূরান্তরে যাইয়া যদি সৎসঙ্গ লাভ করিতে না পার, ঘরে বসিয়াই সৎসঙ্গ করিবে। তোমরা ত বিদ্বান্—শাস্ত্র-গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিবে, তাহা হইলেই ত ব্যাস, বাল্মীকি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি ঋষিদিগের সঙ্গ হইবে।' সত্য সত্যই আমরা কামিনী-কাঞ্চনে মন বন্ধক দিয়াছি। সেই বন্ধকী-মনকে উদ্ধার করিয়া ঘরে আনিবার সাধনাই আমাদিগের প্রথম সাধনা। সে সাধনকালে "বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু" যদি কাজে লাগে সেই জন্যই "ধর্ম্মগুরু" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্কলিত হইল। এই কার্য্যে যাঁহাদিগের রচনাবলী আমার সম্বল ছিল তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া এই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রকার দোষ-ত্রুটীর ভার একান্ত নম্রতার সহিত গ্রহণ করিতেছি, কারণ একমাত্র উহাই আমার প্রাপ্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে কয়েকজন মহাপুরুষের কাহিনী বর্ণিত হইল তাঁহারা কেহই আর নশ্বর দেহে বর্ত্তমান নাই। তাঁহাদিগের সঙ্গ করিয়া উপকৃত হইতে ইচ্ছা করিলে কোন-না-কোনও গ্রন্থের সাহায্য লইতেই হইবে। আশা করি "বাঙ্গালার ধর্ম্ম-গুরু" সে বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারিবে।

পরিশেষে নিবেদন, "উদ্বোধনের" কর্ত্তৃপক্ষগণ কয়েকজন মহাপুরুষের চিত্রের ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মহাপুরুষদিগের কৃপা হইলে "বাঙ্গালার ধর্ম্ম[illegible]ও সংকলন করিবার চেষ্টা করিব। নিবেদন ইতি।

অমর কুটীর।
বারাকপুর (২৪ পরগণা)।
কার্ত্তিক—১৩৪৭

বিনীত নিবেদক—
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

বাঙ্গালার ধর্ম্ম-গুরু

দ্বিতীয় খণ্ড

সাধক রামপ্রসাদ

(১)

এমন দিন কি হ'বে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে দু'নয়নে পড়্‌বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে,
আমি তারা ব'লে হবো সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ ;
ওরে শত শত সত্যবেদ
তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে ;
ওরে আঁখি অন্ধ দেখনা মাকে,
মা যে তিমিরে তিমির-হরা॥

হিন্দু-ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে তন্ত্রোক্ত সাধনপথ বহুদিন হইতেই উন্মুক্ত আছে। চৈতন্যরূপিণী [illegible] উপাসনা করিলেই চিত্তের স্থৈর্য্য, দেহের বল, মনের বল ও ব্রহ্মপদ সহজলভ্য হইবে, ইহাই ছিল শক্তি-সাধনার মূল তত্ত্ব। কালক্রমে শক্তি-যজ্ঞ বা তান্ত্রিক উপাসনা নানা কারণে পবিত্রতা হারাইল। এক সময়ে তান্ত্রিক সাধনায় যোগের সহিত ভোগের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। তখন নিবৃত্তিরূপ মহারত্ন লাভের আশাতেই সাধক

প্রবৃত্তির পথে অগ্রসর হইতেন। কারণ, প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তির কণ্টক দ্বারাই উন্মূলিত করিতে হয়। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলি সে সময়ে অদ্বৈত-জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকিয়া সাধকের ব্রহ্মপদ লাভ করিবার পন্থাকে সুগম করিত। কালক্রমে "নানা প্রকার অস্বাভাবিক সাধন-প্রণালী ও ভূত-প্রেতাদির উপাসনা তন্ত্র-শরীরে" প্রবেশ করিল এবং তান্ত্রিক সাধনার পঞ্চ মকার (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন) ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়া তান্ত্রিক সাধককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশুবৎ করিয়া তুলিল। বঙ্গের অদ্বিতীয় তান্ত্রিক-সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার এই অধঃপতিত অবনমিত তান্ত্রিকচর্চ্চাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া পূর্ব্বগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

এমনি সময়ে—মোগল-শাসনের সন্ধ্যায় কলিকাতার ধনাঢ্য জমীদার দুর্গাচরণ মিত্রের ত্রিশ টাকা বেতনের একটি দরিদ্র কেরাণী জগৎমাতার নিকট প্রাণের কামনা নিবেদন করিয়া জমীদারের হিসাবের খাতায় গীত রচনা করিলেন—

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।

আমি যে মা তোমার পুত্র—আমি থাকিতে অপরে পদরত্ন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিবে ইহা আমার অসহ্য।

ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি!

মা, তুমি আমাকে পদরত্নের ভাঁড়ারী করো—আমি যক্ষের ধনের মত সে রত্ন বক্ষে লুকাইয়া রাখিব! জমীদার বাবু হিসাবের খাতা দেখিয়া

মুগ্ধ হইলেন। কহিলেন—"রামপ্রসাদ, আমি তোমাকে মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিব, তুমি কুমার হট্টে (হালি শহর) স্বগৃহে ফিরিয়া যাও এবং সংসারের চিন্তায় আর মন না দিয়া মায়ের সাধনায় নিযুক্ত হও।"

রামপ্রসাদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। তিনি মনিবের নিকট তাহা নিবেদন করিলেন। তাঁহার যেন নূতন নয়ন হইল। মনের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া গেল তখন। তিনি দেখিলেন—তাঁহার হৃদয়বেদীর উপরেই যখন অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী জগজ্জননী বিরাজ করিতেছেন, তখন আর সংসার-সংসার বলিয়া এত চিন্তা কিসের? তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

"মন তুই কাঙ্গালী কিসে?
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে।'
অনিত্য ধনের আসে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে
ও তোর ঘরে চিন্তামণি-নিধি, দেখিস্ নারে বসে বসে।"

রামপ্রসাদ গৃহে আসিয়া গৃহসংলগ্ন একটি নির্জ্জন স্থানে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিলেন এবং বীরাচারে তান্ত্রিক সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সাধনা করিতে বসিলেই ত করা যায় না—নাম করিতে করিতেই মন হঠাৎ কোথায় উড়িয়া যায়, কে জানে? বহুদিনের বিস্মৃত ঘটনা, বহু-দিনের বিস্মৃত মূর্ত্তি, বহুদিনের বিস্মৃত চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে! সাধনকালে রামপ্রসাদের যখন ঐরূপ হইতে লাগিল তখন তিনি মাকে তাহা জানাইয়া কাঁদিয়া গাহিলেন—

"আমি ঐ খেদে খেদ করি।
(ঐ যে) তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা-ঘরে হয় চুরি।"

মা সদয়া হইয়া তখন পুত্রের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্থির করিয়া দিলেন। রামপ্রসাদের 'জাগা-ঘরে চুরি' বন্ধ হইল।

(২)

রামপ্রসাদের সাধনা ছিল ভক্তিমূলক। তাঁহার মন্ত্র ছিল গান। তিনি তাই গাহিতেন—"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।" রামপ্রসাদ ছিলেন দরিদ্র অথচ তাঁহার সংসারটি একেবারে ক্ষুদ্র ছিল না—মাতা, স্ত্রী, দু'ইটি কন্যা ও একটি পুত্রকে ভরণপোষণ করিতে হইত। ইহা ভিন্ন অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও ছিল। তাই সংসার-চিন্তা যখনই তাঁহাকে ইষ্ট-চিন্তা ভুলাইয়া দিত তখন তিনি মনকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন—

"ছি ছি মন তুই বিষয়-লোভা
কিছু জাননা, মাননা, শুনো না কথা।"

কখনও বা গাহিতেন—

"তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে,
আমাকে দিতেছ ফাঁকি।"

মনকে এইরূপে তীব্র কষাঘাত করিতে করিতে তিনি বলিতেন—

"মন হারালি কাজের গোড়া,
তুমি দিবা নিশি ভাব বসি,
কোথায় পাবে টাকার তোড়া।"

বোঝ মন,—

"চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।"

ইহারই নাম সদসৎ বিচার। যে উহা করিতে পারে সে-ই বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হয়। ভক্ত তুলসী দাস বলিতেন—কয়লা যাহা শত বার ধৌত করিলেও বিমল হয় না তাহারও "ময়লা ছুটে, যব্ আগ্ করে পর্বেশ"—সাধকের অশ্রু সেই অগ্নি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মন-কয়লাকে আগুনের রঙ্গে রাঙ্গাইতে হয়—নতুবা যে কালো কয়লা সেই কালো কয়লাই থাকিয়া যায়।

রামপ্রসাদ মনের দুঃখে কখনও বা মাকে জানাইতেন—

"আমি এত দোষী কিসে?
ঐ যে প্রতিদিন হয়, দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি ব'সে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়া-পাশে॥

কখনও বা গাহিতেন—

"মাগো তারা ও শঙ্করি!
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
কর্‌লে দুঃখের ডিক্রী জারি।"

মায়ের দুলাল এমনি করিয়া মায়ের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতেই মার কৃপায় যখন মনে বল পাইতেন—তখন ক্ষিপ্র করে চোখের জল মুছিয়া মাতৃস্নেহের উপর অসীম নির্ভরশীলতার বলে সতেজ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিতেন—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।

তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
দুঃখ দিয়ে বাজার মিলাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই।"

রামপ্রসাদ জানিতেন—দুঃখই জননীর স্নেহের দান। সে দান যে সন্তান পাইয়াছে, সে সেই দুঃখ লইয়া বড়াই করিবে না ত কি? সংসারের সুখ—এই আছে এই নাই। অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, বিসর্জ্জনে দুঃখ। কিন্তু সুখ না পাইয়া দুঃখই পাইয়াছে যে, সে জানে, সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বালিয়া সে যদি মাতৃ-প্রতিমার আরতি করিতে পারে তাহা হইলে চরমে যে পরম সুখের বীণা তাহাকে ঘিরিয়া বাজিয়া উঠিবে—তাহার ঝঙ্কার আর কখনও থামিবে না। তাহাই প্রেম-ভক্তির শেষ পরিপূর্ণতা, পরীক্ষার অন্তে সাধকের শেষ বিজয়-গৌরব। ভক্ত তাই নিরন্তর বলেন—

"তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধার।
জননীগো, গাঁথবো তোমার গলার মুক্তাহার।
চন্দ্র সূর্য্য পায়ের কাছে মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার।"

(৩)

কালী, কালো-বরণী এলোকেশী—অন্ধকারের পর পুঞ্জীভূত অন্ধকার! ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"দূরে ব'লে কালীরূপ কি শ্যামারূপ চৌদ্দপোয়া দেখায়। সূর্য্য দূরে ব'লে ছোট দেখায়। কাছে গেলে এত বড় দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামারূপ দূরে ব'লে শ্যামবর্ণ দেখায়। যেমন দূর থেকে দিঘীর জল সবুজ, নীল বা কালো।" আমরা দূরে থাকিয়া তর্কের দ্বারা—বিচারের দ্বারা,

প্রবচনের দ্বারা সেই মহাকালীকে জানিতে চাই! কিন্তু তাঁহাকে বিচার করিয়া কে জানিতে পারিবে? তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য। ভক্ত রামপ্রসাদ জানিতেন, কোনও একটি ভাব আশ্রয় না করিলে, অনন্ত চিদানন্দ-সাগরের সেই বিপুল তরঙ্গকে কে বুঝিবে? ভক্ত তাই গাহিতেন—

"মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত—আঁধার ঘরে॥"

সেই বিরাট বিশাল—তালের পর তাল-সমান অন্ধকারে কি বিচারের ক্ষীণ আলোক-রেখা প্রবেশ করিতে পারে? সে রেখা যে অন্ধকারে নিজেই হারাইয়া যায়।

"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অ-ভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
ষডদর্শন পেলেনা, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥"

'ভাব' সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাক্‌তে হয়। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ। মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।' ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা ক'রে ধরা চাই—তবে তো হবে। ভাব কি জান?—তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান—এরই নাম। সেইটে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন—তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি: এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি—এইটি খেতে শুতে বস্‌তে সব সময় স্মরণ রাখা। আর এই যে বামুন আমি, কায়েৎ আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, এ সব হচ্ছে অবিদ্যার আমি; এগুলোকে ছাড়তে হয়, ত্যাগ কর্‌তে হয়—ওগুলোতে অভিমান—অহঙ্কার বাড়িয়ে বন্ধন এনে দেয়। স্মরণ-মননটা সর্ব্বদা রাখা চাই, খানিকটে মন সব সময়, তাঁর

দিকে ফিরিয়ে রাখ্‌বে—তবে তো হবে। একটা ভাব পাকা ক'রে ধ'রে তাঁকে আপনার ক'রে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চল্‌বে। ঐ দ্যাখ না প্রথম প্রথম একটু আধটু ভাব যতক্ষণ, 'আপনি মশাই' ইত্যাদি লোকে বলে থাকে; সেই ভাব যেই বাড়্‌ল, অমনি 'তুমি তুমি'—আর তখন আপনি-টাপ্‌নিগুলো বলা আসে না; যেই আরও বাড়্‌ল, আর তখন তুমি-টুমিতেও সানে না—তখন, 'তুই মুই'! তাঁকে আপনার হ'তে আপনার ক'রে নিতে হবে, তবে তো হবে। যেমন নষ্ট মেয়ে, পর-পুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাস্‌তে শিখ্‌চে—তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা; তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠ্‌লো, তখন আর কিছু নেই! একেবারে তার হাত ধ'রে সকলের সাম্‌নে কুলের বাইরে এসে দাঁড়ালো!......যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার ক'রে নিয়েছে, সে তাঁর ওপর জোর ক'রে বলে—তোর জন্য সব ছাড়লুম্‌ এখন দ্যাখা দিবি কি না বল্‌?"(১)

ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ পাইয়াছিলেন—'তুই ভাবমুখে থাক্‌।' সাধক রামপ্রসাদের সাধনার মন্ত্র গানগুলি আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়, তিনিও শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ পাইয়াছিলেন—"ভাবমুখে থাক্‌।" ভাবমুখে থাকার অর্থ হইতেছে এই—"মনে সর্ব্বতোভাবে সকল সময়, সকল অবস্থায়—দেখা, ধারণা বা বোধ করা যে আমি সেই 'বড় আমি' 'পাকা আমি'। ভাব-মুখ অবস্থায় পৌঁছিলে......'আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি', এই কথাটি সর্ব্বদা অনুভব হয়।......'শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা ভাবনা ও পূজা কর?' হনুমান

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

তদুত্তরে বলেন—'হে রাম, যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা, এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি—তুমি প্রভু, আমি দাস, —তুমি সেব্য, আমি সেবক,—তুমি পূজ্য, আমি পূজক ; যখন আমি মন, বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ,—আর যখন আমি উপাধিমাত্র-রহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি—তুমিও যাহা আমিও তাহা,—তুমি আমি এক—কোনই ভেদ নাই।" সাধক রাম-প্রসাদও সর্ব্বদা এইরূপই দেখিতেন এবং ভাবে আত্মহারা হইয়া গাহিয়া উঠিতেন—

"মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥"

সাধকের এই অবস্থাই ব্রহ্মজ্ঞানের চরম অবস্থা, তাই "শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।"

(৪)

রামপ্রসাদ যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে যুগ ছিল শৈবে শাক্তে, সৌরে গাণপত্যে বিরোধের যুগ। সে যুগের সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় বর্ত্তমান আছে। ক্ষুদ্র যে সে-ই ভেদ করে—বৃহৎকে বৃহৎ বলিয়া জানে না যে, সে-ই শুধু তাহাকে অজ্ঞাতে খণ্ডিত করিয়া নিজের মনের মাপে গঠন করিয়া লইতে চাহে এবং বিশ্বাস করে যে, সে-ই অনন্ত অখণ্ড অসীম—তৎকর্ত্তৃক খণ্ডিত বস্তুটি মাত্র। রামপ্রসাদ মহাসাগরের দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—তেত্রিশ কোটী দেব-দেবী সেই মহাসাগর বক্ষে এক একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র—সাগরবক্ষে কোন্ দিকে যে কত তেত্রিশ কোটী তরঙ্গ নাচিতেছে, তটে

দাঁড়াইয়া মানব তাহার কয়টি দেখিবে? ভক্ত তাই উদার হৃদয়ে গাহিতেন—

"মন ক'রো না দ্বেষা-দ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥"

আবার কখনও বা কালী-কৃষ্ণ এক করিযা বলিতেন—"শ্যামা হলি মা রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে।" এইরূপ উদার ধর্ম্মমত রাম-প্রসাদের যুগে একটা অসম্ভব বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। তিনি যেমন শ্যামা, শ্যাম ও রামে বিভেদ করিতেন না, তেমনি প্রথমে ছিলেন সাকারবাদী, কিন্তু পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আবার বলিতেন —"ওরে শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা।" সাধনার উহাই চরম পরিণতি। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলিয়া গিয়াছেন—"তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে। আরও কি তা কে জানে? কেউ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেউ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায়। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আবার আরও কত আকার আছে, তা' কে বল্‌তে পারে।"

সাধনার কালে কেহ কেহ আসিয়া পরামর্শ দিল—'রামপ্রসাদ, তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া আইস, নতুবা মনের কালি দূর হইবে না।' রামপ্রসাদ শুনিলেন—মনকে কহিলেন—"তীর্থে গমন, মিথ্যে ভ্রমণ, মন উচাটন ক'রো নারে।" তাঁহার তীর্থে যাওয়া হইল না। তিনি গাহিয়া উঠিলেন, মন—

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান,
নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,

ওরে নগর ফির মনে কর,
প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে।"

তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া ফল কি? মা যে অন্তরে—বাহিরে—সর্ব্ব ঘটে!

"মন রে আমার এই মিনতি,
তুমি পড়া-পাখী হও করি স্তুতি।"

নিরন্তর ডাক মন—মা মা—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে—!

(৫)

সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদের নাম যখন চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল—যখন "চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা", তখন শত শত নর নারী, ধনী নির্ধন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণনগরাধিপতিও ছিলেন একজন। ভক্ত ও কবি রামপ্রসাদ তাঁহাকে স্বরচিত গীত শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজ পুলকিত হইয়া রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলাও তাঁহার কালীকীর্ত্তন শুনিয়া পরম পুলকিত হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ ছিলেন জন্মকাল হইতেই কবি। কবিতার ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের গান বাজিয়া উঠিয়া অর্ঘ্যের মত ইষ্টের চরণে ঝরিয়া পড়িত। শাস্ত্র বলেন—"গানাৎ পরতরং নহি।" ভক্ত রামপ্রসাদ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদ তাঁহার মাকেই সম্মুখে রাখিয়া গান গাহিতেন—মার পটের সম্মুখে নহে—তাই রামপ্রসাদের কণ্ঠে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণ বাজিয়া উঠিত। রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর" এবং অন্যান্য গ্রন্থ এখন আর জনসমাজে পরিচিত নাই। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে ততদিন সে অবসন্ন হৃদয়ে তাঁহারই গান গাহিতে গাহিতে মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিবে—

"মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ॥"

মার দয়া যে পাইল না তাহার নিত্যদিনের চরম দুঃখই এই—"গতাগতি পুনঃ পুনঃ।"

(৬)

রামপ্রসাদ যদিও অল্প বয়সেই কুলগুরু মাধবাচার্য্যের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা ছিলেন সেকালের সুপ্রসিদ্ধ প্রগাঢ় পণ্ডিত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁহারই শিক্ষার গুণে রামপ্রসাদ তান্ত্রিক-সাধনায় স্তরে স্তরে উচ্চে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তিনি যোগী হইয়াছিলেন—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সুদীর্ঘ পনেরটি বৎসর লাগিয়াছিল। কোনও সাধনমার্গই সহজ নহে—এবং সকল পথেই উত্থান পতন, কখনও আশা, কখনও বা নিরাশা—কখনও সন্তোষ, কখনও দুঃখ—কখনও ভয়, কখনও বা পরিপূর্ণ আনন্দ সবই আছে। রামপ্রসাদকেও সেই সকল পরীক্ষার ভিতর দিয়া অতিশয় দৃঢ় চিত্তে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে মদ্যপ বলিয়া ধিক্কার দিত, কেহ বা তাঁহাকে লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগী একটা ভীষণ জীব বলিয়া মনে করিত! কিন্তু তিনি এ সকল লোকনিন্দা অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন। নিন্দাকেও যেমন তিনি গণিতেন না—কখন কখনও তাঁহার মাকেও তেমনি তিনি মানিতেন না—মাকে বলিতেন, 'আমি কি আটাশে ছেলে, ভয় করি না চোখ রাঙ্গালে।' কখনও আদর, কখনও স্তব,

কখনও আব্দার কখনও বা অভিমান, কখনও আবার তীব্র শ্লেষে বলিতেন—

"মা হওয়া কি মুখের কথা,
এখন ক্ষুধার বেলা শুধালে না—
এল পুত্র গেল কোথা।"

বলিতেন—

"জানিগো জানিগো তারা,
তোমার যেরূপ করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা॥"

কখনও কাতর প্রার্থনা, কখনও রোষ প্রদর্শন, কখনও বা—"এবার কালী তোমায় খাবো" কিছুই বাদ যাইত না! তিনি জগতের মাকে নিজের মার মত পাইয়াছিলেন—শুধু অন্তরে নহে, অন্তরে এবং বাহিরে; জগতের নারীতে তিনি সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখিতেছিলেন। মায়ের ছেলে বলিয়াই মায়ের কাছে তাঁহার যত জোর ছিল, এত জোর আর কাহারও উপর চলিত না! মাও ছিলেন পুত্রের স্নেহময়ী জননী—প্রয়োজন হইলে রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধরিয়া তিনি তাঁহার সহিত বেড়া বাঁধিতেও বসিয়া যাইতেন এবং পুত্রের মধুমাখা কণ্ঠে মায়ের গান শুনিতেন। ধন্য মা—ধন্য পুত্র।

রামপ্রসাদ গাহিতেছেন—

"মা মা ব'লে আর ডাক্‌ব না
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা ধরো এলোকেশী,
(না হয়) ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাবো
মা ব'লে আর কোলে যাব না।"

যখন এই গান শুনি তখন মনে হয়—একি অভিমান? না দুঃখ-নিবেদন? না পুত্রের হৃদয়ের মূর্ত্তিমন্ত মাতৃপ্রেম—যাহা রক্তজবার অঞ্জলীর মত রামপ্রসাদের পূজাব বেদীর উপর নিত্য নিত্য বর্ষিত হইত। অনেক পুত্রই ত মার উপর অভিমান করে—কিন্তু এমন সুখ-দুঃখের গাঁথা মালা কোনো পুত্র কখনও তাহার জননীর চরণে অর্পণ করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। পুত্র বলিতেছেন—আর আমি তোমাকে মা বলিয়া ডাকিব না—মাতৃবক্ষবিলাসী পুত্র মাকে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক কঠিন আঘাত কবিতে পারে? এমন আঘাত পাইয়া কোন্ মা-ই বা পুত্রের দেহের ধূলা ঝাড়িয়া তাহাকে ক্রোড়ে না তুলিয়া লইয়া থাকিতে পারেন? যেমন মা তেমনি ছেলে—যেমন ছেলে তেমনি মা। পুত্র রামপ্রসাদ ডাকিলেন—"মা, মা—!" অমনি মা আর ভ্রুকুটী-কুটিলা করালবদনা বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধানা মহাকালী রহিলেন না—রহিলেন না তখন তিনি শুষ্কমাংসাতিভৈরবা অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা নিমগ্নারক্তনয়না—রহিলেন না তিনি আর নাদাপূরিতদিঙ্মুখা চণ্ডী। সে মা তখনই হইলেন বিশ্বাত্মিকা বিশ্বেশ্বরী বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বার্ত্তিহারিণী লোকানাং বরদা—সে মা তখনই হইলেন লক্ষ্মী, কল্যাণী, সর্ব্বাণী, জ্যোৎস্নারূপিণী—সে মা তখনই হইলেন—সর্ব্বভূতেষু দয়া, সর্ব্বভূতেষু তুষ্টি, সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধা, সর্ব্বভূতেষু শান্তি—সে মা তখনই হইলেন রামপ্রসাদের মা, সর্ব্বভূতের মা! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তখন মাতৃময় হইয়া উঠিল; রামপ্রসাদ দুঃখ অভিমান রোষ সমস্তই ভুলিয়া অমনি গাহিয়া উঠিলেন—

"মন তোর এত ভাবনা কেনে,
কালী জপরে হৃদি-পদ্মাসনে।
মাটি ধাতু পাষাণ মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
এখন মনোময় প্রতিমা গড়ি' পূজা কর মনে মনে।"

তাঁহার হৃদয় সিংহবিক্রমে ঘোষণা করিতে লাগিল—

"কালী নামের গণ্ডী দিয়ে আমি আছিরে দাঁড়ায়ে।
কটু বল্‌বি সাজা পাবি শমন, মাকে দিব ক'য়ে ॥"
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমি ত আটাশে নই—
এ যে ছেলের হাতের মোয়া নয়, খাবি ভেল্কি দিয়ে ॥"

মায়ের উপর ছেলের চূড়ান্ত নির্ভরশীলতার পরিচয় নাই কি এই গানে? নাই কি এই গান সেই?—

"ন্যাংটা মেয়ে কালী।
দোষ করিলে রোষ করে না তারেই ত মা বলি ॥"

(৬)

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথিত হয় যে—"অবতারকুলে যে সকল বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য, শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ শাস্ত্রে এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে সকল ইঁহাতে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে) এত গুপ্তভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করিয়া ইঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে, ইঁহাকে দুই চারি বার ভাসা ভাসা, উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারই ঐ সকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না।" একজন একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিল—"ঠাকুর, আপনি কি খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার হ'তে পারেন?" ঠাকুর এই সিদ্ধাইয়ের কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন—"আমার কি আধ্ পয়সার সাধনা যে খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার হবো?" রামপ্রসাদেরও মন সেই রকমের ছিল। তিনি জানিতেন খেয়া ঘাটে অর্দ্ধ পয়সা মাত্র পারাণী দিলেইত পার হওয়া যায়; প্রাণান্ত তপশ্চরণ করিয়া যদি সেই অর্দ্ধ পয়সা বিত্ত লাভই শেষ ফল হয় তবে আর তপস্যা কেন! সাধনে যাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারাই

বিভূতি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া থাকেন—উহা আপনা হইতেই আসে। যাহারা সেই কাচ গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হয়, তাহারা কাঞ্চন হারায়। সিদ্ধাই যোগভ্রষ্টকারী।' রামপ্রসাদের সম্বন্ধেও অনেক বিভূতি লাভের গল্প প্রচলিত আছে। সে সকল গল্পের কতক নিশ্চয়ই সত্য এবং কতক হয়ত ভক্তদিগের কল্পনার সামগ্রী—কারণ ভক্তেরা স্বভাবতই আপন আপন গুরুকে সর্ব্ববিষয়ে বৃহৎ ও মহৎ করিয়া প্রচার করিতে চায়। তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও যেমন সিদ্ধাই প্রকাশ করিতেন না, তাঁহার মাকে বলিতেন—"আমার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল কেন মা, আমাকে কালো করিয়া দে। রূপ-টুপ সব ভিতরে প্রবেশ করুক"—রামপ্রসাদও সেইরূপই করিতেন—সিদ্ধাই চাহিতেন না; তবুও সময়ে সময়ে নানা অলৌকিক শক্তি বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ভক্তগণ তাই তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—"প্রসাদ দেব"।

রামপ্রসাদ জন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কহিতেন—"কর্ম্মসূত্রে যা' আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া"—কিন্তু তিনি একান্ত চিত্তে বিশ্বাস করিতেন যে, "কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনও ত" —সুতরাং মা দয়া করিবেনই এবং কর্ম্মবন্ধনও কাটিবেনই। তিনি জানিতেন—মা-ই সব, তিনি যন্ত্র মাত্র। তাই গাহিতেন—

"মন গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেম্‌নি নাচাও তেম্‌নি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা-গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥

প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্রে, সে সুতার কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়া সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল্ খেলিছে ॥',

রামপ্রসাদ গানের অর্ঘ্য দিতে দিতে তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—মাকে পাইলেন, মার সহিত কত কথা কহিলেন, মাকে গান শুনাইয়া নিজে কাঁদিলেন—হয়ত বা মাকেও কাঁদাইলেন, হাসাইলেন এবং শেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুতে পর্য্যন্ত মাকেই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মন বলিতে লাগিল—এই ভাল, এই ভাল। আমি নির্ব্বাণ চাহি না, আমি মুক্তি চাহি না—আমি একটি জলবুদ্বুদ মাত্র—মাতৃপ্রেমের অনন্ত বিরাট চলোর্ম্মিময় বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল তরঙ্গের ফেনপুঞ্জের সহিত মিশিয়া যাইতে চাহি না, আমি চাই—আনন্দ—আনন্দ—নিত্যানন্দ। আমি চাই চিরকাল ধরিয়া সেই অমৃত মদিরার মধুর আস্বাদন, অমৃতের হ্রদে পড়িয়া আমি অমৃত হইতে চাহি না—"সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বলো না।" মাকে একদিন বলিলেন—'মা আমাকে জন্মে জন্মে তোমার পুত্ররূপে আনিও, জন্মে জন্মে তোমার চরণ-পদ্মে ধ্যান-মগ্ন করিয়া দিও, জন্মে জন্মে তোমার কাছে বসিয়া তোমারই শিখানো গান তোমাকে শুনাইতে দিও—আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইও, আর সময় হইলে না হয় এক একবার ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিও।' তিনি গাহিতে লাগিলেন—

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ও মন—
চিনি হওয়া ভাল নয়—চিনি খেতে ভালবাসি।"

যখন সময় আসিল, পুত্রবৎসলা ক্ষণেকের জন্য পুত্রকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ বুঝিলেন শমন আসিয়াছেন। তিনি আনন্দে গাহিয়া উঠিলেন—

"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি,
আমি কি যমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি।"

রামপ্রসাদ মাতৃচরণ ধ্যান করিতে করিতে যেদিন নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সেদিন যে কবে আসিয়াছিল তাহা সঠিক জানা নাই। কিন্তু সমস্ত জীবন ধরিয়া তিনি যে কালী-কীর্ত্তনের সুরতরঙ্গে বাঙ্গালার আকাশকে ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন, বহুদিন পর একদিন সেই সুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভাগীরথীতটে দক্ষিণেশ্বরে দেখা দিয়াছিল। আবার গঙ্গাতটে রামপ্রসাদেরই পিক-কণ্ঠ শুনা গিয়াছিল—

"মন তোমার কি ভ্রম গেল না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তা জান না।"

বামা ক্ষ্যাপা

বামা ক্ষ্যাপা

(১)

ঈশানি, পাষাণী কি মা
হয়েছ অধীনের বেলা।
তারিতে তনয়ে কাতর,
পা তোর দিতে হলি পাথর,—
পিতার ধর্ম্ম রাখ্‌লি মা তোর,
তাই আমায় করিলি হেলা।

উন্মত্তহৃদয়ে বামা ক্ষ্যাপা এই গান গাহিতেন। লোকে বলিত—তিনি ছিলেন দীন-দরিদ্র, তিনি ছিলেন গণ্ডমূর্খ, তিনি ছিলেন বীরভূমির সিদ্ধ তারাপীঠে দ্বারকাতটবিহারী শ্মশানচারী ক্ষ্যাপা! ক্ষ্যাপা ত বটেই—শুচি-অশুচিতে ভেদ ছিল না তাঁহার—খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না তাঁহার—নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল না তাঁহার—ধনৈশ্বর্য্যের কামনা ছিল না তাঁহার—কোনও পাঠশালা বা চতুষ্পাঠীর সঙ্গে কখনও সম্বন্ধ হয়নি তাঁহার। কিন্তু শেষ জীবনে গভীর তত্ত্বকথা তাঁহার হৃদয়ে প্রমুদিত হইত—যেন এক একটি প্রোস্ফুটিত কমল। তিনি বলিতেন—"তারা মা ব্রহ্মও বটে, আবার দয়াময়ী মা-ও বটে—দুই-ই। জ্ঞানীর কাছে যিনি নিরাকার, ভক্তের কাছে তিনি সাকার। নিরাকার সাধনা হয় না, বড় কঠিন—ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্—অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে মন রেখে সাধনা কঠিন ব্যাপার—তাই 'তারা' 'তারা'—মা মা—ব'লে ডেকে বড়ই সুখ পাই। কুসুমিত অতিবৃদ্ধ একটি শাল্মলীতরুর ছায়া-শীতল শ্যামতৃণাচ্ছাদিত ভূতলে বসিয়া 'কালু' কুকুরের কণ্ঠ ধরিয়া

তাহারই সঙ্গে তিনি একত্রে তারা মায়ের প্রসাদ খাইতেন! তিনি ক্ষ্যাপা ছিলেন না ত কি? তাঁহার নির্জ্জন-তপশ্চরণের বিঘ্নকারীকে তিনি কখন কখনও তারাপীঠসংলগ্ন মহাশ্মশানের অর্দ্ধদগ্ধ প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া প্রহার করিবার জন্য দুর্দ্দান্ত ভৈরবের মত ছুটিতেন, তাঁহার বিস্তীর্ণ পিঙ্গল জটাভার তখন ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইয়া উঠিত—কটি হইতে বসন খুলিয়া পড়িত—বিঘ্নকারী ভয়ে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিত! করধৃত কাষ্ঠখণ্ড ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া ক্ষ্যাপা তখন সাশ্রুনয়নে সিক্তহৃদয়ে বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিতেন—

আর কারে ডাক্‌বো শ্যামা
ছেলে কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার
মা বলিব যাকে-তাকে।
মা যদি ছেলেরে মারে,—
ছেলে কাঁদে মা মা ক'রে।
ঠেলে দিলে গলা জড়িয়ে ধরে—
ছাড়ে না, মা যত বকে।

অশ্রুধারার পর অশ্রু ধারা তাঁহার চক্ষু ভিজাইত, উহা চক্ষু হইতে মুখে নামিত, মুখ ভিজাইয়া বুক ভিজাইত—বুক ভিজাইয়া ভূমি সিক্ত করিত। তিনি গাহিতেই থাকিতেন—

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি মা তোর সঙ্গে যাবো—
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর
বাজ্‌বে আমি শুন্‌তে পাবো।

লোকে বলিত—ক্ষ্যাপা কি না? তাই যখন-তখন কাঁদে! শাল্মলী-চূড়ায় পত্রাচ্ছাদিত কুলায় বসিয়া মৌন বিহগ সমাগত সন্ধ্যার অন্ধকারে স্তব্ধ হইয়া এই গান শুনিত—'কুালু' কুকুর পাগলকে ঘিরিয়া অবোধ্য মর্ম্মান্তিক কণ্ঠে আনন্দের রোল তুলিত—দ্বারকার খরতরঙ্গ ছল্ ছল্ কল্ কল্ করিয়া দূর-দূরান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যাইত—ক্ষ্যাপার কণ্ঠে উদ্গীত, ক্ষ্যাপার হৃদয়-রক্তে পরিসিঞ্চিত, ক্ষ্যাপার প্রাণের মূল্যে সমাহৃত ভক্তিচন্দনে অনুলিপ্ত পরমানন্দের সেই গান—

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আ ম মা তোর সঙ্গে যাবো।

লোকে বলিত—তিনি ছিলেন পাগল!

আবার কোনও দিন, অমাবস্যার মহানিশায় তারাপীঠের শ্রীমন্দিরে যখন পূজারি-ক্ষ্যাপা নিজের শিরেই মুষ্টি মুষ্টি রক্তজবার অর্ঘ্য স্থাপন করিতেন, দেবীর চরণে দিতে ভুলিয়া যাইতেন—তখন তাঁহার অশ্রুধারা-সিক্ত বদন হইতে অর্দ্ধোচ্চারিত যে স্তব কম্পিতকণ্ঠে নির্গত হইত—দূর গ্রাম হইতে সমাগত পূজার্থী তাহা বুঝিতে পারিত না বটে, কিন্তু সেই অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে শুনিতেই সে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত—

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্ম-পরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥
—শ্রীশ্রীচণ্ডী—৭।৭-৮।

পরক্ষণেই ক্ষ্যাপার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত, দেহ নিশ্চল হইয়া উঠিত, নয়ন দুইটি স্থির হইত—মুষ্টিবদ্ধ অর্ঘ্যভার মুষ্টি মধ্যেই থাকিত, দেবীপদে পড়িত না। মনে হইত ক্ষ্যাপা আর এ জগতে নাই—পাষাণময়ী

দেবীকে অগ্রে করিয়া পূজার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে আর একটি স্পন্দনহীন পাষাণোপম দেহ! ঘৃতের প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোকধারা তখন সেই স্থির দেহের উপর নৃত্য করিত, শ্রীমূর্ত্তির চরণতলে লুটাইয়া পড়িত, দেবায়তনের গায়ে গায়ে মিলাইয়া যাইত। পূজার্থী সশঙ্কচিত্তে ভাবিত—'ক্ষ্যাপার কাছে কেন আসিলাম! আজ যে আমার মানসিক পূজাই ব্যর্থ হইয়া গেল! ভোগের মত ভোগ পড়িয়া রহিল—নিবেদিত হইল না, আরাত্রিকের পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল, ধূপের আগুন শীতল হইয়া উঠিল!' পূজার্থী ডাকিতে লাগিল—"ঠাকুর! ঠাকুর—!"

কে কাহার ডাক শুনে! অনেকক্ষণ পর—সে যে কতক্ষণ তাহার ঠিকানা ছিল না—ক্ষ্যাপা যখন সহসা নবজীবন পাইতেন—অতিশয় কাতর, অতিশয় ব্যাকুলতা-মাখা বিজড়িত কণ্ঠে তিনি তখন বিড় বিড় করিয়া আপন মনে কি যেন বলিতেন। মনোযোগ দিলে শুনা যাইত তিনি বলিতেছেন—'মা, মা—এসেছিস্? জয় মা, জয় মা—বন্ধুক-কুসুমাভাসাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং—মা মা—ছেলে ফেলে এতদিন কি থাকে গো? তুইত মা বরদা, মঙ্গলা, শিবা—ওমা সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি দূরিতাপহে দৈত্যদর্পঘ্নি অভয়ে,—অদর্শনে ছেলে যে মরে মা! পরক্ষণেই শ্রীমন্দির দেবকণ্ঠনিঃসৃত সুধাসঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত—

যেমন শ্যাম তেমনি শ্যামা, যেমন কালা তেম্‌নি কালী।
ভুবন মোহন যুগল মিলন, অতুলনরূপ নৃত্যকালী॥
পতির হাতে মোহন বাঁশী স্ত্রীর মুখে মধুর হাসি,
মুণ্ডমালা করালীতে, মোহন কালা বনমালী।
ভয় যেমন অভয় তেমন, মায়ের কোলেই জীবন মরণ,
মধুর ভীষণ মিলন যে ভাই, শ্যামে শ্যামায় কালায় কালী॥

পূজার্থী তখন শিরে করাঘাত করিয়া ডাকিত—"ঠাকুর। ও ক্ষ্যাপা ঠাকুর! আমার পূজা যে হ'লো না!"

* * * *

লোকে বলিত—তিনি ছিলেন ক্ষ্যাপ্যা। সত্যই ত তিনি ক্ষ্যাপা ছিলেন; নহিলে ভক্ত আসিয়া যখন প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণমূলে রত্নাদি রাখিত, তিনি তখন ভূষণ-সম্ভার ধূলির মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া নরকঙ্কালের মালা লইয়া ভক্তকে বলিতেন—"এই ছ্যাখ্, আমার কেমন অলঙ্কার! সাত রাজার ধন এক মাণিক—তা'ও কি ইহার তুল্য?"

লোকে যাহা বলিত হয়ত তাহাই ঠিক! নহিলে শৈশবে যখন বামাচরণ খেলিতেন, সে খেলার সঙ্গে ধর্ম্মভাবের সংস্রব থাকিতই—সে খেলা, প্রতিবেশী অন্য বালকের খেলার মত ছিল না। বামাচরণের পিতা সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় অকালে অমরধামে চলিয়া গেলেন। সর্ব্বানন্দপত্নী পুত্র দুইটিকে লইয়া অকুল সাগরে ভাসিলেন—বামাচরণ জ্যেষ্ঠ ও 'পাগল', এবং রামচরণ নিতান্ত বালক। মা বলিলেন—"বামাচরণ, পাগলামি ছাড়িয়া কাজে-কর্ম্মের চেষ্টা দেখ—নহিলে সকলে মিলিয়া অনাহারে মরিব।

বামাচরণের বয়সও তখন খুবই অল্প। তিনি বলিলেন—"হাঁ, তা'ত দেখ্‌তেই হবে।"

পুত্রের এই উত্তর শুনিয়া মাতা সন্তুষ্ট হইয়া নয়নের বারি মুছিলেন। পুত্র কাজ-কর্ম্মের সন্ধানে বাহির হইয়া একেবারে তারাপীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জগজ্জননীর চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিয়া কহিলেন—"মাগো অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরি! তোর ঘরে ত কেউ অনাহারে থাকে না। আমরা কি এক মুষ্টি প্রসাদও পাব না?"

জগজ্জননী শুনিলেন কি না, কে জানে? তবে কোনও প্রকারে অনাহার ঘুচিল। বামাচরণের বিশ্বাস হইল যে, মা'র উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারিলেই তিনি দেন—বঞ্চিত করেন না—'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—আমার উপর সম্পূর্ণরূপে যে নির্ভর করে তাহার যাহা নাই আমি তাহাকে তাহাই দি (যোগ), তাহার যাহা আছে তাহার রক্ষাও আমিই করি (ক্ষেম)।

এইভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল—পরিজনদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখে এবং বামাচরণের পক্ষে অত্যন্ত সুখে, কারণ তারাপীঠ ছাড়িয়া তাঁহাকে ত দূর দূরান্তরে যাইতে হইল না!

বামাচরণের জননী এইবার একদিন বলিলেন—"বাছা দিনে দু'মুঠি ভাত কোন মতে মুখে উঠ্ছে, তা'ও বা কখন বন্ধ হয়। আমাদের ত সামান্য জমি আছে—তুমি কৃষিকর্ম্মে মন দাও।"

বামাচরণ সংকল্প করিলেন—'যদি খাটিতেই হয় ত' ঠাকুর-পূজা করিয়া খাইব, ক্ষেতের কাজ করিব না।'

বামাচরণ স্ব-গ্রাম আটলা ত্যাগ করিয়া মলুটি গ্রামে গেলেন। সেখানে পূজারীর কর্ম্মও মিলিল। কিন্তু বামাচরণের ত কোনও কেতাবী-বিদ্যা ছিল না। তিনি জানিতেন, মাকে বলিলেই হইল—এই নাও ফুল, এই নাও জল, এই নাও ভোগ। বলিলেই ত মা লন। কিন্তু বেতনভোগী পূজারী হইয়াই বামাচরণ বুঝিতে পারিলেন,—মন্ত্র, তন্ত্র, ন্যাস, প্রাণায়াম, অঙ্গশুদ্ধি, করশুদ্ধি—এসব যথাক্রমে এবং যথারীতি না করিতে পারিলে চলে না—চাকুরীই থাকে না! পূজা করিতে বসিয়া বামাচরণ দেখিলেন, কোথায় মা নাই—চারিদিকেই ত তাঁহার মা। পূজার ফুল তিনি চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিলেন!

লোকে বলিল—ক্ষ্যাপা বামাচরণ আরও ক্ষেপিয়াছে। উহাকে

তাড়াইয়া দাও। বামুন হইলে কি হয়?—উহার দ্বারা দেবীর পূজা চলিবে না।

বামাচরণ মলুটি হইতে হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিয়াই তারাপীঠে যাইয়া তারা মার কাছে নালিশ করিলেন। বলিলেন—'মাগো, এমন ক'রে কি বিদেশী ক'রে দিতে হয়?'

(২)

বীরভূমি জেলার তারাপীঠ বহুদিন হইতেই সিদ্ধ পীঠ। প্রসিদ্ধি আছে যে, বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া এইখানে সতীর নয়ন পতিত হইয়াছিল এবং রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠ এই পীঠে তপস্যা করিয়াছিলেন। তারা মা তাঁহারই স্থাপিত দেবীমূর্ত্তি। অনাদি লিঙ্গ চন্দ্রচূড় শিবের পার্শ্বেই মার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আজিও পুণ্যপীঠে শ্রীশ্রীতারা মাতার ও দেবেশ চন্দ্রচূড়ের মন্দির বিদ্যমান আছে। কবে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। সিদ্ধপীঠ কিরূপে প্রচারিত হয় সে বিষয়ে একটি মনোরম আখ্যায়িকা আছে। উহার মূলে আদৌ কোন সত্য আছে কি না—নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব।

যাহা হউক, ঐতিহাসক যুগে বীরভূমি-রাজশাহীর রাজা উদয়-নারায়ণ এই প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যখন তাঁহার পতন ঘটিল তখন বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার নাটোর-রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বীরভূমির যে অংশ বীরভূমি-রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল, তাহা নাটোর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল এবং বীরভূমির অন্য অংশের রাজা হইলেন মুসলমান আসাহুল্লা খাঁ। তারাপুর তাঁহার ভাগে রহিল। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী আসাহুল্লা খাঁর নিকট হইতে তারাপুর লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে অন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন এবং দেবীর যথাযোগ্য সেবা ও পূজার ব্যবস্থা করিলেন।

সিদ্ধপীঠ বলিয়া চিরদিনই তারাপুর বহু সিদ্ধ ও সাধকের তপস্যার স্থান হইয়া আছে। বামাচরণের কালে বাঙ্গালা দেশে তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ প্রসার ছিল। খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়; কৃষ্ণানন্দ—যিনি পরে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন—তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি। বাঙ্গালা দেশকে অবনমিত তান্ত্রিকতার ব্যভিচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনিই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই মহৎ প্রচেষ্টার স্বর্ণফল সাধক রামপ্রসাদ। কৃষ্ণানন্দের পূর্ব্বে তন্ত্রোক্ত দেবী-পূজা ঘটে হইত। কৃষ্ণানন্দ দেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রথমে প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দেবীর তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি কিরূপ হইবে তাহা স্থির কবিতে না পারিয়া কৃষ্ণানন্দ মার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। মা স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—'কল্য প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে যে নারী মূর্ত্তি দেখিবে, তাহারই মত করিয়া আমার মূর্ত্তি গঠন কর।' পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণানন্দ কম্পিত হৃদয়ে গৃহের বাহির হইয়া দেখিলেন—একটি শ্যামাঙ্গী গোপালিকা তাহার দক্ষিণ চরণ অগ্রবর্ত্তী করিয়া বামহস্তস্থিত গোময় দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত দক্ষিণ করে গোময় পিষ্টক রচনা করিতেছে। শ্যামাঙ্গীর সীমন্ত রক্তবর্ণ সিন্দুরে রঞ্জিত, কেশকলাপ আলুলায়িত; যেন মহা মেঘ। কৃষ্ণানন্দকে দেখিবামাত্র গোপবালা স্ত্রীসুলভ লজ্জায় জিহ্বাগ্র ঈষৎ নির্গত করিয়া তাহার শুভ দশনে উহা কর্ত্তিত করিল। কৃষ্ণানন্দ আবেগভরে ডাকিলেন—"মা, মা, শ্যামা!" পরক্ষণেই দেখিলেন বালিকা আর সেখানে নাই! তখন তাহারই মত মূর্ত্তি গঠন করিয়া কৃষ্ণানন্দ পরমানন্দে পূজা করিলেন এবং বাঙ্গালীর জন্য সেই পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিলেন।

তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ আনন্দনাথ যখন তারামন্দিরের প্রধান কৌল হইলেন, তখন নাটোরাধিপতি একনিষ্ঠ শক্তি-সাধক রামকৃষ্ণ

তারাপীঠে আসিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সিদ্ধিলাভও এইখানেই হইয়াছিল। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, আনন্দনাথ এই অঞ্চলে শাক্ত ও বৈষ্ণবে সম্মিলন ঘটাইয়াছিলেন।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সাধক আনন্দনাথের দেহরক্ষার পর তারা-মন্দিরের সেবা ও পূজার ভার মোক্ষদানন্দের উপর অর্পিত হয়। তারাপুর হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত রাৎমা গ্রামে মোক্ষদানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল মাণিকরাম। অভিষেকের পর তিনি মোক্ষদানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর বামাচরণকে মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মোক্ষদানন্দ দেহত্যাগ করিলেন। একে তখন বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ, তাহাতে আবার পাগল বলিয়া পরিচিত এবং মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞাত মোহন্ত বামাচরণকে কেহই মানিত না। যদিও মোক্ষদানন্দ বামাচরণকে তান্ত্রিক পূজাবিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও সাধারণ লোকে বামাচরণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। তাঁহার পূজার গভীরতা সাধারণ লোকে কি প্রকারে বুঝিবে? তাহারা ত জানিত না যে, বিশ্বাস ও ভক্তির বলে বামাচরণ সকল পূজা-বিধির পারে গিয়াছেন —তিনি জগন্মাতার সন্তান হইয়াছেন, শুধু সেবক ও পূজারী হ'ন নাই!

বামাচরণ মন্দিরের মোহন্ত, সুতরাং তাঁহাকে সে পদ হইতে অপসৃত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও হয়ত নাটোর-রাজ-কর্ম্মচারীর সাহসে কুলাইত না। কিন্তু দেবীর পূজার ভার আর বামাচরণের উপর রহিল না—অন্য পূজারী পূজা করিতে লাগিলেন। বামাচরণ ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না—বরং বন্ধনমুক্ত হইলেন বলিয়া পুলকিত হইলেন। তিনি তখন মার সম্মুখে বসিয়া নিরন্তর গাহিতে লাগিলেন—

ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন,
শ্যামা কেমন থাকতে পারে।

বামাচরণ আর তখন পূজারী ছিলেন না, তবে মার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হ'ন নাই। পূজারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে অপসৃত হওয়ায় তাঁহার তপস্তার সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। লোকে তখন দেখিত—ঘোর অমানিশায় বামাচরণ বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তারাপীঠের সেই সুবিখ্যাত পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর একাকী বসিয়া আছেন—কখনও বা দিগম্বর, কখনও বা সাম্বর! যে আসনের নিকটে যাইতেও অন্যের সাহস হইত না —রাত্রিতে ত কিছুতেই নহে—সেই আসনে ক্ষ্যাপাকে বসিতে দেখিয়া লোকে বলিত,—'এই ছ্যাখনা, আসনের তল হইতে ভৈরব উঠিয়া বামাচরণের ঘাড় মট্‌কায় আর কি! পাগলের পাগলামীর সেদিন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'বে!'

কেহ বা বলিত—"কোনও দিন গুরুর কাছে দীক্ষা হ'লো না, তিনি গেলেন কি না পঞ্চমুণ্ডী আসনে বস্‌তে!"

যাহারা বামাচরণকে একটু অনুকম্পার চক্ষে দেখিত, তাহারা কয়েক দিন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিল। বামাচরণ শুনিলেন, শুনিয়া একটু হাসিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—এরা বলে কি! মা যে নিজে আমাকে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর বসিয়ে দেন!

লোকে তখন বামাচরণকে বদ্ধ পাগল বলিয়াই জানে—তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা জগন্মাতা যে দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার পূজা লইতেছেন, এ কথা তখন আর কে জানিবে? জহুরিই জহরের মূল্য জানে—অন্যের পক্ষে [illegible]রও যা', কাচ-খণ্ডও তাই!

(৩)

দ্বারকা নদীর পূর্ব্বতীরে তারাপীঠ। তারাপীঠের ক্ষ্যাপা মোহন্ত একদিন দ্বারকা নদীতে স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ভ্রাতা

রামচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে নদীর অপর পারে মাতার শবদেহ আনিয়াছে, সেই খানেই সৎকার করিবে। নদীতে তখন বান ডাকিয়াছে, ঝড় উঠিয়াছে; (১) নদীবক্ষ আবর্ত্তের পর আবর্ত্তে ভীষণ হইয়াছে! কাহার সাধ্য পার হয়?

মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ ক্ষ্যাপার হৃদয় আর্ত্তের মত রোদন করিয়া উঠিল—মা কি তবে নাই! পাগল পাগলের মতই চীৎকার করিয়া কহিল—"মা—আমার মা! যেমন ক'রে পার, তোমরা এ পারে আনো। ওখানে নয়—এ খানেই মার সাক্ষাতে মার কাজ হবে!"

ওপারে যাহারা ছিল তাহারা শুনিয়া হাসিল! কেহ বা শ্লেষের সহিত বলিল—'মার পীড়ার সময় একটু সেবা করতে এলেন না—এখন ত ভারি দরদ্ দেখি!'

নদীর অপর পারেই সৎকারের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া 'জয় মা তারা' বলিয়া বামাচরণ সেই রাক্ষসী নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন! লোকে চীৎকার করিয়া কহিলেন—"পাগল—পাগল! ডুবে মরবি। ফিরে যা—ফিরে যা।"

ঝড়ের গর্জ্জন এই সাবধান-বাণী ডুবাইয়া দিল। নির্ভীক বামাচরণ অনায়াসে তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদী পার হইলেন এবং শ্মশান শয্যার উপর হইতে মাতার দেহ তুলিয়া লইয়া পৃষ্ঠে বহন করিতে করিতে এ পারে আসিলেন।

লোকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। এইবার তাহারা বলিল—'ধন্য—ধন্য ক্ষ্যাপা বামাচরণ!'

---

(১) সন্ত জীবনী—শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক।
বামা ক্ষ্যাপা—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তীরে উঠিয়া বামাচরণ গভীর গর্জ্জনে থাকিতে লাগিলেন—"তারা—তারা—তা-রা—!" সে গর্জ্জন যে শুনিল, বামাচরণকে তখন যে দেখিল, সে-ই মনে করিল, ভৈরব বুঝি জাগ্রত হইয়া বিশ্ব ওলট্-পালট্ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বামাচরণ আবার ডাকিলেন—"তারা—তা-রা—!" মেঘগর্জ্জনকে নীচে রাখিয়া সেই গর্জ্জন উপরে উঠিয়া গেল!

* * * * *

ক্ষ্যাপার এক মায়ের সম্মুখে আর এক মায়ের চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! দ্বারকার এপারে ওপারে যে যেখানে ছিল, সকলেই বার বার চীৎকার করিতে লাগিল—"জয় মা তারা—জয় মা তারা!"

(৪)

বামাচরণ বহুদিন হইতে সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধের তিন দিন পূর্ব্বে গৃহে যাইয়া কনিষ্ঠ রামচরণকে কহিলেন—বাড়ীর সম্মুখে যে পতিত জমীটুকু আছে, পরিষ্কার করাও—ওখানে ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'বে।

রামচরণ জানিত অগ্রজ পাগল। সে কহিল—"অর্থের অভাবে মহাহবিষ্য পর্য্যন্ত চল্‌ছে না, আর তুমি বল কি না ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবে!

বামাচরণ এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া নিজেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণ নিরন্তর কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল—'মা, মা—আমার মা—।"

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই কোথা হইতে ভারে ভারে নানাবিধ খাদ্য পানীয় প্রভৃতি আসিতে লাগিল। রামচরণ দেখিয়া-শুনিয়া অবাক্

হইয়া গেল। গ্রামের লোক কানা-কানি করিতে লাগিল। বামাচরণকে কেহ আর সেখানে দেখিতে পাইল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রাক্কালে আকাশে বর্ষণোন্মুখ মেঘ কালো হইয়া দেখা দিল। মেঘ ডাকিতে লাগিল। রামচরণ ভাবিল, সকল আয়োজন বৃষ্টিতেই বুঝি বা পণ্ড করিল!

কোথা হইতে বামাচরণ আসিয়া একখানি কঞ্চি দিয়া ভোজনের স্থানের চারিদিকে একটা গণ্ডী দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর মেঘের রাশি স্তম্ভিত হইয়া গেল! গণ্ডার বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, কিন্তু উহার ভিতরে এক ফোঁটা জলও পড়িল না! মহা-সমারোহে ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাপ্ত হইয়া গেল।

যাহারা দেখিল, যাহারা শুনিল, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কেহ আর তখন বামাচরণকে ক্ষ্যাপা বলিল না! বলিতে লাগিল—মা যাহাকে কৃপা করেন, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। কি করিলে মায়ের এই কৃপা পাওয়া যায় তাহাই জানিবার জন্য লোকে দলে দলে আসিয়া এত দিনের অবজ্ঞাত ক্ষ্যাপাকে ঘিরিয়া ধরিল।

(৫)

ক্ষ্যাপা সহসা কাহাকেও ধরা দিতেন না। যখন নিতান্তই ধরা পড়িতেন, তখন বলিতেন—"জপাৎ সিদ্ধি—সত্বর সিদ্ধিলাভের জন্য জপের তুল্য দ্বিতীয় পথ আর নাই। কর্ম্ম থেকে জ্ঞান, আর জ্ঞান থেকে ভক্তি ও বিশ্বাস—তা' হলেই নির্ব্বাণ, মুক্তি। নির্জ্জনে বসে' কেবল জপ কর, আর মায়ের নাম ক'রে কেবল কাঁদো—তা' হলেই তাঁর কোলে উঠ্‌তে পারবে।"

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ সবই তিনি, এর অর্থ কি ?"

ক্ষ্যাপা বলিলেন—"এক চৈতন্যে জগৎ চেতন। জড় পদার্থে তিনি, উদ্ভিদেও তিনি, মনুষ্যেও তিনি। জড়ে তিনি আছেন—জড় তা' জানে না। তাই সে চেতন নয়। মানুষই তাঁকে ভালরূপে জান্‌তে পারে। তাঁকে ভাল ক'রে অন্তরে বাহিরে জান্‌লেই, মানুষ হয় মহাপুরুষ—মানুষ হয় অবতার।"

একটি ভক্ত বলিলেন—"বাবা, মার জন্য কান্না আসে কৈ ?"

উত্তরে ক্ষ্যাপা বলিলেন—"অমনি কি আস্‌বে ? পূর্ব্বজন্মের সাধনা চাই। সাধুসঙ্গ কর—নির্জ্জনে জপ কর। এ জন্মে যদি কিছু না হ'ল, না হয় কিছুত এগিয়েও রইল ; পরজন্মে কেলে-বেটী তার পর থেকে ঘুঁটি চাল্‌বে।"

ক্রমে অনেকে আসিয়া ক্ষ্যাপার চরণতলে পতিত হইয়া পীড়িত পুত্র, পত্নী বা আত্মীয়ের জীবন ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। এই সকল কার্য্যে বামাচরণকে সম্মত করান সর্ব্বদাই অত্যন্ত কঠিন ছিল ; তবে ভক্তদের বিশেষ কাতর প্রার্থনায় এই ন্যালা-ক্ষ্যাপা বাক্‌সিদ্ধ তাপস যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহার তাহাই ঘটিত।

বিশ্বমাতার কৃপা লাভ করিবার আশায় কেহ যদি উপায় জিজ্ঞাসা করিত, বামাচরণ বলিতেন—"মাকে কেঁদে ডাক্‌লেই সে বেটী দেখা দেয়। ভক্তি আর বিশ্বাস থাক্‌লে মাকে পেতে আর কিছুই শক্ত নয়। আমি বাবু অত যোগ-যাগ বুঝি না, কেবল সময় নষ্ট ! যখন কেঁদে ডাক্‌লেই পাওয়া যায়, তখন অত কষ্ট কেন ? যারা ডাক্‌তে জানে না, তাদের ডাক ততদূর পৌঁছায় না—তারা মা শুনতে পায় না ; বেটী কে

আবার একটু কাণে খাটো। ডাকার মত জোর ক'রে ডাক্‌লেই তার ঘাড়কে শুন্‌তে হ'বে।"

ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন
কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে—

উপদেশ দিতে দিতেই ক্ষ্যাপার প্রাণের বীণা যেমন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত অমনি তিনি গান ধরিতেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥

একদিন একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, তান্ত্রিক সাধনার পথ কি?"

ক্ষ্যাপা বলিলেন—"তান্ত্রিক সাধক মায়ের আব্দেরে ছেলে; কিন্তু এটা ঠিক যে, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন না হ'লে, কেহই মায়ের কোলে উঠ্‌তে পারে না। সাধনার দু'টি পথ আছে—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি ভোগ, আর নিবৃত্তি যোগ।…ভোগ তোমাকে কর্‌তেই হবে, নতুবা নিবৃত্তি আস্‌বে কেমন ক'রে? কর্ম্ম ও ভোগের শেষ না হ'লে মানুষ নিবৃত্তি-মার্গে আস্‌তে পারে না।…যারা একেবারেই নিবৃত্তি-পথে এসেছে, তাদের এক জন্মের সাধনা নয়—জন্ম-জন্মান্তর হ'তে তারা ভোগবাসনা চরিতার্থ ক'রে তবে নিবৃত্তিমার্গে এসেছে। এখন তাদের অরুচি হয়েছে, তাই নিবৃত্তি। এদের আর পতনের ভয় নাই। আর যারা জোর ক'রে নিবৃত্তি কর্‌তে যায়—তাদেরই পতন। ভালবাসার দুই প্রকারে নিবৃত্তি হয়, এক বাঞ্ছিতকে লাভ ক'রে, অপর—তাঁকে চিন্তা ক'রে। বাঞ্ছিতকে

লাভ ক'রে যা', তা' প্রবৃত্তি-মার্গ, আর তাঁকে চিন্তা ক'রে যে তৃপ্তি, তা' নিবৃত্তি মার্গ।" (১)

(৬)

বালকের মত সরল, প্রজাপতির মত আনন্দময়—কুসুমের মত কোমল, আবার বজ্রাদপি কঠোর—চন্দ্রের মত শীতল, তপনের মত তপ্ত—কখনও আবার কাল -বৈশাখীর মেঘের মত গম্ভীর, রুদ্রের মত প্রচণ্ড বামা ক্ষ্যাপা বেশী সময় নিজের মন লইয়াই থাকিতেন, বাহিরের কথায় কান দিতেন না—আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেন—

আপনাতে আপনি থেকো মন
যেও নাকো কারো ঘরে।

নিজের ঘর হইতে পরের ঘরে গেলেই অনেক বৃথাবাক্য ব্যয় করিতে হয়। বৃথা বাক্যব্যয়ে মন নষ্ট, দেহ দুর্ব্বল, শক্তির অপচয় ও সাধনার বিঘ্ন ঘটে। আত্মা দ্বারাই যখন আত্মাকে জানিতে হইবে, তখন সেই আত্মার সঙ্গেই নিরন্তর যোগ রাখা প্রয়োজন—অন্যের সহিত যুক্ত হইয়া আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া লাভ কি ?

একদিন একটি ভক্ত আসিয়া ক্ষ্যাপার নিকটে গাহিলেন—

কালো মেয়ে তা অনেক আছে,
এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখ্‌লে পরে,
হৃদি-পদ্ম করে আলো ॥
রূপে কালী, নামে কালী
কালো হ'তে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে, সে-ই মজেছে—
অন্যরূপ লাগে না ভালো।

(১) বামাক্ষ্যাপা—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষ্যাপা মুদিত নয়নে গানটি শুনিতেছিলেন, আর সেই মুদিত কমল ভেদ করিয়া প্রেমের উৎস ছুটিতেছিল। বাহিরে তখন অন্ধকার সন্ধ্যা। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছিল, আর নরকঙ্কালে পরিপূর্ণ ক্ষ্যাপার কুটীরের মধ্যে প্রেমের বাদল নামিয়াছিল। ক্ষ্যাপা গান শুনিতে শুনিতে সমাধি-মগ্ন হইলেন। সেই ধ্যানগম্ভীর আনন্দময় মূর্ত্তির চরণ লুন্ঠিত হইয়া ভক্ত বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হইল, ক্ষ্যাপা তখন নিজেকেই বলিলেন—"মা তোর দয়ার অন্ত নাই। কিন্তু দয়া পেতে হ'লে 'আমি', 'আমার' ভুল্‌তে হয়। ত্যাগ চাই—ত্যাগ—ত্যাগ—সর্ব্বস্ব ত্যাগ! ত্যাগের জন্য চাই মনের বল, মনের বলের জন্য চাই দেহের বল। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। দেহকে খুব সবল করবে। সাধনাই কর আর যা-ই কর—শরীর আগে। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম শিখ্‌লে শরীর পাকা-পোক্ত হ'বে, কষ্ট কর্‌তে পার্‌বে—তবে ত সাধনা। সে কি আর স্বাস্থ্য নষ্ট হ'লে হয়? কলিতে শক্তি উপাসনা আর শ্রীকৃষ্ণের নাম রসনায় রটনা ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই। দ্যাখো বাবা, আনন্দময়ীর আনন্দে সদা ডুবে থাকো; কিছু করতে হ'বে না—আপ্‌সে সব্‌ হোগা।'

শক্তির্ব্রহ্মা শিবঃ শক্তি শক্তির্দেবো জনার্দ্দনঃ।
ইন্দ্রাদ্যা শক্তয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বং শক্তিময়ং জগৎ।

সমস্তই শক্তি রে বাবা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু আদি ক'রে জগতের সমস্তই শক্তিময়। বিষ্ণুর শক্তি বল্‌তে গেলে লক্ষ্মীকে না বুঝে বিষ্ণুর আত্মা অর্থাৎ স্বয়ং বিষ্ণুকে বুঝ্‌তে হবে—ব্রহ্মার শক্তি বুঝ্‌তে হ'লে যেমন স্বয়ং ব্রহ্মাকেই বুঝায়। শক্তিহীন কিছু কিছুই নয়—জড় পদার্থ। শক্তিহীন শিব শব প্রায়। তা হলেই বুঝ্‌তে হ'বে মা ও বাবা এক। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লি মাকে পেলেই বাবাকে পাওয়া যায়। শক্তি মানে বল-বিক্রম

বুঝ্‌লে হ'বে না। শক্তি মানে আত্মা। পরব্রহ্মের চিৎশক্তি আমার মা। যে এই অপরিসীম শক্তি-তত্ত্ব সাগরে ডুবেছে, সে যে আর মা ভিন্ন কিছুই জানে না। তার পক্ষে যে মা-ই সব। মা-ময় দৃষ্টিতে সে আপন-ভুলে আত্মহারা হয়েছে। মা বাবা এক। শিবের শক্তিকে বুঝ্‌তে হ'লে স্বয়ং শিবকেই বুঝায়।"

একদিন একজন ভক্ত সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলে পর বামাচরণ কহিলেন—"সংসার দুঃখময়—এসব ন্যায় দর্শনের মত। সুখও দুঃখানুযুক্ত, এইজন্য গৌণরূপে সুখকেও দুঃখ ব'লে ধরা উচিত। জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখ নাশ করার বাসনা থাকে, তা' হ'লে যাতে জন্ম না হয়, এমন কাজ করা উচিত। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি—প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই জন্ম-নাশের হেতু। কেননা, জীব প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করে; তারই ফলে তাকে জন্মাতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির হেতু কি? দোষ। আসক্তি, বিদ্বেষ, কিংবা প্রমাদ-দোষ ভিন্ন কোন বিষয়ে সংসারাসক্ত জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই সব মোহকর বিষয়ও আবার মিথ্যা জ্ঞান হ'তে উদ্ভূত। অতএব এই মিথ্যা-জ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন কর্‌তে না পার্‌লে দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নাই। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়—আর সেই তত্ত্বজ্ঞান ভক্তি ও বিশ্বাসেই পাওয়া যায়। বিশ্বাস ও ভক্তি বলে সাধনা কর—সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে। আমি মুখ্যু মানুষ, অত তত্ত্ব কিছু জানি না —আমি চাইও না। আমি 'তারা' ব'লে ডেকে আপন-হারা হ'তে চাই। ক্ষ্যাপারে, এতে যে সুখ—তোর নির্ব্বাণের বাবাও সে সুখ দিতে পারে না। 'নির্ব্বাণ' 'নির্ব্বাণ' কিরে, বাবা! আমার তারা-মাই সব। মায়ের নামে হাস, নাচ, গাও আর বগল বাজিয়ে ডঙ্কা মেরে মায়ের আদুরে ছেলের মত যেখানে ইচ্ছা চলে যাও—যমের বাবাও তোমাকে আট্‌কাতে পারবে না। বাবারা! আনন্দময়ীর আনন্দে মত্ত হও। মায়ের নাম

ক'রে কাঁদ্‌তে থাক—সকল ভাবনা, সকল যাতনা ঘুচ্‌বে। আনন্দই ত আমার মা! নিরানন্দ ব্যক্তির ধর্ম্ম নাই—মা তাকে দেখ্‌তে পারে না। মাকে পেতে হ'লে সদাই আনন্দে থাক্‌বে।"

অন্য কথা প্রসঙ্গে ভক্তকে কহিলেন—"মানুষের হিতের জন্য ভগবান্ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাতে লেগে থাকাই খুব ভাল। আর দেখ বাবা! জগতের যা' কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবই মনকে নিয়ে। তোমার মন যদি ঠিক হলো—তবে আর কিছুতেই কাজ নেই। মন ঠিক কর্‌তে চেষ্টা কর; জগতে যা' কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম মন্তোর-তন্তোর দেখ্‌ছো—সবই মনকে বশ কর্‌বার জন্য। সেইটি পার্‌লেই ত মার দিয়া কেল্লা,—তা' হলেই জয় জয়কার। তাই বলি আপনার ধর্ম্মে থেকে শুদ্ধ মনে ভগবানকে ডাকো—তা'হলেই সব লেঠা মিটে যাবে।"

একজন ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা প্রভু, আমরা যে কালী মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজা করি, সে মূর্ত্তির গলায় অত মুণ্ড মালা কেন?

প্রভু বামাচরণ বলিলেন—"ওরে আমি মুখ্যু, পড়া বিদ্যে আমার নাই—নিরেট মুখ্যু, জানিস্। যখন রজোগুণ-শক্তিতে সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো, সত্ত্বগুণ-শক্তিতে পোষণ হ'তে লাগ্‌লো—কেবল সৃষ্টি আর পোষণে ত হবে না—নাশ তো দরকার! তমোগুণে নাশ, কিন্তু তমোগুণ ত উত্তেজিত হয় না—যাকে সৃষ্টি কর্‌লুম্ তাকে নাশ করা কিরূপে সম্ভব। তাই মা আমার একশত আটবার আপনি নাশ হ'য়ে তমোগুণের শক্তি বর্দ্ধিত কর্‌লেন অর্থাৎ তমোরূপী শক্তিহীন শিবকে শক্তিমন্ত কর্‌লেন। ঐ একশত আটবার নাশের একশত আটটি মুণ্ডমালা মার গলায় দুল্‌ছে।"

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তখন নিরাকার শক্তি কি মূর্ত্তিমতী হয়েছিলেন?"

ক্ষ্যাপা উত্তর দিলেন—"মূর্ত্তিমতী না হ'লে কি মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। ও সব জেনে কি হবে? মাকে পেতে হ'লে কান্না দরকার। আমি বলি, ওসব—বাজে কথা।"

একদিন একজন পণ্ডিত ভক্ত কহিলেন—"আপনাকে দেখ্‌লে ঘর দোর, ছেলে পুলে আর মনে থাকে না, আমাদের মায়াই ত হয়েছে যত কাল। মায়া ত্যাগ কর্‌তে না পার্‌লে ত কিছু হবে না।"

ক্ষ্যাপা কহিলেন—"ওরে শালারা! মায়া ত্যাগ কর্‌বি কি? মায়াই ত মা; যার মায়া নাই সে ত মানুষ নয়, সে রাক্ষস; মায়া ত্যাগ কর্‌লেই ত মানুষ মানুষ থেকে খারিজ হ'য়ে গেল। মায়া না থাক্‌লে জগৎ থাক্‌বে না। মায়া ত্যাগ করা ত পতিত হবার লক্ষণ।"

পণ্ডিত বলিলেন—"সে কি বাবা, মায়া থাক্‌লেই ত মায়ের কাজ করা যায় না।

ক্ষ্যাপা তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"মায়া থাক্‌লেই মহামায়ার কাজ ভাল ক'রে করা যায়। মায়া রাখ্‌তে হ'বে, তবে তাকে জয় ক'রে রাখ্‌তে হ'বে। তার বশে যাবে না। তোমার ছেলে পিলে কষ্ট পাচ্ছে—তাদের ভাল কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে;—এ সকল দয়া মায়া মানুষেই থাকে। যার না থাকে সে মানুষ নয়। অভিভূত না হলেই হলো—তা' হলেই মায়াকেই জয় করা হলো। মায়া ত্যাগ নয়—মায়া জয় কর্‌তে হবে—তা হলেই মহামায়াকে পাবে। জান্‌বে কর্ত্তব্যপালনই মহা ধর্ম্ম। আর সে কাজ মায়েরই কর্‌ছ। মা ছাড়া ত কিছু নাই।" (১)

(৭)

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে তারাপুরপীঠে বিরাট একটি মেলা বসে। মেলায় যে শুধু দোকানী-পসারীরাই আসে তাহা নহে—নানা-

(১) বাবা ক্ষ্যাপা—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্থানের সাধু সন্ন্যাসীরাও আসেন। কতকগুলি ভক্ত কীর্ত্তনের দল লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা গাহিতেছেন—

আদর ক'রে হৃদে রাখো
আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুই দ্যাখ্ (ও মন), আর আমি দেখি—
আর যেন কেউ নাহি দেখে।

দূর হইতে এই গান শুনিয়া বামাচরণ দিশাহারা হইলেন এবং ছুটিতে ছুটিতে নিকটে আসিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বলিলেন—'আবার গাও, আবার গাও—'তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।' ইহাই যে ভক্তের একমাত্র বাসনা; তাহার সর্ব্বস্ব ধনকে সে নিরন্তর নিজের চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে চাহে—'হিয়ার ভিতরে পরাণ যেখানে' সে তাহাকে সেইখানে লুকাইয়া রাখিতে চাহে— পাছে আর কেহ চুরি করিয়া লয়, পাছে আর কেহ সেই মিলন-আনন্দের ভাগ চায়, এই ভয়!

ইহার কিছুদিন পর একদিন তারা-মন্দিরের পূজারী অসুস্থ হইলেন। মার পূজা করিবার জন্য ক্ষ্যাপাকে যাইতে হইল। ক্ষ্যাপা পূজায় বসিলেন, এক একটি উপচার লইয়া ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন— "এই বেল-পাতা নে, এই ফুল নে, এই তোর অন্ন নে—খা; এই যে জল নে মা, এই ধূপ নে, দীপ নে, বলি নে! বাবা গোমস্তা তুমিও লও, পাণ্ডা বাবা তুমি লও—ওরে বেণী, রাম, অমৃত, কালাচাঁদ—তোরাও নে, তোরাও নে—" সর্ব্বভূত তখন ক্ষ্যাপার কাছে কালীময় হইয়া গিয়াছে!

এমন করিয়া পূজা করিতে পারেন কয় জন? পারিতেন বামা ক্ষ্যাপা, পারিতেন রামপ্রসাদ, পারিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, ভগবানের বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য—তিনি শুধু মন দেখেন,

প্রাণ দেখেন, আর কিছু দেখন না। তিনি ভক্তির কাঙ্গাল—উপচারের কাঙ্গাল নহেন। তাই তিনি প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ —গীতা ৯:২৬

* * * *

বামাচরণের জীবনের সহিত অনেক অলৌকিক কাহিনী সংযুক্ত রহিয়াছে। ঐশীশক্তি ভগবানের প্রিয় পাত্রেই প্রকাশিত হয়, তাঁহারা ইচ্ছা করুন বা না করুন, উহা ফুটিয়া উঠিবেই। আমাদের মত মূঢ় জন সেই বিকাশটুকু দেখিয়াই দেবানুগৃহীতকে চিনিয়া লইতে চাহে! আমরা একথা বিস্মৃত হই যে, অলৌকিক শক্তির বিকাশ মহাপুরুষদিগের জীবনের সর্ব্বনিম্নস্তরের বস্তু—উচ্চতরের বস্তু তাঁহাদের ভাব, ভক্তি, প্রেম—তাঁহাদের আত্মৌপম্য-দৃষ্টি এবং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন। সেই ব্রহ্মদর্শন হইয়াছিল বলিয়াই সর্ব্বভূতে তারা-মাকে দেখিয়া ক্ষ্যাপা বামাচরণ মন্দিরে বসিয়া পূজা করিতে করিতে, যাহাকে সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই পুষ্প, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াছিলেন।

বামাচরণের মা যে-দিন বামাচরণকে ডাকিলেন, সেদিন ঘরের ছেলে ঘরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ক্রমে মহাসমাধির সময় সন্নিকট হইতে লাগিল। নিকটে বসিয়া একজন বিহ্বল ভক্ত তখন গাহিতেছিলেন—

হরি বোল্ হরি, চলো যাই বাড়ী—
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো।
ফুরালো খেলা ভাঙ্গলো মেলা—
আর কেন বিলম্ব বলো।

বিদেশে প্রবাসে, ভব-পান্থাবাসে
কিছু আর লাগে না ভালো।
বাড়ী পানে মন, ছুটেছে এখন—
ম'-মা ব'লে ঘরে চলো।

ক্ষ্যাপা গান শুনিতে শুনিতে ক্রমে সমাধিতে অচল হইয়া গেলেন। নয়নদ্বয় স্থির হইয়া রহিল, বদনে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটিল। ঘরের ছেলে পরকে ছাড়িয়া ঘরের দিকে যাত্রা করিলেন। দীপ হস্তে দূরে দাঁড়াইয়া মা ডাকিতে লাগিলেন—ওরে আমার পথ-ভোলা, আয়রে আয়রে—আয়!'

ক্ষ্যাপা সেই ডাক শুনিয়া ধ্বনির পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন, বাঁশীর পশ্চাতে যেমন মৃগ চলে সেইরূপ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণের নিশা আসিল। জন্মক্ষ্যাপা বামাচরণ তাঁহার কালো-মায়ের আলোকমাখা শ্রীচরণে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেলেন—অরুণ উদিত হইলে শুক তারা যেমন সেই আলোকে মিলাইয়া যায়, সেইরূপ।

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর

জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং,
বন্দে সুরাসেবিত-পাদপীঠং।
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং,
তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণং॥

—শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।

বাঙ্গালার কোকিলকণ্ঠ কবি একদিন গাহিয়া উঠিলেন—

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এতো কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল॥
*　　　　*　　　　*
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোনো দেশে॥

—চণ্ডীদাস।

এই গানের সুরে তখনও বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসে নিত্য নিত্য ঝঙ্কারই তুলিতেছিল, যখন ভাগীরথীতীরে দেখা দিলেন গঙ্গাপুলিনবিহারী গৌর বর্ণ শ্যাম রায়। শ্রীগৌরাঙ্গের পর কিঞ্চিৎ অধিক দুই শতাব্দী চলিয়া গেল। ওই ভাগীরথী-তীরেই আবার এক নূতন গান নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল—

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি তা' জান না?

—রামপ্রসাদ।

এই গানের সুর শত বর্ষ মধ্যেই আবার ভাগীরথীতটে মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল—জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে।

সাধক ও সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাই বলিয়াছিলেন—"যেমন চণ্ডীদাসের গান হইতেছে সুর, আর মহাপ্রভুর জীবন হইতেছে তাহার রূপ; তেমনি রামপ্রসাদের গান হইতেছে সুর আর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হইতেছে তাহার রূপ।...বাঙ্গালার প্রাণ হইতেই এই সুর ও রূপ যুগে যুগে ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে।" (১) বাঙ্গালী যেমন সহজে ঘুমাইয়া পড়ে, তেমনি আবার সহজেই জাগিয়া উঠে। লোকে দেখে বাহিরের একটা প্রবল আঘাত মৃতকে প্রাণ দিল! শব কি আঘাতে জাগে? দেহে জীবন আছে বলিয়াই মৃতকল্প হইয়াও বাঙ্গালী জাগ্রত হয়। যাহাতে মোহনিদ্রা বাঙ্গালীকে ত্যাগ করে তাহা পাইলেই সে আবার জগজ্জয়ী হইবে। বাঙ্গালীর সেই জয়-যাত্রা দেখা গিয়াছে বাঙ্গালার শঙ্কর স্বামী-বিবেকানন্দের মার্কিণবিজয়ে। যে শক্তি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিল তাহার কেন্দ্র ছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

সপ্তরথী যেমন ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতের অভিমন্যুকে কুরুক্ষেত্রে বধ করিয়াছিলেন, তেমনি বাঙ্গালার সপ্তরথী—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, সেনাপতি মীরজাফর প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিয়া পলাশীর রণাঙ্গনে হতভাগ্য সিরাজ-উদ্দৌলাকে হত্যা করিয়াছিলেন! পলাশীর গ্লানিতে আরক্তিম মোগলরবি ডুবিয়া গেল, বাঙ্গালার জন্য রাখিয়া গেল—"মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে... স্ত্রীজাতির অবরোধ ও (পুরুষের) বহু-বিবাহ প্রথা, পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা, তন্ত্রে ব্যভিচার—ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি, সর্ব্বসাধারণের

(১) বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালার ঊনবিংশ শতাব্দী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

তোষামোদ-জীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা-পরতা এবং বালক ও যুবকদিগের মধ্যে দুর্নীতি! (১)

ইংরাজ বণিকের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ অতিশয় প্রাচীন ও নিবিড়। সেই কারণে এবং মোগল-আমলের শেষ সময়ে বারংবার বর্গীর উদ্যত কৃপাণের আঘাত যে সকল বাঙ্গালীকে ক্রমে ক্রমে জব-চার্ণকের নব-নির্ম্মিত কলিকাতার অধিবাসী করিয়া তুলিল, তাহারাই প্রথমে বিলাতী আব্‌হাওয়ার আওতায় পড়িয়া পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইতে লাগিল। তখন্ 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী দেখা দিল যাহারা "পারশী ও স্বল্প ইংরাজি-শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই দিন কাটাইতে লাগিল।...বেদের যে কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর কিছুই রহিল না—রহিল শুধু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল।... অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিতে লাগিল।" (২) এই সময়ে লর্ড মেকলে ঘোষণা করিলেন—ইউরোপের যে-কোনও পুস্তকালয়ের একটিমাত্র তাকে (shelf) যে জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে, সমুদায় ভারতবর্ষ ও আরব দেশের সাহিত্য নিঙড়াইলেও তাহা পাওয়া যায় না! (৩) তখন এদেশের হিন্দুকলেজে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। "হিন্দু-কলেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।...ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales

(১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

(২) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

(৩) Lord Macaulay's Education Despatch, 1835.

সে-ই স্থানে আসিল ; বাইবেলের সমকক্ষ হইয়া বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।…নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল…তিন জনেই তাঁহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ!” (১) বাঙ্গালার নবীনে ও প্রাচীনে তখন ঘোর বিরোধ বাধিয়া গেল।

এই সকল “নব্যবঙ্গ” বা “ইয়ং বেঙ্গল” সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—“এই যে দেখ্ছ সব ‘ইয়ং বেঙ্গল’—এরা কি ভক্তি-টক্তির ধার ধার্তো? মাথা নুইয়ে পের্নাম (প্রণাম) কর্তেও জান্ত না। মাথা নুইয়ে পেরণাম কর্তে কর্তে, তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে। কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) বাড়ীতে দেখা কর্তে গেলুম, দেখি চেয়ারে ব’সে লিখ্ছে। মাথা নুইয়ে পের্ণাম কর্লুম, তাতে অমনি ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিলে। তারপর আস্বার সময় একেবারে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পের্ণাম কর্লুম। তাতে হাত-জোড় ক’রে একবার মাথায় ঠেকালে।” (২) ইংরাজ-সংস্পর্শের প্রথম আমলেও ভারত জানিত, ভোগের পথ ধরিয়া ত্যাগে যাইতে হয়,—সে তখনও তাহার গুরু, গীতা ও গায়ত্রীকে হৃদয়ে রাখিয়াছিল। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের দম্কা বাতাস ভারতবর্ষকে তোল-পাড় করিয়া ফেলিল; ভারত তখন পাশ্চাত্যের ভাব গ্রহণ করিয়া শুধু ভোগের জন্যই ভোগের দিকে ছুটিতে লাগিল!

ইংরেজি-শিক্ষার গুণে হিন্দুর যুবক।
কি মত অবস্থাগত বলা আবশ্যক॥

---

(১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

আর্য্যধর্ম্মকর্ম্ম প্রায় কেহ নাহি মানে।
দিবস রজনী রত ইন্দ্রিয়সেবনে॥
মা-বাপে না পায় ভাত, গায়ে উড়ে খড়ি।
পরায় বামায় অঙ্গে বারানসী-শাড়ী॥ (১)

জাতির এই দুর্দ্দিনে দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নানাবিধ সংস্কারের মন্ত্র লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সংস্কারের মূলে ছিল সকলকে এক বাঁধা পথে পরিচালিত করিবার কল্পনা। তাহার ফলে ধর্ম্মে ও সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রামমোহন বেদের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, বাঙ্গালীকে উপনিষদের যুগে ফিরাইয়া লইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন এবং মূর্ত্তি-পূজাকেই হিন্দুর সকল প্রকার অবনতির কারণ বলিয়া ঘোষণা করিলেন! তিনি ধরিতে পারিলেন না যে, হিন্দু-ভারত মূর্ত্তিকে পূজা করে না—তাহারা মূর্ত্তিতে পূজা করে। এই যুগ ছিল সেকালের বাঙ্গালার "সংস্কার-যুগ।"

কর্ম্মক্লান্ত রামমোহন অমরধামে প্রস্থান করিলেন, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের যুগ বাঙ্গালাদেশে প্রবলভাবে চলিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া বিবেকানন্দ এই যুগের তীব্র প্রতিবাদরূপে দণ্ডায়মান হইয়া পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালীকে "নকল-সাহেব" হইবার ঘূর্ণীপাক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিলাতী পরিচ্ছদে শোভিত বৈদিক-কাঠামোর উপর গঠিত রাম-মোহনের ব্রহ্মসভা মরিয়া গেল। তাহার স্থান লইল মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের ব্রাহ্মসমাজ। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের শঙ্কর-অদ্বৈত মত পরিহার করিলেন, বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করিলেন। ফরাসী

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

কার্তেজীয়ান্ দর্শনের ভিত্তির উপর সগুণ ব্রহ্মবাদমূলক ঔপনিষদিক বাক্যগুলি স্থাপন করিয়া তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, নানা কারণে কেশবচন্দ্র মহর্ষির সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছন্ন করিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডের "সহজ-জ্ঞান"-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এক নবধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়। কিছুকাল পর কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কৃষ্ণের মর্ম্মান্তিক মতবিরোধ ঘটায় তিনি কেশবচন্দ্রের "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন —কেশবের "নববিধান" শির উত্তোলন করিল। বিচ্ছিন্ন অপরাংশের নাম হইল—"সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ"। "নববিধান" বলিলে যাহা বুঝাইত তাহা ছিল এইরূপ :—

'নব-বিধানের' কথা—'ভোড়া' তুলনায়।
সকল ধর্ম্মের কিছু কিছু আছে তায়॥

* * * *

অন্য অন্য স্থানে যাহা বুঝিল সুন্দর।
লইল তাহার কিছু করিয়া আদর॥
আগা-গোড়া দিয়া বাদ কণাংশ লইয়া।
নববিধানের দেহ দিল সাজাইয়া॥
নামে মাত্র দেহ, চক্ষে দেখা নাহি ঘটে।
আকাশ-কুসুম সম—বস্তু নাই মোটে॥

* * * *

পরম সুন্দর ভোড়া দেখাধ সম্প্রতি।
মলিন কুসুমদল পোহাইলে রাতি॥(১)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে যখন এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লব, ধর্ম্মহীনতা ও নবীন সংস্কারের নামে নানাভাবে স্লেচ্ছাচার চলিতেছিল, সে সময়ে কামারপুকুরের ব্রাহ্মণকুমার গদাধর দক্ষিণেশ্বরে কঠোর তপস্যা করিয়া জগদ্‌গুরুর আসন লইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। কেহ তখন তাঁহার সংবাদ জানিত না।

(২)

কলিকাতার 'ষ্টার থিয়েটার'-গৃহে একটি সম্বর্দ্ধনা-সভায় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন—"আমি ঈশ্বর-কৃপায় এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম—যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের মহাসমন্বয়-রূপ, এতদ্বিধ ব্যাখ্যা স্বরূপ—যাঁহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহস্রগুণে উপনিষদ্-মন্ত্রের জীবন্ত ভাষা স্বরূপ।" আবার তিনি মান্দ্রাজের সম্বর্দ্ধনা-সভায় বলিয়াছিলেন—"বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম—যিনি একদিকে যেমন ঘোর অদ্বৈতবাদী, তেমনি অপর দিকে ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন। যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপর দিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন।" মান্দ্রাজে আর একটি সভায় স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে। যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন।...এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন...তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র ছিল না, এরূপ মহামনীষা-সম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নামটা পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না।" (১)

(১) স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় ঊনবিংশ শতাব্দী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত ও বিশাল প্রেমসমুদ্রতুল্য হৃদয় লইয়া যে মহাপুরুষ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল—গদাধর। সাধনার অন্তে তাঁহার নাম হয় 'রামকৃষ্ণ'। ধর্ম্মের, সমাজের ও নীতির দেশব্যাপী যেরূপ গ্লানি ঘটিলে ধর্ম্মসংস্থাপন এবং ভূভার-হরণের জন্য তাঁহাকে নানা যুগে আসিতে হইয়াছে, এবারও সেই কারণেই তিনি আসিলেন। এবার তিনি আসিলেন একটি ব্যক্তি নহে —একটি প্রকাণ্ড যুগ। সে যুগের পরিমাণ করিবার কাল আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

অবতার-পুরুষ সরকারি লোক। জগদম্বার জমীদারীর যেখানেই যখন কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয় তখনই তাঁহাকে সেইখানে আসিতে হয়। তিনি একবার আসিয়াছিলেন এই ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসী রাজার মত। তাঁহারই অঙ্গুলিহেলনে, কত মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর উত্থান ও পতন ঘটিল—কত সমরক্ষেত্র অরাতি-শোণিতে প্লাবিত হইয়া গেল; কিন্তু এত বল-বীর্য্য প্রতিষ্ঠা প্রভুত্ব থাকিতেও তিনি কখনও রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন না; অথচ তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীতে উপনিষদের সহিত উপনিষদের, দর্শনের সহিত দর্শনের—মতের সহিত মতের বিরোধ মিটিতে লাগিল, কিন্তু তিনি ভারতের আচার্য্যরূপে নিজেকে বিঘোষিত করিলেন না! তিনি কর্ম্মযোগের শঙ্খ বাজাইলেন, ভক্তিবীণায় ঝঙ্কার তুলিলেন, জ্ঞানের পথকে মান্য করিলেন—শেষে সর্ব্বমানবের মুক্তির মন্ত্র প্রচার করিয়া কহিলেন,—সমাজ, সম্প্রদায়, মত, পদ্ধতি সকলের দাসত্ব পরিহার করিয়া কায়মনোপ্রাণে সেই সর্ব্বময় প্রেমমূর্ত্তি ভগবানের শরণ লও—কোনও দিকে হেলিও না, কাহারও কথায় দুলিও না,—সর্ব্বদা মনে রাখিও সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। সে কাল

ছিল ক্ষাত্রবলের ও রাজ-মর্য্যাদার কাল—তাই তিনি সেই কালের যোগ্য গুরুর প্রতীকরূপে আসিয়া দুর্ব্বলের সহায় হইয়াছিলেন।

তাহার পর যেবার আসিলেন, সেবারও তিনি রাজতপস্বী। অপরূপ-সুন্দরী পত্নী, নয়নের পুত্তলি পুত্র, হেমখচিত স্ফটিকে গঠিত গন্ধবারি দ্বারা সর্ব্বদা নিষিক্ত বীণাবেণু, বংশীরবের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-লীলায় সখীদিগের নুপূর শিঞ্জনে মুখরিত কুঞ্জবাটিকা পরিত্যাগ করিয়া মানবের দুঃখ-নিবৃত্তির সন্ধান লাভ করিবার জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইলেন! কঠোর তপস্যার কালে চর্ম্ম মাংস একেবারে খিন্ন হইয়া শুষ্ক হইয়া গেল! সেই সন্ন্যাসীর চরণমূলে ভারতবর্ষ অর্ঘ্য দিল। নেপাল, চীন জাপান—সমুদ্রকুক্ষিগত দ্বীপাবলী ও সমুদ্রপারের জনপদ সমূহ ভক্তিভরে গাহিয়া উঠিল—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

আনন্দ-বাঁশরীর কলতানের মধ্যে তাঁহার আগমন ঘটিয়াছিল—আসুরবলদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারের রুধিরলিপ্ত কারাগৃহে নহে—পুষ্পভারাবনত লতাবল্লরীর প্রেমালিঙ্গনে-বদ্ধ শাখা-পল্লবে সুশোভিত, বৃহৎকায় বৃক্ষরাজিসুশোভিত লুম্বিনী উপবনের এক মনোহর প্রদেশে তিনি প্রথম আবির্ভূত হইলেন;—কিন্তু তৎপূর্ব্বেই শুচি সাধ্বী ধর্ম্মগতপ্রাণা মহারাণী মায়া দেবীর কুক্ষিভেদ করিয়া ষড়দন্ত সুঠাম শ্বেতবর্ণ করী রূপে তিনি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। করীর লীলাচঞ্চল শুণ্ডে পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক্ রূপে একটি শ্বেত পদ্ম তখন শোভা পাইয়াছিল। পরে নির্ব্বাণ-মুক্তিকামী মানব বলিয়া উঠিল—'ফুল নে মা, ফুল নে। রক্ত নহে, ফুল দিয়ে হয় তোর পূজা।' যজ্ঞবেদীর উপর তখন শ্বেত রক্ত নীল পদ্মের স্তূপ উঠিল। বাঙ্গালাদেশেও এই নূতন প্রেমের বন্যা বহিল এবং বাঙ্গালার তিন-চতুর্থাংশ লোক বহুদিনের জন্য এই রাজ-তপস্বীকেই গুরু বলিয়া মানিল, ইষ্ট বলিয়া লইল, দেবতা বলিয়া

অর্চ্চনা করিল, এবং "দশাকৃতিকৃতে" শ্রীকৃষ্ণের একটি আকৃতি বলিয়া তাঁহার স্তব রচনা করিল। ধর্ম্ম তখন ত্রিপাদশূন্য খঞ্জ হইয়াছেন— বাকি ছিল একটি চরণ মাত্র!

কিন্তু ধর্ম্মের যখন তিনটি চরণই বর্ত্তমান ছিল, সেই ত্রেতাযুগে রাক্ষস-শক্তিকে ধূলিলুণ্ঠিত করিতে, দর্প ও দম্ভের চূড়ামণি পরশুরামকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ক্ষাত্রতেজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার আসিবার প্রয়োজন ছিল—আর প্রয়োজন ছিল ভারতের নারীমর্য্যাদাকে মণি-মরকতবিনির্ম্মিত পাদ-পীঠের উপর রচনা করিতে এবং সত্যকে মূর্ত্তি দিতে! তিনি তখন আসিয়াছিলেন কোশলের মহাপরাক্রান্ত রাজ-চক্রবর্ত্তীর প্রাসাদে। সেবারে ঋষিরা যজ্ঞান্তে হোমশিখার দ্বারা তাঁহার আবাহন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের চরুর ভিতরে আবির্ভূত হইয়াছিল তাঁহার শক্তি এবং সেই চরুর সঙ্গেই উহা প্রবেশ করিয়াছিল মহারাণী কৌশল্যার দেহে। তিনি অযোধ্যায় আবির্ভূত হইলেন—ভারতের নানা স্থানে পূজা পাইলেন এবং তাঁহার উদ্দেশে বাঙ্গালার নানা স্থানে রচিত মন্দিরে শ্রীরামমূর্ত্তি ভক্তির পুষ্প চন্দন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ শতকে বিদ্যার অহঙ্কার যখন বঙ্গদেশে প্রেমধর্ম্মের প্রশান্ত সুষমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, শ্রীভাগবত ভক্তি হারাইল—মধুশূন্য মধুপপরিত্যক্ত মধুচক্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন যোগের নামে ছদ্মবেশী ভোগ উগ্রবীর্য্য অসংখ্য ভৃঙ্গরোলের মত বিষলিপ্ত গুপ্ত হূলের সুতীক্ষ্ণ মুখ তুলিয়া ধরিল—তখন আবার তিনি আসিলেন।

দেখিয়া সে রূপ মদন মূরছে
কুলের কামিনী যত।
মুনির মানস জপ তপ ছাড়ে
ও রূপ দেখিয়া কত। —চণ্ডীদাস।

শুধু বাহিরের রূপ নহে তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য্য তখন ভুবন জয় করিল—কাশ্মীর হইতে কুমারিকা—ভারতের সকল সরস্বতীর করের বীণা —তখন ঝরা-ফুলের মত খসিয়া পড়িল ! দিগ্বিজয়ী কেশব-কাশ্মীরীর দল তখন বিদ্যার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অন্ধকারে মুখ লুকাইলেন। মার্দ্দলের তালে তালে হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সাগর হইতে সাগরতটে বাজিতে লাগিল—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

—চৈতন্য চরিতামৃত।

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব কবিব।
তাডন ভৎর্সনে কাবে কিছু না বলিব ॥

হরিনামযজ্ঞের তখন যে মহোৎসব আরম্ভ হইল তাহার প্রসাদ লইবার জন্য আচণ্ডাল ছুটিয়া আসিতে লাগিল। জ্ঞান-মার্গের কঙ্কর-কণ্টকপূর্ণ ক্লেশকর পথ পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীর প্রকাশানন্দ পর্য্যন্ত প্রেমভক্তির বন্যায় দেহ-মন ভাসাইলেন। ভক্তগণ যুক্তকরে স্তব করিতে লাগিল—

রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো
সীতে রাম শিবে শিব।
যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং
যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে ॥

—চৈতন্য চরিতামৃত।

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে আবার যখন তাঁহার আসিবার প্রয়োজন হইল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচী তখন নিজের উপর প্রত্যয়

হারাইয়া আত্মসংস্কৃতি ও সাধনাকে বিস্মৃত হইয়াছে এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না! নিজের চিরদিনের তিলক-চন্দন ও নামের মালা তাহার অবসাদগ্রস্ত অঙ্গ হইতে তখন প্রতিদিন স্খলিত হইতেছে! বাগ্মী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, পণ্ডিত শশধর, ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম প্রভৃতি কেহই আর তখন তাহাকে পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারিতেছেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ সত্য, গীতা-ভাগবত সত্য, বেদ-উপনিষদাদিতে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব আছে সে সকলই সত্য এবং সাধন-লব্ধ আত্মানুভূতির দ্বারা সেই সত্যকে চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়!

পাশ্চাত্য বিদ্যার গরিমায় ভারত তখন ঝল্-মল্ করিতেছিল বলিয়া এবার তাহারই তীব্র প্রতিবাদ রূপে তিনি বিদ্যার সকল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া গোপনে আসিলেন—জনসাধারণের মত হইয়া, সহজ ও সরল হইয়া এবার তিনি বাঙ্গালার একটি অখ্যাত পল্লীভবনে আবির্ভূত হইলেন। ভারতের প্রাণ তাহার গ্রামেই স্পন্দিত হয়—সেই গ্রামে যাহারা থাকে তাহাদের অধিকাংশই বিদ্যাহীন—প্রাণহীন নয়। সেই প্রাণকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত এবার তিনি গ্রাম্যতার আবেষ্টনের মধ্যেই নিজেকে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। গ্রামের দুঃখই যে ভারতের সত্যকার রূপ এবং সেই দুঃখ দূর করাই যে প্রকৃত নারায়ণ-সেবা এই ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করাই এবারকার আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সহরের বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন এবং বিচিত্র পরিচ্ছদ ও নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গী যে নিতান্তই কৃত্রিম—এবার তাহাই প্রচার করিবার প্রয়োজন ছিল, আর প্রয়োজন ছিল—সকল প্রকার ধর্ম্মবিদ্বেষ ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত মতবাদ দূর করিয়া দিয়া সমন্বয় সাধন এবং নারীকে সত্য সত্যই জগন্মাতার প্রতিমারূপে পূজাপীঠে উপস্থাপন।

ভারতের চারি সহস্র বৎসরের সঞ্চিত তপোপ্রভাব এবার দেব-নররূপে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালাদেশকে সমুজ্জ্বল করিয়া দিল। সেই দেব-মানবের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল বিশ্বমানবের মুক্তিমন্ত্র—বেদ-উপনিষদ্, গীতা-ভাগবতাদির বিস্মৃত ভাষ্য। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সূত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ আসিলেন ব্যঞ্জনা—শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণ আসিলেন অনুভূতি—শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মন্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ আসিলেন তাহার মূর্ত্তি। পুরাতন এবার নূতন বেশে আসিয়া দেখা দিলেন এবং মূর্খ-পণ্ডিত, পাপী-পুণ্যবান্, স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ. হিন্দু-অহিন্দু সমানভাবে সকলের কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। ভগবান্ যীশুখ্রীষ্ট জগতের জন্য একবার মাত্র ক্রুশের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, আর বাঙ্গালার এই যীশু মানবের জন্য প্রতিদিন ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াও তাহাদের মঙ্গল বিধানই করিয়া গিয়াছেন!

কামারপুকুরের ধর্ম্মপ্রাণ একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে বারাণসীতে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ দর্শন করিয়া পিতৃকৃত্য করিবার জন্য গয়াধামে আসিলেন এবং স্বপ্নে দেবাদেশ পাইলেন—'ক্ষুদিরাম, আমি তোমার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়াছি। পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তোমার সেবা লইব।' এদিকে ক্ষুদিরাম-পত্নী চন্দ্রাদেবী কামারপুকুরের গৃহে স্বপ্নে নানারূপ দিব্যদর্শন পাইতে লাগিলেন। একদিন গৃহের নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরের পার্শ্বে যাইতেই দেখিলেন, শান্তিনাথ মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে একটি দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল! চন্দ্রাদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন!

এই ঘটনার কয়েক মাস পর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ, ফাল্গুনী শুক্লা-দ্বিতীয়া)। জন্মের পর মাতাপিতা বালকের নাম রাখিলেন—গদাধর।

(৩)

বাঙ্গালার বালকদিগের বাল্য যেরূপে কাটে, গদাধরের বাল্য ঠিক সেরূপে কাটিল না। অকুতোভয়তা, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই একান্ত প্রিয় হইবার ক্ষমতা, রোগহীন সুস্থ সবল দেহ, অভিনব একাগ্রতা, মেধা ও প্রতিভা, সৌন্দর্য্যলিপ্সা ও ভাবুকতা, সকল অবস্থার মধ্যেই চিত্তের অসামান্য প্রসন্নতা, চিন্তাশীলতা ও নির্জ্জনপ্রিয়তা, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি গদাধরের বাল্যকালকে অপর বালকদিগের বাল্যকাল হইতে বহুলাংশে পৃথক্ করিয়া দিল। "তাঁহার প্রেমিক-হৃদয় তাঁহাকে কখনও কাহারও অনিষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না।...হৃদয় স্পর্শ করে এমনভাবে কোন কথা না বলিতে পারিলে, উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হউক না কেন, বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সর্ব্বথা তদ্বিপরীতাচরণ করিয়া বসিত।" পিতার মৃত্যুর পরই সংসারের অনিত্যতার চিন্তা তাঁহাকে অনেকাংশে উদাসী করিয়া তুলিল। গদাধর যখন কৈশোরের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন হইতেই সর্ব্বত্যাগী সাধুসন্ন্যাসিদিগের সেবায় তাঁহার অত্যধিক আনন্দলাভের স্বভাব অনেকেরই প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন-কোন দিন যখন তিনি বিভূতি-বিভূষিতাঙ্গ হইয়া কৌপীন পরিয়া হাসিতে হাসিতে মাতৃ সন্নিধানে আগমন করিতেন, মনে হইত শিশু-শিব আসিয়া যেন ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, কিশোর গদাধরের প্রতিভা তখন নানা সাধারণ কাজের ভিতর দিয়াও বিকশিত হইতেছে। গ্রামে আহূত পণ্ডিত-সভা যে দিন কোনও জটিল তত্ত্বের মীমাংসায় শুধু তর্কযুদ্ধের কলরোলে মুখরিত হইতেছিল, গদাধর সেই জটিল গ্রন্থি কাটিয়া দিয়া যখন সহজ-সমাধান করিয়া দিলেন, পণ্ডিত-সভা তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে

সেই কিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মানুষী-তনুকে আশ্রয় করিয়া যে, ভূতমহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন তখন তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। পূর্ব্বাপরই দেখা যায় অবতার পুরুষদিগকে খুব অল্প লোকেই চিনিতে পারে। নহিলে এই কিশোরের নানা দিব্য-দর্শন ও ভাব-সমাধির প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া লোকে তাঁহাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিবে কেন? লোকে দেখিতে লাগিল এই কিশোরের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রতিদিনই প্রবৃদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার দিকে তিনি উৎসাহ-হীন। মেধা, বুদ্ধি, একাগ্রতা, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি সবই পুত্রের আছে, অথচ পাঠে বিরাগ দেখিয়া মাতা চন্দ্রাদেবী এক একদিন অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া পাইতেন। সর্ব্বদাই ভাবিতেন—জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার একা কিরূপে সংসারের ব্যয়-ভার বহন করিবে? বিদ্যাহীন গদাধর ত কোনও দিনই কোনও কাজে লাগিবে না। কেতাবী-বিদ্যার অভিমানকে বিদ্যাহীনতার প্রস্তরের উপর সবেগে ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই যে গদাধরের আগমন—চন্দ্রাদেবী তাহা কিরূপে বুঝিবেন? রামকুমারই বা তাহা কিরূপে জানিবেন? তিনি যখন নিজের টোলে পড়াইয়া গদাধরকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিবার জন্য কলিকাতায় আনিবার আয়োজন করিলেন—তখন ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া বলিলেন—"চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; এমন বিদ্যা শিখিব যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!" যাহা হউক, রামকুমার তাঁহার কেতাবী-বিদ্যা-বিরোধী বিদ্রোহী ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিয়া দেব-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রধানতঃ দেব-সেবা এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিছু পাঠ অভ্যাস—ইহাই তখন গদাধরের কার্য্য হইয়া উঠিল।

* * * *

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা জানবাজারের প্রথিতকীর্ত্তি কৈবর্ত্তজাতীয়া রাণী রাসমণীর কালীবাড়ী যেদিন গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইল—বাঙ্গালার ইতিহাসে শুধু নহে, ভারতের ইতিহাসে, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবা দিন দিনই যেরূপ দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে তাহাতে বলিতে পারি—সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভ দিন, বিশ্বের ইতিহাসে কয়েকটি মাত্র স্মরণীয় দিনের মধ্যে একটি। সেদিন সেখানে বর্ত্তমান যুগের দেব-মানবের লীলাস্থলী সুনির্ম্মিত হইয়াছিল, সেইখানেই নূতন করিয়া আবার প্রমাণিত হইয়াছিল 'ত্রিভুবন মায়ের মূর্ত্তি'—সেইখানেই লীলা করিয়াছিলেন "অবতার-বরিষ্ঠ" ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ—সেইখানেই ভগবানের চরণরেণু হইতে উদ্ভুত হইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও প্রভুর চরণাশ্রিত অন্যান্য গোস্বামিপাদগণ—উত্তরকালে ত্যাগ, সংযম, সন্ন্যাস, সাধনা ও সিদ্ধির জগতে যাঁহারা নিজেরাই এক একজন দিক্‌পাল রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শত শত ত্রিতাপতাপিত নর নারীকে শান্তির পথে, মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছেন; অবলম্বনশূন্য হইয়া যাহারা এতদিন স্রোতের শৈবালের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছিল, গোস্বামিপাদগণ তাহাদিগকে এমন একটি মহদাশ্রয়ে লইয়া গিয়াছেন যে, সেই নিরাপদ বন্দরের আশ্রয়ে শত সহস্র নর নারীর ঝটিকা-তাড়িত, তরঙ্গের পর তরঙ্গে আহত, ছিন্নভিন্ন-প্রায় সাধের তরণীগুলি আবর্ত্তভীষণ বিক্ষুব্ধ অপার জলধির অতল-তলে ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইতে হইতে শেষে অনায়াসে বাঁচিয়া গিয়াছে! এই সেই দক্ষিণেশ্বর, যেখানে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের এক তিমিরঘোরা অমাবস্যার নিশীথে ফলহারিণী কালিকা পূজার পুণ্যতিথিতে জগতের মা মানবীর রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন আত্মারাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাসমণ্ডপে এবং ঠাকুর ষোড়শী-পূজার অন্তে

"আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।" (১) একদিন হিমালয়ের কোনও তপোনিকুঞ্জে হৈমবতীর লীলায়িত চরণবিক্ষেপের তালে তালে ফুল ফুটিতে লাগিল, বিহঙ্গ গাহিতে লাগিল, তুষারাহত বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায় নবীন ফল পত্র শোভা পাইতে লাগিল এবং অকালে বসন্তের সমাগম হইল,—সেদিন সেখানে তাপস-রাজের নয়নবহ্নি যোগভঙ্গকারী কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়াছিল; দক্ষিণেশ্বর বাঙ্গালার সেই তপোনিকুঞ্জ, যোড়শীপূজার মসিবর্ণ রজনীতে যেদিন শিবের নয়নবহ্নিতে কন্দর্প আবার ভস্মীভূত হইয়াছিলেন!

এই সেই দক্ষিণেশ্বর যেখানে দীর্ঘ দিনের কঠিন ও নির্জ্জন তপস্যার পরেও জগন্মাতার দর্শন না পাইয়া তপস্বী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন—মাকে যে পাইল না তাহার আর জীবনে প্রয়োজন কি? হৃদয়ে তখন নিদারুণ যন্ত্রণা—অহরহ মনে হইতেছে 'গাম্‌ছা-মোড়ার' মত কে যেন হৃদয়কে নিঙড়াইতেছে, তখন একদিন----

ভবতারিণীর ধূপধূমগন্ধামোদিত নবরত্ন মন্দিরে—

'বেগে ঋষি নিলেন অসি
ভীষণ ক্ষুর-ধার,
ঝলক্ দিয়ে চিকিয়ে ওঠে
ফলকখানি তার।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

পাষাণময়ী চেতন হ'লো—
হ'লো আচম্বিতে,
সোনার নূপুর উঠ্‌লো বেজে
দেবীর চরণ-পাতে।
আসন থেকে নামি ধীরে
মধুর হাসি হেসে,
খড়্গখানি নিলেন টানি,
ঋষির কাছে এসে।
দেবীর দেউল পূর্ণ হ'লো
হাসির কল-রোলে—
সুরধুনীর কূলে।'

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে তখন যে আনন্দের লহর উঠিল—

সেই লহরে জন্ম হ'লো
মায়ের চরণ মূলে—
যুগের ঠাকুর জগৎগুরু
সুরধুনীর কূলে। (১)

সমাধিতে দুই দিন কাটিয়া গেল; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে লাগিলেন—"ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!" ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন—"এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্ম্মিমালা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপরে নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া

(১) জগদ্‌গুরুর জন্ম—বারাকপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির প্রচার শাখা।

সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।" তাহার পর দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, যে দিকে চাহিতে লাগিলেন, সেই দিকেই—"মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্ত্তি!—দেখিতাম ঐ মূর্ত্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।" (১) সাধক রামপ্রসাদের গান সেদিন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল—

"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি .
জেনেও কি তুমি তা'ও জান না॥"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"মার সেই মন্দিরের ছাদের আলিশায় যে ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্ত্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাঁহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, এরূপ স্থির নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া মার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।......ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দু সমূহ দেখিতে পাইতাম, কখনও বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখনও বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতাম।......মার নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—মা আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুইই তাহা আমাকে শিখাইয়া দে।" (২)

এতদিন জগন্মাতার পূজা করিতে বসিলে বা ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিতেন—মার শুধু হাতখানি বা চরণখানি—কিন্তু প্রথম পূর্ণ-দর্শনের পর হইতে আর সে ভাব রহিল না। এখন সর্ব্বক্ষণ

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।
(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

দর্শন, সর্ব্বক্ষণ নূপুরধ্বনি শ্রবণ, যখন অভিরুচি তখনই স্পর্শন—এখন সর্ব্বক্ষণ মার শ্রীবদননিঃসৃত আদেশ ও উপদেশ প্রাপ্তি চলিতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—"নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্য সত্যই নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির-দেউলে মা'র দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনও পতিত হইতে দেখি নাই। আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর-তলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্য সত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখনও কলিকাতা, এবং কখনও গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।" (১) এই ভাবে সাধনার প্রথম চারি বৎসর (১৮৫৫-১৮৫৮ খৃঃ অঃ) মানবের পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত হইয়া গেল। দক্ষিণেশ্বরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত রাজনগরী কলিকাতার বাঙ্গালী তখন নিজের জাতীয় সংস্কৃতি ও সাধনমার্গ অবজ্ঞার সহিত পরিহার করিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিতেছিল! সে বাঙ্গালীর কেহ তখন দক্ষিণেশ্বর-তীর্থের কোনও সন্ধান লইল না; ভারতের বেদ ও উপনিষদ্‌গুলিকে ফরাসী, জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক তত্ত্বের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে পরম রমণীয় একটি নবীন ধর্ম্মতত্ত্বের পশ্চাতে পশ্চাতে তাহারা তখন ছুটিতে লাগিল এবং প্রাচ্যের ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধনার মূর্ত্তিকে হ্যাট-কোটবুট পরাইয়া জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য ভাবে উন্মত্ত ঠাকুর তখন ইতর সাধারণের চক্ষে পাগল হইয়াছেন! পরে তিনি নিজে বলিয়াছেন—"এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিল মাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না।……দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত।" (১)

(৪)

১৮৫৯ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে চারি বৎসর গেল—তাহারই ভিতর বাঙ্গালার দক্ষিণেশ্বর ভারতের শক্তিপীঠ কামাখ্যা হইয়া উঠিল। পুত্রহীনা রাণী রাসমণি আর তখন বাঁচিয়া নাই। জগন্মাতার সেবার জন্য দিনাজপুর জেলায় দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা দেবোত্তর-সম্পত্তি করিয়া দিয়া তিনি তখন ৺কালী-ঘাটে আদি-গঙ্গা তীরে দেহ রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার জামাতা মথুরা মোহন তখন রাসমণির সকল ধন-সম্পদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। ঠাকুর উন্মত্ত হইয়াছেন, শ্রীশ্রীভবতারিণীর সেবা-পূজা তাঁহার দ্বারা আর চলিতে পারে না—পূজার ফুল মার চরণে না দিয়া তিনি নিজের মস্তকে ও চরণে দেন—ভোগ নিবেদন না করিয়াই নিজের মুখে তোলেন—ইত্যাকার নানাবিধ অভিযোগ মথুর বাবু নিত্য নিত্য শুনিতে লাগিলেন। তিনি যদিও ছিলেন ঘোর সংসারী তবুও ঠাকুরের প্রভাব তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল। একদিন তিনি ঠাকুরকে বলিলেন—'ঈশ্বরকেও নিজের আইন মেনে চল্‌তে হয়—নতুবা লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি করুন দেখি। সেত তাঁর আইন নয়।' এই কথার পর একদিন মথুর দেখিলেন—সত্য সত্যই রক্তজবাফুলের গাছে একটি শাখায় লাল ও অপর শাখায় শ্বেত জবা ফুটিয়াছে! আর এক দিন কালীবাড়ীর শিব-

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহিম্ন স্রোত্র পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর একেবারে আত্মহারা হইয়া বলিতে লাগিলেন—

অসিত গিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহিত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।

—হে ঈশ্বর, যদি শ্যামকায় হিমালয়ের মত পুঞ্জ পুঞ্জ মসির রাশি সিন্ধুর ন্যায় গভীর পাত্রে রাখিয়া কল্পতরু-শাখাকে লেখনী করিয়া পৃথিবীর ন্যায় অতি বিস্তৃত পত্রে স্বয়ং সরস্বতীও অনন্তকাল তোমার মহিমা লিখিতে থাকেন—'তদপি তব গুণানাম্ পারং ন যাতি।'

মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঠাকুরের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষে বারি বহিল—সংস্কৃত স্তবের শ্লোকাবলী সেই ধারায় ভাসিয়া গেল। ঠাকুর তখন চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"মহাদেব গো,—তোমার গুণের কথা আমি কেমন ক'রে বল্‌বো।" ঠাকুরের রোদনধ্বনি শুনিয়া কালীবাড়ীর কর্ম্মচারিবৃন্দ সেখানে ছুটিয়া আসিল। মথুরবাবুও এই দৃশ্য দেখিলেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মন-প্রাণ ঠাকুরের শ্রীচরণে যাইয়া আশ্রয় লইল।

আর এক দিন ভাবমগ্ন ঠাকুর পাদচারণ করিতেছিলেন। মথুর বাবু দূর হইতে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইলেন। পরে তিনি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"আমি স্পষ্ট দেখ্‌লুম, যখন এদিকে আগিয়ে আস্‌চ, দেখ্‌চি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি যে সাক্ষাৎ মহাদেব।"

যতই দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের গুরুভাবের পরিচয় ক্রমে

ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। গুরুভাবের অধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহে মহাভাবের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অজ্ঞ লোকে মনে করিল ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি হইয়াছে।

এই সময়ে একদিন প্রভাতে ঠাকুর মাকে সাজাইবেন বলিয়া পুষ্প-চয়ন করিতেছেন, এমন সময় কালীবাড়ীর ঘাটে (ঘাটে একটি বকুল গাছ ছিল বলিয়া ইহাকে লোকে 'বকুল তলার ঘাট' বলিত) কোথা হইতে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। নৌকা হইতে বাহির হইলেন গৈরিকধারিণী আলুলায়িত সুদীর্ঘকেশা তেজঃপুঞ্জময়ী একটি ভৈরবী ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে দেখিয়া সজল নয়নে কহিলেন—"বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ? তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখা পাইলাম।"

ঠাকুর দেখিলেন ভৈরবী তাঁহার অপরিচিতা। তিনি কোনও দিনও তাঁহাকে দেখেন নাই। কহিলেন—

"আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে মা?" ভৈরবী বলিলেন—"তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, একথা ৺জগদম্বার কৃপায় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুই জনের দেখা পূর্ব্ব (বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।" (১)

ঠাকুরের সহিত নানা কথার পর ব্রাহ্মণী কালীবাড়ীর ভাণ্ডার হইতে যে সকল খাদ্যসম্ভার পাইলেন সে সমুদয় লইয়া গিয়া পঞ্চবটীতলায় রন্ধন করিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠে ছিল রঘুবীর-শিলা। ব্রাহ্মণী সেই শিলাময় দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিতে করিতে ভাবে সমাধিমগ্না হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর চাহিয়া দেখিলেন "বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত ভাবাবিষ্ট"

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই ভোগ গ্রহণ করিতেছেন! ব্রহ্মণী আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইয়া বলিলেন— "আমার সকল উপাসনা আজ শেষ হইল। আমি জীবন্ত রঘুবীরকে পাইলাম।"

ব্রাহ্মণী তখন দ্বিধা বোধ না করিয়া তাঁহার পরম শ্রদ্ধার রঘুবীর-শিলা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন। "শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণপূর্ব্বক আগমনের যে সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল।" সকল লক্ষণ মিলাইয়া পাইয়া ব্রাহ্মণীর দৃঢ় ধারণা হইল, "শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ঠাকুরের শরীর-মনাশ্রয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণী তখন প্রচার করিলেন—'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ঠাকুরের এই ব্যাধি কোনও সাধারণ ব্যাধি নহে —ইহা দিব্যোন্মত্ততা।' ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বিশেষ পীড়াপীড়িতেই অবিলম্বে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে কালীবাড়ীতে আহ্বান করা হইল। কলিকাতার সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক বৈষ্ণবচরণ আসিলেন। বীরভূম অঞ্চলের ইঁদেশের অসাধারণ সাধনশক্তিসম্পন্ন গৌরী পণ্ডিতও আসিলেন। দক্ষিণেশ্বরে একটি ছোট-খাটো পণ্ডিত-সভা বসিল। পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া স্থির করিলেন—ঠাকুরের দেহ-বিকার কোনও ব্যাধি নহে—উহা মহাভাব, যাহা শ্রীচৈতন্যের দেহে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই উনিশ প্রকারের অবস্থার "বড়-জোর দুই-পাঁচটাই" ভাগ্যবানের জীবনে উপস্থিত হয়। ভাবময়ী শ্রীরাধিকা বা ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ভিন্ন আর কাহারও এরূপ ভাব দেখা যায় নাই। জীব এই উনিশ প্রকার মহাভাবের বেগ সহ্য করিতে পারে না। ভক্তিবিমুগ্ধ বৈষ্ণবচরণ তখনই মুখে মুখে রচনা করিয়া ঠাকুরের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী তখন "তাঁহার আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল" ঠাকুরকে "অনুভব করাইবার জন্য" সচেষ্ট হইলেন। জগদম্বার স্নেহ-পুত্তলী ঠাকুর তাঁহার মা'র আদেশ লইয়া যখন বিপুল উৎসাহে তান্ত্রিক সাধনায় নিযুক্ত হইলেন, ব্রাহ্মণী তখন নিজে সেই সাধনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিলেন। গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সমাহৃত পঞ্চ প্রাণীর শির-কঙ্কালে বিল্বতরুমূলে দুইটি পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত হইল। তথায় জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুর ডুবিয়া গেলেন। এই ভাবে একে একে ৬৪ খানি তন্ত্রের সাধনায় ঠাকুর যখন সিদ্ধ হইলেন তখন "দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্য্যন্ত" কত যে দেব-দেবী-মূর্ত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। একখানি তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতেই সাধকের জীবন কাটিয়া যায় কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র তিন দিন মধ্যেই এক এক খানি তন্ত্রে অসামান্য সিদ্ধি লাভ করিলেন। সেই দিন বাঙ্গালার এই দক্ষিণেশ্বর ভারতের মহাশক্তি-পীঠ হইয়া গেল।

এই দক্ষিণেশ্বরে তান্ত্রিক-সাধনায় যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে গেলে তাহাই তন্ত্র-শাস্ত্রকে নব মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তান্ত্রিক-মার্গানুগামিদিগের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। দুর্ব্বল সাধকের সংযমরাহিত্য যে পথটিকে শ্রদ্ধার আসন হইতে অবনমিত করিয়াছিল, মাতৃচরণার্পিত-জীবন ঠাকুরের ন্যায় বীর্য্যবান্ সাধক তাহাকে আবার গৌরবের আলোকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, পঞ্চ 'ম'-কারের ব্যভিচার তন্ত্রানুমোদিত সাধন-ক্রিয়া নহে—নারীমাত্রকেই মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া এবং বিন্দুমাত্রও কারণবারি গলাধঃকরণ না করিয়াও সিদ্ধকাম বীরাচারী হইতে পারা যায়। ঠাকুর দেখাইয়া দিয়াছেন যে, "রূপরসাদি যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃ

পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযম সহায়ে বারংবার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম এবং সর্ব্বভূতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা কবিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসব হইতে উপদেশ করিয়াছেন।" (১)

তন্ত্রসাধনার ফলে এই দক্ষিণেশ্বরেই অদ্বৈতজ্ঞান চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল; সে বিকাশ ছিল এতই উজ্জ্বল এবং এমনি বিস্ময়কর যে ভারতের অন্য কোন তন্ত্রপীঠে সেরূপ দেখা যায় নাই। এইখানেই ঠাকুরের "শরীরবোধ" একেবারেই দূর হইয়া গেল—"পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি, চেষ্টা করিলেও অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। ঐ সকল কখন্ কোথায় যে পড়িয়া যাইত, তাহা জানিতে পারিতেন না।······নতুবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনি যে কখন এইরূপ করেন নাই, বা অন্তত্রদৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন—ঐ সকল সাধনে (তন্ত্রোক্তসাধন) শেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহা পবিত্র বস্তু সকলের সহিত তুল্য দেখিতেন! বলিতেন—তুলসী ও সজিনা গাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোধ হইত।" (২)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২) ঐ

"প্রসুপ্ত ভুজগাকারা" কুলকুণ্ডলিনী রূপকের আচ্ছাদনে আবৃতা থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বে কতিপয় যোগী ও সাধকেরই শুধু জ্ঞানগম্যা হইতেন। দক্ষিণেশ্বরে তান্ত্রিক-সাধনা আরম্ভ করিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করিলেন—"কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া মস্তকে উঠিবার কালে মূলাধারাদি সহস্রার পর্য্যন্ত পদ্ম সকল ঊর্দ্ধমুখ ও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে।" ঠাকুর কৃপা করিয়া এই দক্ষিণেশ্বরেই তাঁহার ভক্তদিগের নিকট সেই মহাশক্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই যিনি ছিলেন একান্ত রহস্যাবৃতা, তিনি হইয়াছেন সুপ্রকাশিতা। ঠাকুর বলিতেন—"ছাখ, সড়্‌সড়্‌ ক'রে একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে ওঠে! যতক্ষণ না সেটা মাথায় গিয়ে ওঠে—ততক্ষণ হুঁস্‌ থাকে; আর যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠ্‌লো আর একেবারে বেব্‌ভুল হ'য়ে যাই—তখন আর দেখা-শুনাই থাকে না, তা' কথা কওয়া! কথা কইবে কে?—'আমি তুমি' এ বুদ্ধিই চ'লে যায়!......ছাখ্‌, যেটা সড়্‌সড়্‌ ক'রে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে—যথা, পিপীলিকা-গতি—যেমন পিঁপ্‌ড়েগুলো খাবার মুখে ক'রে সার দিয়ে সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে যায়, সেই রকম পা থেকে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠ্‌তে থাকে; মাথা পর্য্যন্ত যায় আর সমাধি হয়! ভেকগতি,—ব্যাঙ্‌গুলো যেমন টুপ্‌-টুপ্‌-টুপ্‌, টুপ্‌-টুপ্‌-টুপ্‌ ক'রে দু' তিন বার লাফিয়ে একটু থামে, আবার দু' তিন বার লাফিয়ে একটু থামে—সেই রকম ক'রে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠ্‌ছে বোঝা যায়; আর যেই মাথায় উঠ্‌লো আর সমাধি! সর্পগতি,—সাপগুলো যেমন লম্বা হ'য়ে বা পুঁটুলি-পাকিয়ে চুপ্‌ ক'রে প'ড়ে আছে, আর যেই সামনে

খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিল্-বিল্ কিল্-বিল্ ক'রে এঁকে-বেঁকে ছোটে,—সেই রকম ক'রে ওটা কিল্-বিল্ ক'রে একেবারে মাথায় গিয়ে ওঠে আর সমাধি (তারপর) পক্ষিগতি…বাঁদর গতি……"

"মনের স্বভাবতঃ নীচের তিন ভূমিতে ওঠা-নামা, ঐ দিকেই দৃষ্টি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি—খাওয়া, পরা, রমণ ইত্যাদি। ঐ তিন ভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে ওঠে তো তখন তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়, কিন্তু হৃদয়ে কখন কখন উঠ্‌লেও মন আবার নীচের তিন ভূমি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যায়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারো মন কণ্ঠে ওঠে তো সে ঈশ্বরীয়-কথা ছাড়া আর কোন কথা,—যেমন বিষয়ের কথা-টথা কইতে পারে না।… কণ্ঠে উঠ্‌লেও মন আবার গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যেতে পারে, তখনও সাবধানে থাক্‌তে হয়। তারপর কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ভ্রূমধ্যে ওঠে তো তার আর পড়্‌বার ভয় নেই—তখন পরমাত্মার দর্শন হ'য়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটার আর সহস্রারের মাঝে একটা কাঁচের মত স্বচ্ছ পর্দ্দা মাত্র আড়াল আছে! তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় যেন তাঁতে মিশে গেছি, এক হ'য়ে গেছি; কিন্তু তখনও এক হয়নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্য্যন্ত নামে—তার নীচে আর নাম্‌তে পারে না। জীবকোটিরা এখান থেকে আর নামে না—একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাক্‌বার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দ্দাটা ভেদ হ'য়ে যায়, আর তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামিশি হ'য়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে ওঠা।"

কুণ্ডলিনী মহাশক্তি কি, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইতে পারে। এই মহাশক্তি সম্বন্ধে স্বামী শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন—"উচ্চাবচ" যে ভাবই মনে আসুক্ না কেন, উহার সহিত কোন-না-কোন

প্রকার শারীরিক পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহা আর বুঝাইতে হয় না—নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়।···আবার সৎ বা অসৎ কোন প্রকার চিন্তার সবিশেষ আধিক্য কাহারও মনে থাকিলে, তাহার শরীরেও এতটা পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে—ইহার এইরূপ প্রকৃতি।······"

"পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন—যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে। এইরূপে ভাল-মন্দ দুই প্রকার ভাবের দুই প্রকার দাগের সমষ্টির স্বল্পাধিক্য লইয়াই তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত।···ভারতের যোগী-ঋষিরা বলেন, ঐ দুই প্রকার ভাব······ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পুনরায়, ভাল-মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত 'মূলাধার' নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে; জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ প্রেরণাশক্তিসমূহের উহাই আবাস ভূমি। ঐ সকলের নামই সংস্কার বা পূর্ব্ব-সংস্কার এবং ঐ সকলের নাশ একমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলে বা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে তবেই হইয়া থাকে। নতুবা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবার সময়ও জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটি "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" বগলে করিয়া লইয়া যায়।······"

"ইহজন্মে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল, তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।······যোগী বলেন, মস্তিষ্কমধ্যগত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ

পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডলিনী-শক্তির বিশেষ অনুরাগ, অথবা শ্রীভগবান্ তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগরিতা না থাকায় কুণ্ডলিনী-শক্তির সে আকর্ষণ অনুভব হইতেছে না। জাগরিতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলিনীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্ত্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ, মেরুদণ্ডের মূলে 'মূলাধার' নামক মেরুচক্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত সুষুম্নাবর্ত্ম।...... ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলিনী পূর্ব্বে পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়া থাকে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ড মধ্যে ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়।" কি ভাবে উহা মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয় শ্রীশ্রীঠাকুর বালকবোধ্য ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

"যোগশাস্ত্রে এই ছয়টি মেরুচক্রের নাম ও বিশেষ বিশেষ অবস্থান-স্থল পর পর নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগে 'মূলাধার', তদূর্দ্ধে লিঙ্গমূলে 'স্বাধিষ্ঠান', তদূর্দ্ধে নাভিস্থলে 'মণিপুর', তদূর্দ্ধে হৃদয়ে '[illegible]হত', তদূর্দ্ধে কণ্ঠে 'বিশুদ্ধ', তদূর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে 'আজ্ঞা'। এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্নাপথেই বর্ত্তমান,—অতএব "হৃদয়", "কণ্ঠ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তদ্বিপরীতে অবস্থিত মেরুমধ্যস্থ স্থলই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।"(১)

১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

আমরা তীর্থভ্রমণের জন্য বহু অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু ঘরের নিকটে যে মহাতীর্থ আছে তাহার প্রতি এখনও খুব শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বর শৈবের কাশী, বৈষ্ণবের বৃন্দাবন—দক্ষিণেশ্বর শাক্তের মহাপীঠ—শ্রীরাম-সেবকের পুণ্যতীর্থ অযোধ্যা। সকল তীর্থ, সকল সলিল সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরকে এমন মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে যে, শুধু হিন্দু কেন—খৃষ্টান্ এখানে ন্যাজারেথ নগরের সন্ধান পাইবেন, কারণ ঠাকুর শ্রী-যীশুর সাধনা করিয়া এইখানেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন—মুসলমান ইচ্ছা করিলে সন্ধান পাইবেন পবিত্র মক্কা নগরীর, কারণ ঠাকুরের ইস্‌লাম-সাধনা ও সিদ্ধিও এইখানেই ঘটিয়াছিল। তিনি যে শুধু ধর্ম্মসমন্বই করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে—তিনি এইভাবে তীর্থ-সমন্বয়ও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কখনও অন্য কোনও অবতারে এমন সমন্বয়-সাধন ঘটে নাই!

"সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামাদি ব্রজবালকের ন্যায় সখ্যভাবালম্বনে সাধনে স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।......মহাবীরকে আদর্শরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক দাস্য ভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী জন্মদুঃখিনী সীতার ও শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্ত্তির দর্শনলাভ (১) এই দক্ষিণেশ্বরেই ঘটিয়াছিল। এইখানেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

যো রাম দশরথ কি বেটা,
ওহি রাম ঘট্-ঘট্‌মে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।

(১) "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

অর্থাৎ, শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক জগদ্রূপে নিত্য প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্, মায়ারহিত নির্গুণ স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনের মধুর মহাভাবে আত্মহারা তখন তাঁহার দেহের প্রতি লোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হইত—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠারূপে প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রভুপাদগণ রাগাত্মিকা ভক্তির যে উনিশ প্রকার ভাবের কথা কহিয়াছেন তাহার যে-কোনো-একটা ভাবের সাধন করিতেই সাধকের সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়া যায়—কামারপুকুরের ঠাকুরের দেহে "একাধারে একত্র" সেই উনিশ প্রকার অন্তর্ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল! (১)
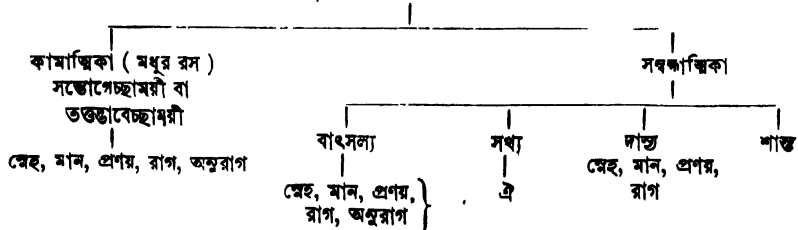
শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, প্রকৃতিভাবে সাধনার কালে ঠাকুর স্বপ্নেও কখনও নিজেকে পুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই! তিনি নিজে বলিয়াছেন—"স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোমকূপ সকল হইতে তাঁহার এই কালে প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গমন হইত এবং স্ত্রী-শরীরের ন্যায় প্রতিবারই উপর্য্যুপরি দিবসত্রয়

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

ঐরূপ হইত।” আমার ন্যায় সংসারমোহাচ্ছন্ন, জ্ঞান-বিশ্বাস-ভক্তি-হীন বিলাতি-ভাবাপন্ন যে-কেহ এই কথা শুনিলে হাসিয়া উঠিবেন—কহিবেন, আমাদের ‘ফিজিয়লজি’ এরূপ কথা বিশ্বাস করে না! তাহা করে না সত্য। কিন্তু ফিজিয়লজির দৌড় কতদূর? আরশুলা কাঁচপোকা দেখিতে দেখিতে কাঁচপোকাই হয়, ইহা কে না শুনিয়াছে? গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন ইহাই বা কে না পাঠ করিয়াছে? ভাবের এই লীলা-খেলাকেই প্রকাশ করিয়া সাধক কবি বিদ্যাপতি একদিন গাহিয়াছিলেন—

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম্ রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥

মনে পড়ে গীতগোবিন্দের সেই গান—

মধুরবলোকিত মণ্ডল লীলা।
মধুরিপুরহমিব ভাবন শীলা॥

আর মনে পড়ে—

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়নতারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা॥

—চণ্ডীদাস।

ফিজিয়লজি! ফিজয়লজি ছাই-পাঁশ! জড় বিদ্যা! তাহার শেষ যেখানে—প্রেম ও ভাবের আরম্ভ সেইখানে। মহাভাব তাহারও পর অনেক দূরে! দেবতা যেখানে বিরাজমান, মানুষের মাপকাঠি সেখানে পৌঁছিতে পারে না।

"মধুরভাবে পরাকাষ্ঠা লাভে ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈতভূমি ভিন্ন" অন্য কোন্ দিকে আর ঠাকুরের মন অগ্রসর হইতে পারে? হইলও তাহাই। কামনামাত্রেই যোগ্য গুরু আসিয়া উপনীত হইলেন—নর্ম্মদাপুলিনবিহারী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তোতাপুরী—জটাজুট-ধারী দিগম্বর—নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মদর্শনে সিদ্ধ দীর্ঘবপুঃ যোগী। ঠাকুরকে দেখিয়াই তিনি কহিলেন—'তুমি উত্তম অধিকারী, আইস তোমাকে বেদান্তের দীক্ষা দিব।'

ঠাকুর কহিলেন—'আমি জানি না, মা জানেন।' বেদান্তোক্ত কর্ম্মফল-দাতা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন দেব-দেবীর অস্তিত্ব তোতাপুরী মানিতেন না। তিনি দেখিলেন, শিষ্যটি একেবারেই অজ্ঞ এবং কুসংস্কারাপন্ন—কিন্তু বালকের মত সরল। শিষ্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

জগজ্জননীর প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ঠাকুর অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং শুভমুহূর্ত্তে সর্ব্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিবার জন্য দীক্ষিত হইয়া গুরু তোতাপুরীর সঙ্গে সঙ্গে হোম আরম্ভ করিলেন। মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রার্থনা করিলেন—"হে পরমাত্মন্! আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া তদেকচিত্ত হইতেছি।"

শাস্ত্রোক্ত এইরূপ নানা প্রার্থনার পর বিরজা হোম আরম্ভ হইল।

হোমধূমের গন্ধে পবন আমোদিত হইয়া উঠিল। গুরুর নির্দ্দেশ মত নানা আহুতি প্রদান করিতে করিতে শিষ্য কহিলেন—

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি—দারা, পুত্র, সম্পৎ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

"জীবে সেবা করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—সেদিন ভাগীরথীতটে এই মহামন্ত্রে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়া গেল। "জগদ্ধিতায়" —"নহি আত্মহিতায়"—এই মহামন্ত্রের বীজ সেদিন সেই হোমশিখার স্পর্শে দক্ষিণেশ্বরে জাগ্রত হইয়া অবলম্বনের সন্ধানে অনেকদিন পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে তীরে আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইয়াছিল। পরে যখন বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন্ স্থাপিত হইল, মন্ত্র তখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য শ্মশানচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল।

হোমাদি সুসম্পন্ন হইলে পর ঠাকুর ধ্যানে বসিলেন। গুরু তোতাপুরী যখন দেখিলেন শিষ্য সমাধিমগ্ন হইয়াছেন তখন ধীরে ধীরে সাধনকুটীর হইতে নির্গত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। একে একে তিনটি দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিল না। গুরু দেখিলেন শিষ্য গম্ভীর প্রশান্ত উজ্জ্বল বদনে ভূতলে অবস্থিত রহিয়াছেন—যেন একটি কাষ্ঠ-পুত্তলিকা। দেহে জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই— প্রাণ উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে অনন্ত অখণ্ড আলোকের দিকে, চিত্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-সাগরে লীন হইয়াছে।

তোতাপুরী স্তম্ভিত হইলেন। বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"ইয়ে কেয়া দৈবী মায়া!"

"বেদোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল" এই নির্ব্বিকল্প সমাধি। ইহার

পারে আর কিছু নাই। শিষ্য এক দিনে সেই চরম ফল লাভ করিলেন, যাহা পাইতে তাঁহাকে জীবনের চল্লিশ বৎসর কতই না কৃচ্ছ্রসাধন ও শ্রম করিতে হইয়াছে—তাই তোতাপুরীর এত বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল! কঠোর বৈদান্তিক তপস্বী তোতাপুরী তিন দিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন, শেষে এক দুই করিয়া সুদীর্ঘ একাদশ মাস থাকিয়া গেলেন এবং শেষে শিষ্যের নিকট পরাজিত হইয়া ভক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিলেন—মনে প্রাণে জ্ঞানে বিশ্বাস করিলেন যে জগতের মা আছেন—তিনিই আদ্যাশক্তি—তিনিই আবার পরব্রহ্ম।

অদ্বৈত মতে সাধনার পর ঠাকুর খ্রীষ্ট ও ইস্‌লাম মতে সাধনা করিয়া অচিরাৎ সিদ্ধ হইলেন এবং মনে মনে বুঝিলেন—যত মত তত পথ—সব পথেই ভগবানের নিকট যাওয়া যায়—কোনটাই মিথ্যা নহে; তবে যে যাত্রী যে পথ ধরিবে, তাহাকে তাহাতেই খাঁটি হইতে হইবে—সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

মধুর রসের সাধন-প্রবাহের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ভাসিয়া আসিয়াছিল ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় হৃদয়, আর এই নির্ব্বিকল্প সমাধি আনিয়া দিল অদ্বৈত জ্ঞানের প্রবল শাঙ্কর-অগ্নিশিখা। দ্বাদশ বৎসরের কঠোর সাধনার পর এইরূপে এতদুভয়ের মহামিলনে তখন দক্ষিণেশ্বরে যে মহাবস্তু উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই বস্তুই একালের অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব—সমস্ত বিশ্ব আজ যাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—বহুমূল্য প্রস্তরে বিরচিত গগনস্পর্শী সুরম্য সুর-সদ্ম আজ যাঁহার চরণে প্রতীচ্যের অর্ঘ্যরূপে অর্পিত হইয়া ভাগীরথীতটে শোভা পাইতেছে—যাঁহার অমৃতময়ী বাণী আজ "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে এবং চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিতেছে,—হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকেও আশা এবং সান্ত্বনা দিতেছে—

পথভ্রান্ত যে, তাহাকে আলোকোজ্জ্বল পন্থা দেখাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন অতি বৃহৎ শাল শাল্মলী, ওক্ বা সেগুন থাকে—তেমনি সেই সকল ছোট ছোট বাণীর মধ্যে—বাইবেল, কোরাণ—গীতা ভাগবত—বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি ফল্গুর গুপ্ত ধারার মত বর্ত্তমান আছে। মানব এখনও সে সকল বাণীর ভাষ্য রচনা করিবার মত যোগ্যতা লাভ করে নাই; অন্যে পরে কা কথা—এ যুগের শঙ্করাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সেই ব্রত ধারণ করিতে সাহস করেন নাই! বলিয়াছেন—'ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন গ্রন্থ লেখা যাইত পারে।'

(৫)

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের সবই অদ্ভুত। তাঁহার আবির্ভাব অদ্ভুত, বাল্যকাল ও কৈশোর-যৌবন অদ্ভুত,—তাঁহার বাণী অদ্ভুত—বিনা অধ্যয়নে জ্ঞান অদ্ভুত—তাঁহার প্রেম অদ্ভুত—সহানুভূতি অদ্ভুত—তাঁহার সরলতা অদ্ভুত—নিরভিমানিতা অদ্ভুত—তাঁহার কাম-কাঞ্চন ত্যাগ অদ্ভুত—নর-নারীর হৃদয় জয় অদ্ভুত—আর অদ্ভুত ইচ্ছা মাত্রেই, স্পর্শমাত্রেই, দৃষ্টিমাত্রেই অপরের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরণের শক্তি—কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার সাধনার আরম্ভ! এমন আর কখনও শুনা যায় নাই—অন্য কোন অবতারেও দেখা যায় নাই।

সাধনার অবসানে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের গুরু হইয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীভবতারিণীর সান্ধ্য-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা শানাই প্রভৃতির রব যখন নবরত্ন-মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় প্রহৃত হইয়া গঙ্গার কলতানের সঙ্গে দূর-দূরান্তরে ভাসিয়া যাইত, তখন ঠাকুর গৃহের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া অনাগত অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে উদ্দেশে বলিতেন—'[illegible]—আয়রে—তোরা আয়! আমি যে আর একা থাকতে পারি না', কখনও বা

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন—'মা তোর ত্যাগী ভক্তদিগকে আনিয়া দে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোর কথা বলিয়া আনন্দ করিতে পারি!' সমাধির অবস্থায় তিনি সেই সকল ভক্তদিগকে দেখিয়াছিলেন এবং তখন হইতেই তাঁহাদিগের মূর্ত্তি চিনিতেন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই (১) ঠাকুরেব অন্তবঙ্গ ভক্ত বা পার্ষদগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আসিবামাত্রই ঠাকুব চিনিতে পারিতেন—এই সেই! শেষ পার্ষদ (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) আসিলে পব ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'এই শেষ, আব কেহ আসিবে না।' অবতাবেব আবির্ভাব হইলেই তাঁহার পার্ষদগণেবও আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঈশা, মুসা, শাক্যসিংহ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকল অবতারেই দেখা গিয়াছে যে, অবতার সর্ব্বদাই পার্ষদ সঙ্গে কবিয়াই আসেন। অন্যান্য ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে পরে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। এ-ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বব এইভাবে তখন মহাপুরুষগঠনের আশ্রম হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর কোন্ দেশে, কোন্ বিশ্ববিদ্যাপীঠে মহামানবগঠনের এরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে? এই সকল মহাপুরুষগণ প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে ও পৃথিবীর নানা স্থানে বাঙ্গালী জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—বহুদিন পরে বাঙ্গালীবও যে একটা যুগ আসিয়াছে এবং সে যুগকেও যে অবহিত হইয়া মানিতে হইবে স্বামী বিবেকানন্দকে অগ্রণী করিয়া তাঁহারা সে পথ প্রস্তুত করিয়াছেন।

(১) নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), যোগেন্দ্র (স্বামী যোগানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), বুড়ো-গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ)।

The Life of Sree Ramkrishna—Romain Rolland (1929)। পার্ষদদিগের মধ্যে [illegible] একে একে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

ঠাকুরের সাধনা শেষ হইবার অনেক দিন পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার সুধী-সমাজে প্রকাশিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের নানা স্থানের সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু, সাধক এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার জ্বলন্ত জীবন্ত ধর্ম্মাদর্শ ও গুরুভাব দর্শনে নিজ নিজ জীবনে নব প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"ফুল ফুটিলেই মধুপ আপনিই আসে।" ফুলের সৌরভে তখন এবং পরে কত মধুপ যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক লোক তাঁহার একটিমাত্র দৃষ্টি লাভ করিয়া, কিংবা একটিমাত্র স্পর্শেই ধর্ম্মের আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধারণ দেহধারী একুশ দিনের অধিক জীবিত থাকিতে পারেন না—ঠাকুর এক সঙ্গে ছয় মাস কাল সেই সমাধিতে মগ্ন ছিলেন এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বিকল্প সমাধি ও গৈরিক দান করিয়া বিশ্বমানবের মুক্তিমন্ত্র প্রচার করিবার জন্য কর্ম্মভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহার অযাচিত কৃপাদান করিয়া ভক্ত কেশবচন্দ্রকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন—কেশবের ব্রাহ্মসমাজে তখন ঘোর পরিবর্ত্তন দেখা দিল। যে সমাজের প্রথম নগর-কীর্ত্তনের প্রথম গান ছিল—

তোরা আয়রে ভাই,
এতদিনের দুঃখের নিশা হ'লো অবসান।
নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।
নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার—
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি
নাহি জাতি বিচার।

সেই সমাজের গানে শেষে 'মা' আসিলেন, 'হরি'ও আসিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ গাহিতে লাগিলেন—

কত ভালবাসো গো মা মানব সন্তানে।
মনে হ'লে প্রেমধারা বহে দু'নয়নে॥'

এই গীত গাওয়া শেষ হইলে পর তাঁহারা আবার একখানি নূতন গান ধরিলেন—

কতদিনে হ'বে সে প্রেমসঞ্চার,
হ'য়ে পূর্ণকাম, বল্‌বো হরি নাম,
নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।

মূর্ত্তি-পূজা বিরোধী কেশবচন্দ্র শেষে "আধ্যাত্মিক দুর্গা পূজা", "মহাবিদ্যার পূজা", "লক্ষ্মী-পূজা", "নিরাকার গণেশ পূজা", "জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকের পূজা" প্রভৃতি করিতে লাগিলেন—দেবদেবীর শক্তি, গুণ বা ঐশ্বর্য্যেরই পূজা হইত—ঐশ্বর্য্যের প্রতীক প্রতিমার পূজা হইত না।

প্রথম দর্শনের পর বিদায়কালে যে কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে হাত তুলিয়া একটা ছোট নমস্কার মাত্র করিয়াছিলেন, পরে সেই কেশবচন্দ্রই অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার চরণে মাথা রাখিতেন (১), তাঁহার ভোজনপাত্র লইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন (২), ঠাকুরের ভোজনের সময় অনুগত ভক্তের মত আপন হাতে তাঁহার ভোজনপাত্র ও জলপাত্র তুলিয়া ধরিতেন; আহার হইয়া গেলেই ব্যজন করিয়া সেবায় রত থাকিতেন (৩) এবং [illegible]ও পাছে আর কেহ দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে নিজ গৃহের পূজাকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে মুষ্টি মুষ্টি পুষ্পাঞ্জলি দিতেন (৪)।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।
(২), (৩) বিশ্ববাণী—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও সমিতির মুখ-পত্র।
(৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

"পরমহংসদেবের সহিত সংস্পর্শে কেশবচন্দ্রের পরিবর্ত্তনই সংস্কার-যুগের পরিবর্ত্তন। কেননা, কেশবচন্দ্র শুধু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি সংস্কারযুগের সর্ব্বশেষ সুস্পষ্ট নেতা। কেশবচন্দ্র সংস্কার-যুগের সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি, সংস্কারযুগের প্রায় সমস্ত আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাই সংহত হইয়া তাঁহার মধ্যে এক সময়ে প্রতিবিম্বিত ও দেশ-বিদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পরিবর্ত্তন শুধু ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্ত্তন নহে। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ দেব সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্রের মত পরিবর্ত্তন ও কিছুকাল পরে বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মমত ও সাধন পরিবর্ত্তন হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর গত শতাব্দীর সংস্কার-যুগ (উনবিংশ শতক) কোন্ দিকে, কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।" (১)

(৬)

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ে গয়াতীর্থ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন ঃ—

"দেশ বিদেশ পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু-মহাত্মা দেখ্‌লাম কিন্তু (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এমনটি আর কোথাও দেখ্‌লাম না; এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখ্‌ছি, তাহারই কোথাও দু' আনা, কোথাও এক আনা, কোথাও এক পাই, কোথাও আধ পাই মাত্র; চার আনাও কোন জায়গায় দেখ্‌লাম্ না।...সেদিন ঢাকাতে যেরূপ দেখেছি তাহাতে আপনি 'না' বল্‌লে আমি আর শুনি না; অতি সহজ হয়েই আপনি যত গোল করেছেন। কল্‌কাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর; যখনি ইচ্ছা তখনি এসে আপনাকে দর্শন কর্‌তে পারি; আস্‌তে কোনও কষ্ট নাই—নৌকা,

(খ) স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালার উনবিংশ শতাব্দী—শ্রীগিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী।

গাড়ী যথেষ্ট ; ঘরের পাশে এইরূপে এত সহজে আপনাকে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে বুঝ্‌লাম না। যদি কোনও পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে থাক্‌তেন, আর পথ-হেঁটে অনাহারে গাছের শিকড় ধ'রে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তা'হলে আমরা আপনার কদর কর্‌তাম ; এখন মনে করি ঘরের পাশেই যখন এই রকম, তখন না জানি বাহিরে দূর-দূরান্তরে আরও কত ভাল ভাল সব আছে ; তাই আপনাকে ফেলে ছুটোছুটি ক'রে মরি আর কি !" (১)

"শ্রীযুত বিজয় গোস্বামী ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ দর্শন পান এবং আপনার মাথার খেয়াল কিনা জানিবার জন্য সম্মুখাবস্থিত দৃষ্ট মূর্ত্তির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহুক্ষণ ধরিয়া স্বহস্তে টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়া যাচাইয়া লন, সে কথাও ঐ দিন ঠাকুরের ও আমাদের সম্মুখে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন।" (২)

ঠাকুর সমস্ত কথা শুনিয়া ভাবস্থ হইয়া বলিলেন—"যদি তা' হয়ে থাকে ত তাই !"

"বিজয় বলিলেন—বুঝেছি। এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ স্তব করিতেছেন। যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেইভাবে এক দৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন।......"

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

কেহ বা তখন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন—মহিমাচন্দ্রের মত সেকালের প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মদর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন—

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম্।"

ভক্ত নবগোপাল ভক্তিতে কাঁদিতেছেন—ভক্ত ভূপতি গদ্‌গদকণ্ঠে গাহিতেছেন—

জয় জয় পরব্রহ্ম
অপার তুমি অগম্য—
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি
প্রেমের আকর-ভূমি
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।

* * *

কুসুমে তোমার কান্তি
সলিলে তোমার শান্তি
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি
কি জানিবে মূঢ়মতি
ধ্যায় যুগ যুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে
তোমার চরণ বন্দে
কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য্য তারা।
তোমারি এ রচনারি,
ভাব লয়ে নরনারী
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা।

কিছুক্ষণ এইরূপ গানের পর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। * * * কহিলেন—"মানুষ-দেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে,—কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না; প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো? গরুর যেখান্‌টা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙ্গটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হলো; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।" (হাস্য) (১)

ঠাকুর যখন ভক্তদিগের সঙ্গে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে এইরূপ প্রেমানন্দে কাটাইতেছেন তখন একদিন (১৮৮৫ সাল, ২৫ অক্টোবর) ভারতমান্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার কণ্ঠরোগ চিকিৎসার জন্য আসিলেন। কিছুক্ষণ অন্যান্য কথার পর ডাক্তারের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) গাহিতে লাগিলেন—

আমায় দেমা পাগল ক'রে,
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
(ব্রহ্মময়ী, দে মা পাগল ক'রে)
(ওমা) তোমার ও প্রেমের সুরা
পানে করাও মাতোয়ারা
(ওমা) ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেম-সাগরে।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন; বল্‌ছেন—'আমায় দেমা পাগল ক'রে, আর কাজ নেই জ্ঞান বিচারে।' বিজয় (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) সর্ব্বপ্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি (ক্যান্‌সার)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস্ নাই, ডাক্তারেরও হুঁস্ নাই। ছোট-নরেনেরও ভাবসমাধি হইল। লাটুরও ভাবসমাধি হইল। ডাক্তার 'সায়ান্স' পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন,। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য-চৈতন্য কিছুই নাই; সকলেই স্থির, নিস্পন্দ; ভাব উপশম হইলে, কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন। যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।"

"এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত আট্‌টা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।"

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—"যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দেমা পাগল করে'—তখন আর থাক্‌তে পারি নি। দাঁড়াই আর কি। তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপ্‌লুম; ভাব্‌লুম যে display করা হ'বে না।......"

বিজয় বলিলেন—"কে একজন আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকেন; আমি দূরে থাক্‌লেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে।"

নরেন্দ্র। Guardian Angel-এর মত।

বিজয়। ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি। গা-ছুঁয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—সে তবে আর এক জন।

নরেন্দ্র। আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি ক'রে বল্‌বো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না।" (১)

শুনিতে পাই এখনও অনেক ভাগ্যবান্ স্বপ্নে, কেহ বা চাক্ষুস ঠাকুরের

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

দর্শন পাইয়া থাকেন। (১) ঠাকুরের দেহ নাই, কিন্তু তিনি ত আছেন। তিনি না থাকিলে আমাদের মত ভক্তি-বিশ্বাসহীন মূঢ়দিগের উপায় কি? তাহারা ত শুধু এই বলিয়াই দিন গণিতেছে—

মাধব বহুত মিনতি করু তোঁয়।
দএ তুলসী তিল   দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।

দয়া—দয়া প্রভু। শুধু তোমার দয়া। পূজা নয়, জপ নয়, ধ্যান-ধারণা নয়, তপশ্চরণ নয়—শুধু দয়া, শুধু দয়া,—অহেতুকী দয়া—নহিলে,

"জপ ক'রে যে তোমায় পাওয়া
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা!"

তাহারা ত সেই দয়া পাইবার আশাতেই বাঁচিয়া আছে, প্রভু। একে ত তাহারা সম্বলহীন, তাহার উপর—

গণইতে দোষ গুণলেষ ন পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুঁই জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির নহ মোঞে ছার। —বিদ্যাপতি।

(১) ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ মন্ত্রশিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বেদান্তমঠে হৃদ্‌রোগে ও শোথে পীড়িত ছিলেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করিতেন। একদিন স্বামী-মহারাজ আদেশ শুনিলেন—"তুই বিমলানন্দকে দেখা"—ঠাকুরের সেই কণ্ঠস্বর। কালবিলম্ব না করিয়া স্বামী-মহারাজ "বিমলানন্দের" সন্ধান করাইতে লাগিলেন। দেখা গেল তিনি স্বর্গীয় শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি স্বামী মহারাজের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় রোগের যথেষ্ট উপশম হইয়াছিল। আমরা মনে করিলাম তিনি সত্বরই সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইবেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর প্রভাতে স্বামী-মহারাজ ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং সেই ধ্যান শেষে মহাসমাধিতে পরিণত হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রজ্বলিত শেষ মঙ্গলপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল!

(৭)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহ-সন্ন্যাসী ছিলেন। গৃহী, কেন না তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ এক বৎসর কাল পত্নীকে নিজের শয্যার অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, কারণ এমন কিছুই ছিল না যাহা তিনি ত্যাগ করেন নাই; মাকে সবই দিয়াছিলেন, কেবল "সত্য" দেন নাই। তিনি বিবাহই করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীর সহিত কোনরূপ দেহসম্বন্ধ ছিল না—মাতৃ-সম্বন্ধ ছিল! তাঁহার অটুট ব্রহ্মচর্য্য পরীক্ষা করিতে যাইয়া পরীক্ষাকারিণী রাই শেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছিল! টাকা ও মাটী সমতুল্য জ্ঞান করিয়া উভয়ই তিনি একত্রে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্নান যাত্রার শুভদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুরের বয়স তখন প্রায় বাইশ বৎসর হইবে। সেই সময়ে মার পূজারী হইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরেই থাকিতেন এবং অবসর পাইলে সকলের অজ্ঞাতে মন্দিরের উদ্যানসংলগ্ন গভীর বনে প্রবেশ করিয়া চিন্ময়ী মাতার ধ্যানে নিযুক্ত হইতেন। এই ভাবে প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গেল—দিনের পর দিন দিব্যোন্মাদনা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, লোকে মনে করিল তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। জননী চন্দ্রামণি ভাবিলেন, পুত্রকে গৃহে আনিয়া বিবাহ দিলেই ব্যাধি আরোগ্য হইবে। মন্দির ছাড়িয়া ঠাকুরকে কামারপুকুরে যাইতে হইল এবং জয়রামবাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী সারদামণির সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সকলে যখন পাত্রীর সন্ধান করিতেছিল তখন তিনিই বলিয়া দিলেন, কোথায় তাঁহার সন্ধান মিলিবে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরের এই ঠাকুরের সকল ব্যাপারই অদ্ভুত!

বিবাহ হইয়া গেল—এক বৎসরের মধ্যে পত্নীর সহিত আর সাক্ষাৎ ঘটিল না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। আবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ হইল। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার ফলে দেহ ভাঙ্গিল, আবার দিব্যোন্মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সংবাদ পাইয়াই কামারপুকুরে আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। ঠাকুরও তখন স্বগৃহেই ছিলেন। সহধর্ম্মিণীকে সাংসারিক নানা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা দিয়া তিনি গৃহিণী করিয়া তুলিলেন। মাকে তিনি শিখাইলেন—"যখন যেমন, তখন তেমন—যখানে যেমন, সেখানে তেমন—যাহাকে যেমন, তাহাকে তেমন।" মা পতিগৃহে আসিয়াছিলেন স্বামীর সেবা করিতে, কিন্তু অধিক দিন সে সুযোগ পাইলেন না, কারণ ঠাকুর কয়েক মাস মাত্র গৃহে থাকিয়াই আবার দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল—পতি পত্নীতে সাক্ষাৎ ঘটিল না। মা একদিন শুনিলেন, ঠাকুর কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন—বায়ুরোগ তাহার মধ্যে প্রধান। তিনি সুদীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। আসিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন—"তুমি আমাকে লইয়া সংসারী হইতে চাও—না আমার ধর্ম্মপথে সহায় হইতে চাও।"

মা বলিলেন—"তোমার ধর্ম্মপথে সহায় হইতে চাই।"

সেইদিন হইতে সন্ন্যাসী পতির নিকট সন্ন্যাসিনী পত্নীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা আরম্ভ হইল। মা ছিলেন দেবী—হইলেন জগজ্জননী এবং সেই ভাবেই একদিন দক্ষিণেশ্বরে পূজা গ্রহণ করিলেন—ঠাকুরের সকল সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। এই কারণেই বলিয়াছি, ঠাকুর ছিলেন—গৃহী-সন্ন্যাসী! শুধু গৃহীও নহেন, শুধু সন্ন্যাসীও নহেন।

লোকচরিত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন যে, তাঁহাকে

জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হওয়া সাধারণ সংসারী মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই তিনি গৃহী ভক্ত-দিগকে বলিতেন—

"এতদূর তোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি।...... আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হ'য়ে। গায়ে কাদা লাগ্‌বে, কিন্তু ঝেড়ে ফেল্‌বে, পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্ক-সাগরে সাঁতার দেবে—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগ্‌বে না।...ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য—এরই নাম বিবেক। জল ছাঁকা দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা একদিকে পড়ে, ভাল জল এক দিকে পড়ে। বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ কর। তোমরা তাকে জেনে সংসার করো। এরি নাম বিদ্যার সংসার।......সত্য কথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছে—'সত্য কথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃ সমান।......এইসে হরি না মিলে তুল্‌সী ঝুট্‌ জবান্‌।' (১)

(১) কেহ কেহ প্রশ্ন করিত—"বাবা! ধর্ম্মরাজ্যে উন্নত হইবার সহজ উপায় কি? আমরা ত বিবাহিত, ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে না কি ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতি হ'তেই পারে না, তবে বাবা! আমাদের গতি কি হ'বে?' তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবাজি (স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ) অত্যন্ত তেজের সহিত বলিতেন—"কে বলেছে যে বিবাহিত জীবনে ধর্ম্ম হয় না? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দেবের কত পুত্র ছিল জানিস্? একশত। তাঁহার কি ধর্ম্ম হয় নাই, তাঁহার কি জ্ঞান হয় নাই? যুধিষ্ঠির কি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন না? জনকরাজা কি অধার্ম্মিক ছিলেন? তবে তোদের এ আশঙ্কা কেন? বেটা! গার্হস্থ্য জীবনেই ধর্ম্মরাজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করা যায়। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণও গৃহস্থ ছিলেন। সন্ন্যাসীগণ মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যায় নিমগ্ন হন। তাঁহারা ভিক্ষা ক'রে উদর পূর্ত্তি করেন, রোগ হ'লে ঔষধ পথ্য দিবার লোকের অভাবে তাঁহারা কষ্ট পান। কিন্তু তোদের গৃহস্থদের ত এ সব কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয় না। রোগ হ'লে সেবার লোক ঘরেই আছে,

"একজন সংসারী ভক্ত বলিলেন—আপনার এ সব ভাব নজিরের জন্য, তা হ'লে আমাদের কি কর্‌তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হ'বে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হ'বে। ঢিমে তে-তালা হ'লে হবে না। (১)

* * * *

এইভাবে গৃহী, সন্ন্যাসী—স্ত্রীলোক, পুরুষ—হিন্দু এবং অ-হিন্দু সকলকেই তিনি পথ দেখাইয়া দিলেন—আর দেখাইয়া দিলেন নবদ্বার পুরীর অন্তরের অন্তরে সুরক্ষিত সেই তোষাখানা, যেখানে সচ্চিদানন্দ মাণিক অবস্থান করিয়া অন্ধকার কক্ষটিকে আলোক-ময় করিয়া রাখিয়াছেন। ঠাকুর কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন না, কোন নূতন মত প্রকাশ করিয়া সেই মত গ্রহণ করিবার জন্য কাহাকেও আহ্বান করিলেন

তজ্জা ক'রে খেতেও হয় না। বস্তুত তোদের কত সুবিধা। তবে কি জানিস্, তোরা 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম, করিস্ বটে, কিন্তু কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মে উন্নত হ'বার চেষ্টা তোদের নাই। শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রীসংসর্গ কর্‌লে ব্রহ্মচর্য্যের কোনও হানি হয় না। ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ কর্‌লেও ব্রহ্মচর্য্য অটুট থাকে। কিন্তু তোরা যদি অজা, কবুতর, বানর ইত্যাদি প্রাণীর ন্যায় প্রত্যহই কামরিপুর সেবা করিস্, তবে বুঝতে হ'বে তোদের ধর্ম্মরাজ্যে উন্নত হবার ইচ্ছা আদৌ নাই—ও শুধু মুখে বলছিস্। পশুরাজ সিংহ বৎসরে একবার মাত্র কামরিপুর সেবা করে, দেখ্‌ত কি তার সংযম। আর তোরা মনুষ্য হয়েও ইতর প্রাণীর ন্যায় ভোগে মত্ত হচ্ছিস্। [illegible], [illegible] প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে গৃহস্থ-জীবন যাপন কর্‌লে এই পবিত্র গার্হস্থ্য আশ্রমেই [illegible] সম্ভব হয়। স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ যাহার সহিত একত্রে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত। কিন্তু তোরা তা' করিস্ কি ? ভোগকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ না করে যোগকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী ধ্যান, জপ, শাস্ত্রপাঠ, সৎসঙ্গ সংকীর্ত্তন ইত্যাদিতে যথাযোগ্য সময় যাপন করতে সচেষ্ট হ'।

" —শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি। শিবম্—আশ্বিন, ১৩৪৬।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

না। যাহা ছিল, যাহা পুরাতন, যাহা কালের ধূলিতে ধূসর হইয়া চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছিল, তিনি সেই আবর্জ্জনাকে আপন হস্তে দূর করিয়া আপনার হৃদয়-শোণিতে মাণিকের অভিষেক করিলেন এবং বিশ্ব-মানবকে ডাকিয়া কহিলেন—এই সেই অক্ষয় মাণিক, যাহা পাইলে পাওয়ার আর কিছু শেষ থাকে না। নিজেকে শুদ্ধ কর, সংযত কর, তোমার চিত্তকে আকাশের মত উদার করিয়া সেই খানে এই মণি-প্রতিষ্ঠার বেদী নির্ম্মাণ কর। যোগ্য হইয়া কর প্রসারিত কর—মণি তোমার করেই যাইবেন। তখন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব গোস্বামীপাদ আসিয়া কহিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদেরই; শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক, যিনি তাঁহার হস্ততালুর উপর এক মণ শুষ্ক কাষ্ঠ রাখিয়া অনল প্রজ্বলিত করিতেন এবং সেই হোমানলে যজ্ঞ করিতেন—তিনি আসিয়া কহিলেন—ঠাকুর আমাদেরই। ব্রাহ্ম কহিলেন—ঠাকুর আমাদের, খৃষ্টান কহিলেন যীশুতে আর ঠাকুরে ভেদ নাই—মুসলমান ফকির আসিয়া ঠাকুরকে তাঁহার বলিয়া দাবী জানাইলেন। আজ প্রতীচ্য আসিয়া কহিতেছে—হে প্রাচি, ঠাকুর তোমাদেরও, ঠাকুর আমাদেরও!

(৮)

সেদিন জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী—পাণিহাটিতে "চিড়ার মহোৎসব।" প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিলেন—"সেখানে আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে;—তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল', কখনও ওরূপ দেখিস্ নি—চল্ দেখে আস্‌বি।" ঠাকুরের গলদেশে ব্যথা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ঠাকুর বলিলেন, সেখানে যাইয়া বেশীক্ষণ থাকিবেন না এবং ভাবসমাধি হইবার উপক্রম হইলে সাবধান হইবেন, কারণ উহা অধিক হইলেই গলার

ব্যথা বৃদ্ধি হইতে পারে। এ কথার পর আর কাহারও "ওজর আপত্তি' থাকিতে পারিল না।

ঠাকুরের নৌকা দক্ষিণেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া পাণিহাটিতে আসিল।

তীরে উঠিয়া মণিবাবুর ঠাকুরবাটীর নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর এক মনে কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ তাঁহাকে বারবার সাবধান করিতেছিলেন—"কীর্ত্তনে মাতা হইবে না।' অকস্মাৎ ঠাকুর এক লম্ফে কীর্ত্তনীয়াদিগের মধ্যস্থলে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল। ভক্তগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন—কিন্তু বানের গঙ্গা যখন গর্জ্জন করিয়া ছোটে, কে সেই জলতরঙ্গ রোধ করিতে পারে? ঠাকুরের যখনই অর্দ্ধবাহ্যদশা হইতে লাগিল, তখনই তিনি সিংহবিক্রমে গর্জ্জন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন—তাঁহাতে এমন "অদৃষ্টপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত" হইয়াছে যে তাহা বর্ণনাতীত। কীর্ত্তনানন্দের যে এমন রুদ্রমধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে ইহা ত পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। ভাবোল্লাসে উদ্বেলিতহৃদয় আনন্দময় ঠাকুর যেন পরমানন্দ সাগরের একটি লীলাচঞ্চল বৃহৎ তরঙ্গের মত দেখাইতে লাগিলেন—তরঙ্গ হেলিয়া দুলিয়া দুলিতেছে, থৈ থৈ করিয়া নৃত্য করিতেছে—ভাবে ঢলিতেছে, ভূমিতে পড়িতেছে—আবার উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে! সে যেন শুধুই একখানি প্রাণময় নৃত্য—পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যেন তাহার কোনও সম্পর্ক নাই—দেহও যেন নাই, আছে শুধু একখানি নৃত্যময় প্রাণ!

বহুক্ষণ নৃত্যের পর যখন ভাবপ্রমত্ত ঠাকুরকে লইয়া ভক্তগণ ধীরে ধীরে রাজপথে আসিলেন তখন তাঁহার "দিব্যোজ্জ্বল শ্রী, মনোহর নৃত

ও পুনঃ পুনঃ গম্ভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন উৎসাহে" উৎসাহিত কীর্ত্তন' সম্প্রদায় গান ধরিল—

সুরধনীর তীরে হরি বলে কে রে.
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে হরি বলে কেরে
জয় রাধে বলে কেরে
বুঝি প্রেম দাতা নিতাই এসেছে,
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কীর্ত্তনীয়ারা এই শেষ ছত্র বার বার গায় আর তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করে। ঠাকুরও নাচেন—তাহারাও নাচে! কীর্ত্তনোম্মাদ দেখিতে দেখিতে সংক্রামক হইয়া উঠিল। যেখানে যে দল ছিল—সকলেই ছুটিয়া আসিয়া সেই কীর্ত্তনে যোগ দিল। সকলেই গাহিতে লাগিল—"(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে——. চারিদিকে শত সহস্র উৎসুক শ্রোতা ও দর্শক দাঁড়াইয়া গেল—সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনিতে পাণিহাটি নৃত্যচঞ্চল হইয়া উঠিল!

* * * *

ভক্তগণ বহুকষ্টে সেই জনস্রোতের ভিতর হইতে ঠাকুরকে সরাইয়া আনিলেন এবং নৌকায় তুলিলেন। নৌকা এই ছাড়ে আর কি—এমন সময় কোন্নগরের পরম হরিভক্ত সুবিখ্যাত নবচৈতন্য মিত্র মহাশয় উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের চরণমূলে "আছাড় খাইয়া" পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"কৃপা করুন—কৃপা করুন।" ঠাকুর তাঁহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে তাঁহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপূর্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল

বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার (নব চৈতন্যের) ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্যের ন্যায় তিনি নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে স্তব স্তুতিপূর্ব্বক বারংবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঐরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানা প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শান্ত করিলেন।" (১)

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন কিন্তু গলার অসুখ বৃদ্ধি হইল। উহা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কলিকাতায় আনা হইল।

গলার অসুখ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—ততই দর্শনলোলুপ নর-নারীর সংখ্যা কলিকাতার শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাকুর কাহাকেও ফিরাইলেন না। প্রেম দিয়া আশীর্ব্বাদ দিয়া, কাহাকেও বা তাহারও অধিক অমূল্য নিধি দিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ধরিয়া বসিলেন—'আপনি ত ইচ্ছাময়। ইচ্ছা করিলেই ত এ অসুখ সারিয়া যায়। আপনার মনটি একবার অসুখের স্থানে স্থাপিত করিয়া বলুন্—অসুখ দূরে যাক্।' ঠাকুর তাহা করিতে পারিলেন না। বলিলেন—'যে মন মার পাদপদ্মে দিয়াছি, এই তুচ্ছ খোসাটার জন্য তাহাকে কি তুলিয়া আনিতে পারি?'

ভক্তদিগের মাথায় আকাশের বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল! তাহারা ভাবিতে লাগিল—ইহারই নাম ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া যীশুর আত্মত্যাগ।

ভক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষের দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখ্‌ছি। তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্ত্তি) দেখ্‌ছি।"

চিকিৎসার জন্য ঠাকুর যে কয়েক মাস শ্যামপুকুরে ছিলেন তাহারই

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ— শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

ভিতর একদিন দেখিলেন—"তাঁহার নিজের সূক্ষ্ম শরীরটা স্থূল শরীর হইতে বাহিরে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্‌লুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাব্‌চি কেন এমন হলো? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে—যা-তা ক'রে এসে যত লোক ছোঁয় আর তাদের দুর্দ্দশা দেখে মনে দয়া হয়—সেইগুলো (তাদের পাপের ফল) নিতে হয়! সেই সব নিয়ে নিয়ে এইরূপ হয়েছে। সেই জন্যইত (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে।" (১) বলিতে গেলে যীশুখৃষ্টকে দুষ্ট লোকেরা বিচারের ভাণ করিয়া, বল পূর্ব্বক ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল। মহাপুরুষ তখন সেই হত্যাকারীদের জন্যই ভগবানের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ঠাকুর হরিদাসও একদিন বাইশ বাজারে বেত্রাহত হইতে হইতে এইরূপ ভাবেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মানুষে ও দেবতায় এই খানেই প্রভেদ! কিন্তু কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে জানিয়া-শুনিয়াও পরের দুঃখে গলিয়া অপার করুণার বশে দিনের পর দিন তাহাদের দুষ্কৃতির জ্বালা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে শান্তি ও শুদ্ধির অধিকারী করিতেন এবং এইরূপে নিজের শোণিত দিয়া মানবের পাপ-রাশি প্রতিদিন ধুইয়া দিতেন—এমন আত্মবিসর্জ্জন মানুষের মধ্যে ত নাই-ই—দেবগণের মধ্যেও বোধ হয় অত্যন্ত বিরল!

"অহংকৃত হইয়া আচার্য্যপদবী গ্রহণ যে ঠাকুরের মনে কোনও দিনও উদিত হয় নাই তাহার পরিচয় ভক্তগণ সর্ব্বদাই পাইতেন। তঁহারা একদিন জগজ্জননীর সহিত ঠাকুরের কথা শুনিলেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলিতেছিলেন—"কচ্চিস্‌ কি! এত লোকের ভিড় কি আন্‌তে হয়! (আমার) নাইবার—খাবার সময় নেই! (ঠাকুরের

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

তখন গলদেশে ব্যথা হইয়াছে। নিজের শরীর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন)—এটা একটা ভাঙ্গা ঢাক! এত ক'রে বাজালে কোন্ দিন ফুটো হয়ে যাবে যে! তখন কি কর্‌বি!" (১)

আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন—"অমন সব আদাড়ে লোককে এখানে আনিস্ কেন? (একটু চুপ করিয়া) আমি অত পার্‌ব না। এক সের দুধে এক আধ-পো জলই থাক্—তা'নয় এক সের দুধে পাঁচসের জল! জ্বাল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে গেল! তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি এত জ্বাল ঠেল্‌তে পার্‌বো না। অমন সব লোককে আর আনিস্ নি।" (২)

সমীপাগত ভক্তদিগকে একদিন বলিলেন—"মাকে আজ বলিতে-ছিলাম, বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার, এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে—যা'তে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকট আসে।" (৩)

ঠাকুর মাকে বলিতেন বটে, "আমি অত জ্বাল ঠেল্‌তে পারবো না। অমন সব লোককে আর আনিস্ নি"—কিন্তু লোকও আসিত, ঠাকুরও জ্বাল ঠেলিতেন! কারণ অবতারদিগের আবির্ভাবই হয় পরের জন্য, নিজের জন্য নয়। সিদ্ধ পুরুষ কোন রূপে নিজে চলিয়া যান, অন্য কেহ আশ্রয় চাহিলে বিরক্ত হন—কারণ সামর্থ্য কম। কিন্তু অবতার "বাহাদুরী কাঠ"—গ্রাম শুদ্ধ লোককে নিজের পিঠে তুলিয়া লইয়া অক্লেশে ভাসিয়া যান। সেই জন্যই অবতারের আগমন হইলে ভক্তি-মুক্তির লুট লাগিয়া যায়! তিনি দর্শনে মুক্তি দেন, স্পর্শনে মুক্তি দেন—

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।
(২) ঐ
(৩) ঐ

ইচ্ছামাত্রেই কাচকে কাঞ্চন করেন, আবার একজন ভক্ত কলেজের ছাত্রের করেও নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া—'আমি ফকির হইলাম' বলিয়া রোদন করিয়া উঠেন—দুঃখে নহে, ভক্তের প্রতি অগাধ প্রেমে! ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বস্ব দিয়া এইরূপে কাঁদিয়াছিলেন। অন্য একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"(শ্রীশ্রীজগদম্বা) দেখাচ্চে কি, যেন কল্‌কাতাটা সাম্‌নে, আর লোকগুলো সব কাম-কাঞ্চনে দিন রাত ডুবে রয়েছে ও যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে। দেখে দয়া এলো। মনে হলো লক্ষ গুণ কষ্ট পেয়েও যদি এদের মঙ্গল হয়, উদ্ধার হয় ত তা' করবো।" (১) ইহাই যে অবতারের স্বভাব তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারদিগের কার্য্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সাধনার কালে ঠাকুরের যে সকল অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য হইয়াছিল, পাছে সেই সকল 'সিদ্ধাই' তাঁহার মনে অহঙ্কার আনিয়া দেয়, তাই তিনি মাকে বলিয়া বলিয়া সেগুলি প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেবদেহ হইতে তখন যেরূপ উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইত তাহা মাকে বলিয়া ঠাকুর দেহের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। মাকে বলিলেন—"মা তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে।" শ্রীশ্রীজগদম্বা পুত্রের কথা মানিয়া বাহিরের রূপ সংহরণ করিয়া লইলেন, কিন্তু পুত্রের ভিতরে এত তেজ আনিয়া দিলেন যে, সেই শক্তির বিকাশ অনুভব করিয়া ঠাকুর এক এক দিন ভক্তদিগকে বলিতেন—"মা দেখিয়ে দিচ্ছে কি যে, (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাহাকেও ছুঁয়ে দিতেও হবে না; তোদের বোল্‌বো ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাইতেই অপরের চৈতন্য হয়ে যাবে।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

মা যদি এবার (শরীর দেখাইয়া) এটা আরাম ক'রে দেন তো দরজায় লোকের ভিড় ঠেলে রাখ্‌তে পারবি না—এত সব লোক আস্‌বে, এত খাট্‌তে হবে যে ঔষধ খেয়ে গায়ের ব্যথা সারাতে হবে।" (১)

এত শক্তির আধার ছিলেন যিনি তিনিও নিজেকে সর্ব্বদা নিরভিমান করিবার জন্য "কালীবাটীর চাকর-বাকরদিগের শৌচাদির জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাও স্বহস্তে ধৌত করিয়া নিজের কেশ দ্বারা মুছিতে মুছিতে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"মা উহাদের চাইতে বড়, এ ভাব আমার মনে যেন কখন না হয়!" (২)

(৯)

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একদিন ভক্ত-পরিবেষ্টিত ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে (বৈষ্ণব মতে) উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যে-ই নাম, সে-ই ঈশ্বর,—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান্, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া—(প্রকাশ করিবে)। 'সর্ব্বজীবে দয়া' পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর্ শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া কর্‌বি? দয়া কর্‌বার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ— শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২) ঐ

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এই উপদেশ সেদিন অনেকেই শুনিলেন কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম্ম এক নরেন্দ্রনাথ ভিন্ন তখন আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পর বাহিরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, "সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে"—তবেই অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা যাইবে। কিন্তু আজ "বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান, অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনিই। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি মানব এইরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়?…কর্ম্ম না করিয়া দেহ যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ' কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না।" (১) সেদিন নরেন্দ্রনাথ যে মহামন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহারই নিত্য সাধনার ফলে এ যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রসঙ্গক্রমে তিনি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন "আগে পাঁচটা জান্‌তে হয়, জগতের বিষয়। একটু এ-দিক্‌কার জ্ঞান না হ'লে ঈশ্বর জান্‌বো কেমন ক'রে?"

ঠাকুর কহিলেন—"ঐ তোমাদের এক! আগে ঈশ্বর তারপরে সৃষ্টি। তাঁকে লাভ কর্‌লে, দরকার হয়ত সবই জান্‌তে পার্‌বে।··· যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায় ততক্ষণই তার গুণের কথা কওয়া যায়; সে যেই সাম্‌নে আসে, তখন ও-সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গে আলাপ ক'রেই বিভোর হয়, তখন আর অন্য কথা থাকে না। আগে ঈশ্বর লাভ, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।······ এক-কে নিয়েই অনেক! এক আগে তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর, তারপর জীব-জগৎ। তোমার দরকার ঈশ্বর লাভ করা। তুমি অত জগৎ—সৃষ্টি—সায়েন্স-ফায়েন্স এ সব কর্‌ছো কেন?···এ সংসারে মানুষ এসেছে ঈশ্বরলাভের জন্য। সেটি ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়।"

ঠাকুর বলিতেন—'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিব না—তাহাতে ঈশ্বর লাভ হয় না'; গৃহীকে কহিলেন—"বাউল যেমন দু'হাতে বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে, তোমরাও তেমনি হাতে সমস্ত কাজ কর, কিন্তু মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ কর্‌তে ভুলো না"; বলিতেন—"যে মা ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন দেয়, সে মা'র কথা না শুন্‌লে কোনও দোষ নাই; সে মা নয়, সে অবিদ্যারূপিণী। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই"; উপদেশচ্ছলে কখনও বা বলিতেন—"আমি বলি, 'মা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার; যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি; নাহং নাহং—তুঁহু, তুঁহু।"

বাঙ্গালার স্বনামধন্য পুরুষ কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জীবনের উদ্দেশ্য কি?"

উত্তরে পাল মহাশয় বলিলেন—"আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ নাশ করা।"

ইহা ইউরোপীয় আদর্শ, যে আদর্শ ভগবানের স্থানে মানুষকে আনিয়া বসাইয়াছে।

উত্তর শুনিয়া ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমার ওরূপ রাঁড়ী-পুতী বুদ্ধি (হীন বুদ্ধি) কেন? জগতের দুঃখনাশ তুমি কর্‌বে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা—এ-ই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা' হয় কোরো।"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে একদিন ভক্তদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে গম্ভীর হইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই; তোমাদের একটা গুহ্য কথা বল্‌ছি! সে দিন দেখ্‌লাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এসে রূপ ধারণ ক'রে বল্‌লে—আমিই যুগে যুগে অবতার! দেখ্‌লাম পূর্ণ আবির্ভাব; তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য।"

ঐ বৎসরেরই জন্মাষ্টমীর দিনে মহাকবি গিরিশচন্দ্র যুক্তকরে ঠাকুরকে বলিলেন—"তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা' যদি না হয়, সবই মিথ্যা।"

বারবার তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্তব করায় ঠাকুর বলিলেন—"ছি, ও কথা বল্‌তে নাই, ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা' ভাবো, তুমি ভাব্‌তে পারো। আপনার গুরু ভগবান্ তা ব'লে ওসব কথা বলায় অপরাধ হয়।"

অন্য একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো তা' হ'লে তো সবই হলো। আমি আর কি? তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী!···এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্ত্বা রয়েছে। তাই এত লোকের আকর্ষণ পড়্‌ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়। সে টান, সে আকর্ষণ, ঈশ্বরের আকর্ষণ।"

আর একদিন—"জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে (মা), তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এই সব ভাব ল'য়ে থাকো।"

ঠাকুরের এইরূপ বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরসত্ত্বা অনুভব করিতেন এবং কথায় তাহা প্রকাশও করিতেন। ভক্তদিগের মধ্যে যখন অনেকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন, নরেন্দ্রনাথ তখনও সন্দেহ দোলায় দুলিতেছিলেন। তাঁহার মন বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল না!

তাহার পর যখন বাঙ্গালার মহাশ্মশান কাশীপুরের উদ্যানে ক্যান্‌সার-রোগক্লিষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদনা-কাতর দেহখানি শয্যায় পড়িয়া আছে, যেন কয়েকখানি অস্থিমাত্র, তিনি পেন্‌সিল দ্বারা একখানি কাগজে লিখিলেন—"নরেন্দ্র অন্য ছেলেদের শিক্ষা দিবে।" নরেন্দ্র লেখাটি [illegible]য়া কিছুক্ষণের জন্য কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন; শেষে দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—"আমি ও করবো না।" ঠাকুরের তখন কথা বলিবার শক্তিও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। দেহের সকল শক্তি এক করিয়া বিশেষ চেষ্টাপূর্ব্বক তিনি কহিলেন—"তোকে করতেই হবে। তোর হাড় তোকে করাবে।" ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—"কালে আমার যোগসিদ্ধি তোরই ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে।"

কাশীপুর উদ্যান তখন যেন তাপসপুঞ্জের সাধনার ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তগণ যেমন কঠোর তপস্যাও করিতেন, তেমনি তাঁহাদিগের নয়নের মণি জীবনের জীবন ঠাকুরের অক্লান্ত সেবাও করিতেন। সমস্ত গৃহটি যেন এক মহান্ ঈশ্বরীয় ভাবে তখন পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত।

এই সময়ে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। ইঙ্গিত পাইয়া অন্যান্য ভক্তগণ সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আদেশ মত কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্নিকটে বসিলেন। ঠাকুর কহিলেন—"নরেন্ একটু ধ্যান কর্।"

নরেন্দ্রনাথের ধ্যান আরম্ভ হইল। ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া গেল। নরেন্দ্রের বদন তখন স্বপ্নময় মধুর শান্তির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই মধুর স্বপ্নের আবেশ-সৌভাগ্য নরেন্দ্রনাথের অদৃষ্টে আরও দুই দিন ঘটিয়াছিল—একদিন যদু মল্লিকের উদ্যান-বাটিকায়, যেদিন ঠাকুর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং আর একদিন সেই প্রথম সম্মিলনকালে ঠাকুর যখন নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া সমাধির উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন ঠাকুর ছিলেন —দেহে নীরোগ, সুস্থ ও সবল। আর আজ রোগের অসহ্য যন্ত্রণা তাঁহার অস্থিসার দেহকেও যেন দণ্ডে দণ্ডে জীর্ণ করিতেছিল। চিরবিদায়ের কালো ছায়া আজ আসিয়া ঠাকুরের শিয়রে দাঁড়াইয়াছে! ধ্যানমগ্ন নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ বিগতচেতন হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিল, তখন চাহিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের কোটরগত দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে! সন্ন্যাসীর চক্ষে জল দেখিয়া নরেন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন—ঠাকুর যেন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন!

নরেন্দ্র কহিলেন—"কি হইয়াছে! আপনি কাঁদিতেছেন কেন!

ঠাকুর কহিলেন—“নরেন্! নরেন্! আজ আমি সত্য-সত্যই ফকির হইলাম—একেবারে কপর্দ্দকহীন কাঙ্গালী! আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল সবই তোকে দিয়ে ফেলেছি। আজ যে শক্তি তোর দেহে সংক্রমিত হ'লো, তারই বলে তুই বিশ্ব-ভুবনে অনেক বৃহৎ কাজ কর্‌বি। কাজ শেষ হ'লে তবে তোর যাত্রার দিন আস্‌বে।” নরেন্দ্র আকুল হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন।

(১০)

ক্রমে সেই সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল যখন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহখানি জীর্ণ-বস্ত্র-খণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিতেছিলেন! সেদিন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ—ঠাকুর আজ অত্যন্ত অসুস্থ! ভক্তগণ নীরবে তাঁহার সেবা করিতেছেন। ঠাকুরের নয়নে নিদ্রা নাই। কখনও বা মনে হইতেছে তিনি এই মাত্র একটু তন্দ্রাগত হইলেন। “একি নিদ্রা, না মহাযোগ! যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে—একি সেই যোগাবস্থা?” (১)

“মাষ্টার (শ্রীম) কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরও নিকটে আসিতে বলিলেন। নিকটে আসিলে অতিশয় কষ্টে কহিলেন—“তোমরা কাঁদ্‌বে বলে এত ভোগ কর্‌ছি। সব্বাই যদি [illegible]—এত কষ্ট—তবে দেহ যাক্—তা' হ'লে দেহ যায়।”

হায়! করুণাময় ঠাকুর। পাছে ভক্তদিগের প্রাণে ব্যথা লাগে, সেই জন্য তখনো এত কষ্টভোগ! কোন-কোন ভক্ত ঠাকুরের এই বাক্য শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মনে হইল—“এরই নাম কি *crucifixion*—ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জ্জন?” (২)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

(২) ঐ

গভীর রাত্রি—অসুখ যেন আরও বাড়িয়া গেল! ঠাকুরের মুখে বাক্য নাই, চক্ষে পলক নাই—হঠাৎ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না যে, তিনি আছেন, কি চলিয়া গিয়াছেন! কাশীপুরের সেই উদ্যানে তখন অকাল-বিসর্জ্জনের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে! সেই বুক-ভাঙ্গা বাঁশী শুনিয়া ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন—কাঁদিয়া কাহারও বা নয়নের সমস্ত জল ফুরাইয়া গিয়াছে—ঝরিতে আর বাকি নাই! সে নয়নে তখন ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে—সেই অগ্নি ঠাকুরের পাণ্ডুর বদনের উপর যাইয়া পড়িয়া আছে—কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে না!

কলিকাতায় লোক গেল—ডাক্তার আসিল। ক্রমে ঠাকুর একটু সুস্থ বোধ করিলেন, কহিলেন—"কি দেখ্‌ছি জান? তিনিই সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখ্‌ছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত-পা-মাথা নাড়ছেন।"

কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বাহ্যশূন্য হইলেন। কিছুক্ষণ পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"এখন আমার কোনও কষ্ট নাই—ঠিক পূর্ব্বাবস্থা। ঐ লেটো (লাটু মহারাজ) মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে,—তিনিই (ঈশ্বরই) যেন মাথায় হাত দিয়ে রয়েছেন।"

রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) মুখে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"শরীরটা কিছুদিন থাক্‌তো, লোকদের চৈতন্য হতো!"

ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া মনে পড়ে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের বাণী—'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্মুক্ত পুরুষ—লোক-শিক্ষার জন্যই এবার ধরাধামে এসেছিলেন।' (১)

---

(১) Sree Swami Bhola Giri Maharaj—Swami Dhrubananda Giri.

ঠাকুর আরও কি বলিবেন তাহাই শুনিবার জন্য ভক্তগণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। অতিশয় ধীরে—অতিশয় কোমলকণ্ঠে ঠাকুর কহিলেন—"তা রাখ্‌বে না;—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধ'রে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যান-জপ নাই।"

ঠাকুরের মানস-পুত্র রাখাল-মহারাজ কহিলেন—"আপনি বলুন—যাতে আপনার দেহ থাকে।"

ঠাকুর বলিলেন—"সে ঈশ্বরের ইচ্ছা!"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হ'য়ে গেছে।"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ঠাকুর নিজের বক্ষের উপর তাঁহার শীর্ণ কর স্থাপন করিয়া কহিলেন—"এর ভিতর দু'টি আছেন। একটি তিনি;—আর একটি, ভক্ত হ'য়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল—তারই এই অসুখ করেছে, বুঝেছ?"—ভক্তগণ মূক হইয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন—"কারেই বা বল্‌বো, কেই বা বুঝবে। তিনি মানুষ হ'য়ে—অবতার হ'য়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা আবার তাঁরই সঙ্গে চলে যায়। বাউলের দল, হঠাৎ এলো,—নাচ্‌লে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেলো—কেউ চিন্‌লে না।"

ঠাকুর একটু মৃদু হাস্য করিলেন—সে যেন খণ্ডিত চন্দ্রের হাসিটুকু! বলিলেন—"দেহ ধারণ কর্‌লে কষ্ট আছেই। আর যে দেহ ধারণ করা—এটি ভক্তের জন্য।"

নরেন্দ্রনাথকে একখানি গাহিতে বলায় নরেন্দ্র পিককণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

কাহে সই, জিয়ত মরত কি বিধান !
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই—
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ॥

ঠাকুর মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

* * * *

আরও পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। সেদিন ছিল আগষ্ট মাসের ১৬ই (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) রবিবার—গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। চারিদিকের জনকোলাহল নীরব হইয়াছে—পল্লীগৃহের দীপ নিবিয়াছে—কেবল আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজি জল-ভরা অসংখ্য চক্ষে দেব-মানবের মহাযাত্রাপথের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া দেখিতেছে !

ভক্তগণ তাঁহার রোগ-শয্যা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া পলকহীন নেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কক্ষ মধ্যে একটি তেজোহীন দীপের শিখা তখন মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া এক একবার নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছিল। কম্পিত করে অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভক্তগণ শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শেলাহত রুধিরলিপ্ত হৃদয় হইতে তখন অতিশয় করুণ ও কাতর প্রার্থনা নীরবে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধদিকে ছুটিতে লাগিল।

বেদনার মহামেঘ ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির রেখা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই জ্যোতির স্পর্শে তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন একটি মহান্ বিরাট অচিন্তিতপূর্ব্ব অননুভূত প্রচণ্ড অদৃশ্য শক্তি তাঁহাদিগের মৃতকল্প দেহ ও মনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে। মুখে বাক্য নাই, দেহে স্পন্দন নাই, নয়নে পলক নাই—তাঁহারা প্রভুর মহাপ্রস্থানের রথের সম্মুখে নিতান্ত অসহায়ভাবে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কক্ষের

কম্পিত মৃদু দীপশিখা সকলের দেহের উপর দিয়া এক একবার যেন তাহার শেষ নৃত্য করিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় নরেন্দ্রনাথের মনে হইল—মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এখন যদি ঠাকুর বলেন, তিনি অবতার—তাহা হইলে সমস্ত জীবনের সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে দূর করিয়া দিয়া জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তিনি এই বিশ্বাসটি লইয়াই দিন গণিবেন যে, ঠাকুর অবতার—ঠাকুর নিশ্চয়ই অবতার!

নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন, যখন দেখিলেন—তাঁহার মনের চিন্তা মনে লয় পাইবার পূর্ব্বেই পার্থিব জীর্ণ দেহের সকল শক্তি এক করিয়া ঠাকুর একবার—সেই শেষবার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া অতিশয় ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন—"নরেন্, এখনো অবিশ্বাস! যে রাম—যে কৃষ্ণ—এই দেহে সে-ই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছে—বেদান্তের দৃষ্টিতে নয়—সত্য সত্যই অবতার।"

মৃত্যুর ছায়ায় পরিম্লান সেই শব্দহীন কক্ষে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইলেও নরেন্দ্রনাথ ততদূর চমকিত ও বিস্মিত হইতেন না, প্রভুর এই শেষ বাণী তাঁহাকে যতদূর বিস্মিত ও বিমূঢ় করিয়া দিল।

তীব্র বেদনায় তিনি রোদন করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রভুর কণ্ঠ হইতে নাদ উত্থিত হইল—ওম্! ওম্!

সেই নাদ বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতেই জগদ্‌গুরু ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া হইয়া গেলেন—তৎ সৎ! (১)

* * * *

ইহার পর অর্দ্ধশতাব্দী মাত্র গত হইয়াছে কিন্তু তাহারই মধ্যে

(১) The Life of the Swami Vivekananda—By his Eastern and Western Disciples.

ঠাকুরের প্রভাব ঝটিকাসংক্ষুব্ধ সাগরতরঙ্গের ক্রমবর্দ্ধমান বেগে ভারতকে প্লাবিত করিয়া ভারতের সীমার বাহিরে—ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরেরও পারে তট হইতে তটে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে। প্রতীচীর গৌরব-সূর্য্য ভক্তিগদ্‌গদ্‌ করে বিশ্বের দিকে দিকে ঘোষণা করিতেছেন—"Allowing for differences of country and time Ramkrishna is the younger brother of Christ."—Romain Rolland.

(১১)

বাঙ্গালার শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু হইয়াছেন।

এই সুবিস্তীর্ণ ধরাতলে নানা যুগে নানা দেশে নানা অবতার-পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা ত কেহই জগতের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। শুধু ভারত নহে, সিংহল নহে—শুধু এসিয়া নহে, য়ুরোপ নহে—কোথায় আফ্রিকা, কোথায় আমেরিকা—কোথায় জাপান, চীন, রুষ—বলিতে গেলে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র এই যে সেদিন (১৯৩৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত) শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী-উৎসবের দুন্দুভি নিনাদ ধ্বনিত হইল, দেশীয় ও বিদেশীয় নানা পত্র-পত্রিকায় এবং সভা-সমিতিতে ঠাকুরের চিত্র, ঠাকুরের মাহাত্ম্য, ঠাকুরের ভাবধারা, ঠাকুরের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যাদির সশ্রদ্ধ আলোচনা প্রচারিত হইয়া বিশ্বমানবের গন্তব্য পথকে আলোক-সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল—যে দেশে মূর্ত্তি-পূজা নাই, সে দেশে পর্য্যন্ত বিশেষভাবে ঠাকুরের পূজা, আরাত্রিক ও হোম হইল—ঠাকুরের আবির্ভাবের ন্যায় ইহাও আধ্যাত্মিক-জগতের একটি অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা।

পূর্ব্বতন অবতার-পুরুষগণ এক একটি বিশেষ ভাবকে মূর্ত্তি দিয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদিগের আবির্ভাবের এক বা একাধিক শতাব্দী মধ্যেই সেই সকল ভাব-কুসুম নানা কারণে ঔজ্জ্বল্য হারাইয়াছে—কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ! যতই দিন যাইতেছে, তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ততই তীব্র হইতে তীব্রতর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; পূর্ব্বগগণ অমোঘ কালের দুর্জ্জয়তার নিকট পরাজিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দুর্জ্জয় কালকেই জয় করিয়াছেন। তাঁহার বাণী—'একদিন এই মূর্ত্তি ঘরে ঘরে পূজা পাইবে'—সত্য হইয়াছে এবং যতই দিন যাইতেছে ততই উহার সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থূল দেহে বর্ত্তমান কালে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল—কিন্তু এখন সূক্ষ্ম দেহে বর্ত্তমান কালে সে প্রতিষ্ঠা অসীমের মধ্যে সুবিস্তৃত হইতেছে।

তীর্থ-মাত্রেই পুণ্যক্ষেত্র এবং যে কোনও একটি তীর্থের ভাবঘন মূর্ত্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কায়মনোবাক্যে সাধনা করিতে পারিলেই পশু হয় মানব এবং মানব হয় দেবতা—ইহা সত্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বের সকল তীর্থ সম্মিলিত হইয়াছিল। সামগান সেখানে নিত্য বাজিত, ব্যাস-বাল্মীকি-বশিষ্ঠাদির বাণী সেখানে সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হইত—শ্রীশঙ্করের অদ্বৈত-জ্ঞান সে মহাতীর্থকে আলোকিত করিয়া রাখিত, আবার শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈত-তত্ত্ব, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতি সেখানে মিলিত হইয়াছিল—জিন ও গৌতম—তুলসীদাস, কবির, দাদূ ও নানক, নিমাই ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সকলেই পরস্পর পরস্পরের কর ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মহানৃত্যে বিশ্বচরাচরকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেন—ক্রুশ বহন করিয়া ঈশা আসিতেন সে মহোৎসবে,—ভ্রাতৃভাব, সাম্যবাদ

এবং জাতি-গঠনের মন্ত্র গাহিতে গাহিতে মুসা বা হজরত মহম্মদ দেখা দিতেন সেই পুণ্য-ক্ষেত্রে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীবুদ্ধ আসিতেন সেখানে। বৈদিকযুগ হইতে রামপ্রসাদের কাল পর্য্যন্ত—এই বহুবিস্তৃত সুদীর্ঘ পথ বহিয়া সকল সাধনা, সকল সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির তত্ত্ব সেই এক বিরাট পুরুষের মধ্যে বিরাজ করিত বলিয়া যে-কেহ তাঁহার নিকট আসিয়াছে, যে-কেহ তাঁহার বাণী শুনিয়াছে ও পড়িয়াছে এবং যে-কেহ এখন তাঁহার ভাবনা করিতেছে, সে-ই নিজের গন্তব্য পথটি চিনিতে পারিতেছে। এমনটি ত আর কোথাও কেহ দেখে নাই—অন্য কোন যুগই ত এমন একটি বিরাট প্রকাশের কথা বলিতে পারে নাই—এমন একজন পরমগুরুর সন্ধান ত সে কখনও দিতে পারে নাই! তাই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির চরণতলে দণ্ডবৎ প্রণতিনম্র হইয়া যুক্ত করে বার বার বলি—

ওঁ

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্ব-ধর্ম্ম-স্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥ (১)

বলি— ওঁ

সর্ব্বায় সর্ব্বপারায় সর্ব্বভাবস্বরূপিণে।
সর্ব্বভাববিহীনায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥ (২)

ওঁ

আবার বলি— জয় জয় করুণাব্ধে, মোক্ষসেতো স্মবারে।
জয় জয় জগদীশ, জ্ঞানসিন্ধো স্বয়ম্ভো॥

---

(১) শ্রীশ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত।

(২) শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ বিরচিত।

জয় জয় পরমাত্মন্, ত্রাহি মাং ভক্তিহীনং।
জয় জয় ভবহারিন্, রামকৃষ্ণ দ্বিবাহো॥ (১)

আবার আবার বলি-- ওঁ

তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো।
যাদৃশোঽসি কৃপাসিন্ধো তাদৃশায় নমো নমঃ॥ (২)

শাস্ত্র বলেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, অনুগ্রহ করিয়া নিজে ছোট হইয়া আসিয়া দেখা দেন—সে-ই শুধু তাঁহাকে পায়, তাঁহাকে দেখে, তাঁহাকে জানিতে পারে। সেই কৃপালাভের জন্য ভগবৎ শরণাগতির গান শ্রীরামকৃষ্ণই এই যুগে মানবকে বার বার শুনাইয়া গিয়াছেন, ভগবানের জন্য নিজে কাঁদিয়া অপরকে কাঁদিতে শিখাইয়া গিয়াছেন, নিজে ভগবান্‌কে যাচিয়া যাচিবার মন্ত্র দান করিয়াছেন। সকলে যাহাতে সর্ব্বদা বলে, তাই নিজে বারংবার বলিয়াছেন—"শরণাগত, শরণাগত—নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু।"—বলিয়াছেন, "মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহ-সুখ চাই না মা! লোক-মান্য চাই না; (অনিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না। কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়,—নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই; তোমার মায়ার সংসারের কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদ-পদ্মে আমায় ভক্তি দাও।" (৩) এই প্রার্থনা-মন্ত্রে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের

(১) শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ বিরচিত।
(২) ঐ
(৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহার প্রয়োজন ছিল, আছে এবং থাকিবে বিশ্বমানবের জন্য।

শুনিয়াছি বায়ুকোণে আবার প্রভুর আবির্ভাব হইবে। সে শুভদিন কবে আসিবে তাহা জানি না। তবে এখন তিনি সূক্ষ্ম দেহে বিরাজ করিয়া লোককল্যাণ সাধন করিতেছেন। দেখা দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছেন—প্রাণের টানে দেখিতে চাহিলেই তিনি দেখা দিয়া ভাগ্যবানের ভবরোগ দূর করেন। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, **তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না।** তিনি জগতের আদর্শ,—তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধন। আর সাধন যদি দরকার হয় তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন। (১) এমন মন-ভোলানো, প্রাণ-মাতানো, ভয়-ভাঙ্গানো কথা ত আর কাহারও মুখে মানব শুনিতে পায় নাই! আর কাহারো মুখে সে কি শুনিয়াছে—"বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক্ করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীহত্যা করে,—তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ করবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।......ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি, আমি তাঁর নাম করেছি আমার এখনও পাপ থাক্‌বে! আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?......তাঁর কাছে জোর কর; তিনি ত পর নন,—তিনি আপনার লোক।......ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।"

ঠাকুর বলিতেন—"কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের চতুর্থ-সংস্করণের ভূমিকা।—শ্রীম।

সকল কর্ম্মের কথা আছে তার সময় কৈ?……আমি লোকদের বলি, তোমদের 'আপোধন্বন্যাঃ' (সন্ধ্যার মার্জ্জন-মন্ত্র) ওসব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে।" তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভক্তি-মুক্তির পথটিকে কে আর এত সহজ করিয়া দেখাইয়াছেন? এই সকল কারণেই স্বামী শিবানন্দ মহারাজ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"দিন যতই যাইতেছে, যতই আমি আধ্যাত্মিক রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেছি এবং যতই শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা ও সম্প্রসারণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, ভগবান্ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি সেই অর্থে ভগবানের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলনা করিলে তাঁহার বিরাট মাহাত্ম্যকে ছোট করা হয়।……শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভাল, অথবা মন্দ বলিয়া কিছু ছিল না; তিনি দেখিতেন যে, সর্ব্বভূতে জগদম্বাই রহিয়াছেন, কেবল প্রকাশের তারতম্য।……তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সত্য এক, এই সত্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন নামে অভিহিত এবং পূজিত হইয়া থাকে।"(১) শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে যিনি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার আদর্শকে অবলম্বন করিয়া শুধু ব্যষ্টির নহে সমষ্টির কল্যাণকারীরূপে বিশ্বের দিগ্ দিগন্ত ঘন ঘোর পাঞ্চজন্য নিনাদে প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দ এক স্থানে [illegible]য়াছিলেন—"শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ পূর্ব্বগ শ্রীযুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব! ইহা বিশ্বাস কর—ধারণা কর।" (২)

---

(১) মনিষী রোমা রোলাঁর নিকট লিখিত শ্রীশ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের পত্র —উদ্বোধন—ফাল্গুন,—১৩৪২।

(২) কলিকাতার বক্তৃতা দিবার সময় স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"আমাকে দেখিয়া আপনারা তাঁহাকে বিচার করিবেন না—আমি বা তাঁহার অন্যান্য শিষ্য যদি কোটি জন্ম ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করি, তাহা হইলেও তিনি যাহা ছিলেন, তাহার কোটিভাগের এক ভাগেরও সমতুল্য হইতে পারিব না।"

অধুনা অনেকের মুখেই একটি প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যায়—ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ কি একজন অবতার? যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন।(১) বলিয়াছেন—"তাঁহাতে যে স্বভাবসিদ্ধ সর্ব্বসামঞ্জস্যসাধক জ্ঞানের বিকাশ, তাহা তাঁহাতে গীতাবক্তা শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশ। তাঁহাতে যে সংযম ও সদাচার প্রভৃতি তাহা তাঁহাতে শ্রীরামচন্দ্রের ভাবাবেশ। আর তাঁহাতে এই উভয় ভাবের সমাবেশ একাধারে হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে এই উভয়ের মিলিত অবতার অর্থাৎ ভগবদবতারের অবতারও বলিতে পারা যায়। আর উভয় ভাবের মিলিত অবস্থা প্রত্যেকের ভাব হইতে অতিরিক্ত হয় বলিয়া তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলিতেও বাধা হয় না। তাঁহাতে যে নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ, তাহা তাঁহাতে সিদ্ধ ব্রহ্মবিদের ভাব, অর্থাৎ "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইহারও তিনি নিদর্শন-স্থল। তাঁহাতে যে জগন্মাতার দর্শনাদি, তাহা তাঁহার দেবতাসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ। ...এইরূপে তাঁহার সম্বন্ধে যে নানা লোকে নানারূপ কল্পনা করে, সে সকল কথাই তাঁহাতে সার্থক হয়। অবতার-পুরুষের এইরূপই মহিমা স্বাভাবিক। ফলতঃ তিনি যে, সকল ধর্ম্মের মধ্য দিয়া জীবের পরমাভীষ্ট-পদ লাভ হইতে পারে—এই কথাটি বলিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের বীজ বপন করিয়াছিলেন,—ইহাই তাঁহার অবতারত্বসিদ্ধির প্রতি একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতাব্দী-জয়ন্তী উপলক্ষে কাশাধামে যে সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলন হইয়াছিল তাহার সভাপতিরূপে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর

(১) পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। উদ্বোধন—ফাল্গুন, ১৩৪২। এই প্রসঙ্গে উদ্বোধনে প্রকাশিত (ফাল্গুন, ১৩৪২) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের "পরমহংসদেবের বৈশিষ্ট্য", অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের "রামকৃষ্ণের কিম্মৎ" ও অন্যান্য আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১০৮ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ভাগবতানন্দগিরি, কাব্য-সাংখ্য-ন্যায়-বেদান্তাদি-তীর্থ, বেদান্তবাগীশ, মীমাংসাভূষণ, বেদদর্শনাচার্য্য মহারাজ তাঁহার অভিভাষণের এক স্থলে বলিয়াছিলেন—"পরমহংসদেব সন্ন্যাসি-সমাজের সূর্য্য স্বরূপ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসিগণেরই মাত্র নন, পবন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সূর্য্য ছিলেন ; এমন কি তিনি কেবল মাত্র ভারতবর্ষের নহেন, সমগ্র বিশ্বের অবিদ্যান্ধকাব স্বীয় উপদেশ বা জ্ঞানালোক দ্বারা দূবীকরণকারী 'প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড' ছিলেন। তিনি বিশ্ববিভুর বিশেষ বিভূতিস্বরূপ দিব্যপুরুষ।... 'যদ্‌মদ্বিভূতি মৎ সত্ত্বং" (গীতা ১০।৪১) এই গীতোক্ত রীতি অনুযায়ী তিনি প্রভুরই **অবতার** ছিলেন। আর 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১) এর সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি **পরব্রহ্মই** ছিলেন। ইহা অতিশয়োক্তি অথবা অত্যুক্তি নহে, ইহা যে সত্যোক্তি ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।......শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভূ-ভার দূর করিবার জন্য তৎ তৎ যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই একত্র সমাবেশ ইদানীং এই (রামকৃষ্ণ) নামে হইয়াছে।...যদিও এই মহাপুরুষের সমস্ত গুণগান করা আমার শক্তির বাহিরে তথাপি স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করিয়া, পক্ষী যেমন নিজের শক্তি অনুসারে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু আকাশের অন্ত প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ অভিপ্রায়ে কথিত "নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণঃ" এই উক্তি অনুসারে কিছু বলিয়া আমি এই মহাপুরুষকে আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।" (১)

মানবত্ব ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বহিরাবরণ মাত্র। সেই আবরণ ভেদ করিয়া সর্ব্বদাই দেবত্বের আলোক-লেখা শতরূপে প্রস্ফুটিত হইত। তাঁহার বাণী পরমাত্মার বাণী—উহা বিশ্বজননীর সুমধুর বীণানিক্বণ—আবার কখনও উহা মহাকালের বিষাণ-নিনাদ! স্বামী বিবেকানন্দ

(১) উদ্বোধন—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩। মূল অভিভাষণ হিন্দী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

তাই বলিতেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ অতীত ও বর্ত্তমানের সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক এবং ভবিষ্যতের পরিপূরক।" ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও মধ্যে মধ্যে বলিতেন—"বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন।" প্রতি দণ্ডে ঈশ্বর যাঁহার গায়ে ঠেকেন তিনি ভিন্ন সমন্বয়মূর্ত্তি আর কাহার হইতে পারেন? বহুত্বে একত্ব এবং একত্বে বহুত্ব শুধু তিনিই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় তাই বলি—"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, ও কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা-সমষ্টি-স্বরূপ এরূপ অপূর্ব্ব পুরুষ আর মানবজাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই।" ভারতের সন্ন্যাসি-কুলের শিরোমণি বারাণসীর অভিভাষণে—শ্রদ্ধাবিগলিত হৃদয়ে তাই বলিয়াছিলেন—"একজন ভক্ত কবি কহিয়াছেন, আমি প্রভুকে কি দিয়া প্রসন্ন করি? রত্ন উপহার ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারে না; রত্নাকর সমুদ্রেই ত তিনি রহিয়াছেন। চন্দন-বনে যিনি বাস করেন তাঁহাকে চন্দন খণ্ড দান, সে ত তাঁহাকে উপহাস মাত্রই করা হয়।...লক্ষ্মী তাঁহার চরণ-সেবিকা দাসী। লক্ষ্মীর (ধন-সম্পত্তির) দান দ্বারাও তিনি খুসী হইতে পারেন না। ভূমি (গ্রাম বা রাজ্য) দান দ্বারাও তিনি প্রসন্ন হয়েন না। তিনি ত স্বয়ং জগদীশ্বর।" (অবশেষে) কবির বুদ্ধিতে বিচার আসিল যে, ভগবানের নিকট ত 'মন' বর্ত্তমান নাই। মন ত ভগবানের ভক্তগণের নিকট চলিয়া গিয়াছে; অতএব আমি (ভগবানকে) আমার মন দান করিতেছি। হে প্রভো, আপনি উহাই গ্রহণ করুন। (১)

(১) রত্নাকরোঽস্তি সদনং গৃহিণী চ পদ্মা
কিংদেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়।
রাধা-গৃহীত-মনসেঽমনসে চ তুভ্যং
দত্তং ময়া নিজমনস্তদিদং গৃহাণ॥

৺কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতাব্দী-জয়ন্তী উপলক্ষে সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতি মহারাজের অভিভাষণ। উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৩।

এই কবির সুউক্তি অনুসারে আমি আমার মন **ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ** পরমহংসকে অর্পণ করিয়া স্বীয় ভাষণ সমাপ্ত করিতেছি।”

ঠাকুর বিভূতি লুকাইয়াছিলেন বলিয়াই সকলে নির্ভয়ে তাঁহার নিকটে আসিতে পারিত, তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত—তাঁহাকে ভালবাসিত। কেন ভালবাসিত বোধ হয় কেহই জানিত না, জানিতে হয়ত চাহিতও না—তবুও ভালবাসিত। ইহারই নাম অহৈতুকী ভক্তি। তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ তাঁহার জন্য পাগল হইতেন। যে নরেন্দ্রনাথকে জগৎমান্য মনিষী রোমা রোলাঁ ঠাকুবেব “Antithesis” (বিরুদ্ধভাব-সম্পন্ন) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—যে ননেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ নিশ্বাস নির্গত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহাকে কঠোরভাবে পরীক্ষাই করিয়াছেন পরীক্ষা না করিয়া অবতাররূপে গ্রহণ করেন নাই—তিনি চেষ্টা করিয়াও ঠাকুরের আকর্ষণ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারেন নাই এবং দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার শ্রীচরণে প্রেম ও ভক্তির অর্ঘ্য দিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথাদি সন্ন্যাসী-ভক্তদিগের কথা—রাণী রাসমণি, মথুরানাথ, সুরেন্দ্রনাথ, রামমোহন, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্রাদি গৃহীভক্তের অহৈতুকী শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার কথাও না হয়, না-ই বলিলাম—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদিদি, যোগীন্ মা বা (অঘোর মণি) ও গোলাপ-মার কথাও না হয় না তুলিলাম—কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি একটি সাধারণ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর যে অসীম ভালবাসা ও ভক্তির চিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও সাধারণ্যে সুপরিচিত নহে, এই স্থলে সেই অপূর্ব্ব কাহিনী না বলিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে। ভক্তি বা প্রেমের যে আনন্দ সেদিন ব্রাহ্মণীর কথায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী। এইরূপ ভক্তিকেই শ্রীশ্রীঠাকুর সময়ান্তরে “শুদ্ধাভক্তি” নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে একটি পুরাতন ও জীর্ণ বাটীতে এই

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। অকস্মাৎ একদিন তাঁহার একমাত্র কন্যার মৃত্যু ঘটিলে সেই একমাত্র অবলম্বনটি হারাইয়া ব্রাহ্মণী দারুণ শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসিতেন। তাঁহার বিশেষ আবাহনে করুণাময় ঠাকুর সেই কন্যাশোকাতুরা দরিদ্র ব্রাহ্মণীর গৃহে পদার্পণ করিতে সম্মত হইলেন।

কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের ঘরে আসিতেছেন, কাজেই ব্রাহ্মণী সমস্ত দিন ধরিয়া সাধ্যমত নানা উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু কৈ? ঠাকুর ত অসিতেছেন না—তবে কি ভুলিয়া গেলেন! ব্রাহ্মণী শুনিলেন, ঠাকুর নন্দ বসুর বাটীতে আছেন। নন্দ বসু ছিলেন সে অঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ধন-সম্পদ, মান-যশ কিছুরই অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, বড়-মানুষের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ঠাকুর হয়ত তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণী কেবলই "ঘর-বাহির" করিতে লাগিলেন এবং শেষে নিজেই নন্দ বসুর বাটীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। যখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন তখন দেখিলেন, তাঁহার দয়াল ঠাকুর স-পার্ষদ আসিয়া তাঁহারই জীর্ণ গৃহের ছাদের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ছাদের উপর লোকারণ্য—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া উৎসুক নয়নে ঠাকুরকে দেখিতেছেন। "ছেলে বুড়ো,—পুরুষ মেয়ে কাতার দিয়া" দাঁড়াইয়া আছে—সে এক "চমৎকার দৃশ্য।"

ব্রাহ্মণী এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন,—"প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।" শেষে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো!—তোমরা সব বল গো

আমি কেমন ক'রে বাঁচি! ওগো আমার চণ্ডী যখন এসেছিল,—সেপাই শাস্ত্রী সঙ্গে ক'রে—আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল, তখনও যে এত আহ্লাদ হয়নি গো! ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই! মনে করেছিলাম তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে-কালে এলেন না, যা' আয়োজন কল্লুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব; আর ওঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ কর্‌বো না! যেখানে আস্‌বেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখ্‌ব—দেখে চ'লে আস্‌ব! যাই, —সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা!—যাই—যোগীন্‌কে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা! * * * ওগো, খেলাতে (Lotteryতে) একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল;—সে যাই শুন্‌লে, এক লাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহ্লাদে ম'রে গিছ্‌লো—সত্য সত্য মরে গিছ্‌লো! ওগো আমার যে তা-ই হলো গো!—তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, না হ'লে আমি সত্য সত্য ম'রে যাব।"(১)

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সেইরূপ দেব-মানব যাঁহার জন্য সেকালে ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, পুরুষ নারী এইরূপই পাগল হইতেন! শুধু একটি বার দেখা —শুধু একটি বাণী শোনা—ব্যস্‌ আর কিছু নহে, তাহাতেই তাঁহারা মনে করিতেন—ধন্য হইলাম, কৃতকৃতার্থ হইলাম—চাহিবার পাইবার আর কিছু বাকি রহিল না। সেই ঠাকুরের অবতারত্ব যদি শাস্ত্র মন্থন করিয়াই বাহির করিতে হয়, তবে উহার অধিক বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের ভিতর যিনি অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অবতারত্ব কি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া লাভ করিতে হয়?

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

মানব মাত্রেই শত দুঃখে দুঃখী—সুখলাভের জন্য তাহার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কেন এরূপ হয় তাহা সে জানে না, কিন্তু নয়নের জলে সে বুঝিতে পারে তাহার অভাব যেমন ছিল তেমনিই রহিয়া গেল! সে আকুল হইয়া মন্দিরের দিকে চাহে,—গির্জ্জার দিকে চাহে—মস্‌জেদের দিকে চাহে—কিন্তু দেখে যে মন্দিরে দেবতা নাই, গির্জ্জা ও মস্‌জেদ শূন্য! সান্ত্বনা সে পায় না—পায় শুধু মতবাদ ও শাসন! জীবন তখন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে! সেই সঙ্কটের কালে সে যখন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহে, তখন দেখে, প্রভুর বদন করুণার আলোকে স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। তিনি স্নেহবিগলিতকণ্ঠে কহিতেছেন—ভয় কি তোমার? সহ্য কর—সহ্য কর—সহ্য কর—(শ, ষ, স) —যে সয়, সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" যত মত দেখিতেছ, সবই এক একটা পথ জানিও। দৃঢ়পদে যে-কোন পথে অগ্রসর হও, অমৃত-সাগরের তীরে যাইয়া পৌঁছিবে। "যে যা-কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরও ভাল জিনিস পাবে।...তাঁর উপর আন্তরিক মনে ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক। ...ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছ তো! কেন সংসারে হ'বে না। অবশ্য হ'বে। দিনকতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো।—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো"—কে বলে তুমি পাপী, কে বলে তুমি পতিত—অভিশপ্ত—সহায়হীন—সম্বলবিহীন? দুর্ব্বলতাই পাপ। সেই দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া সিংহ-শাবক সিংহের মত জাগ্রত হও!

এতদিন যে ব্যক্তি পদে পদে শত বাধা দেখিতেছিল—দেখিতেছিল সে বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি তাহার নাই—এমন কথা শুনিলে তাহারও মনে তখনই বল আসে—সাহস আসে। সে তখন দেখিতে পায়, এক নিমেষে সকল বাধা দূর হইয়া গেল—প্রগতির পথ

তাহার মুক্ত এবং তাহার মনই সেই পথের নির্ভরযোগ্য একমাত্র প্রদর্শক, বিশ্বাসের বর্ত্তিকা করে ধরিয়া ধীর পদে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে! যাঁহার, ছোট এক একটি মন্ত্র যেমন, 'যত মত তত পথ',—যখন এমন একটা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তখন কোন্ মনুষ্য-হৃদয় তাঁহাকে অবতার বলিয়া—মুক্তিদাতা বলিয়া—বন্ধু বলিয়া—পরম গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবে না? সাধনার পথে যিনি পদমাত্রও অগ্রসর হইয়াছেন এবং এই দেখিয়া দেখিয়া নিত্য হতাশ হইতেছেন যে, মন তাঁহাকেই বশ করিতে চাহে, তাঁহার বশে কিছুতেই আসিবে না—তিনি যখন প্রভুর মুখে শুনেন, "অভ্যাস কর—দেখ্‌বে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে," তখন তাঁহার এক হাত বুক কি দশ হাত হইয়া উঠে না? প্রতি কথায় এই সাহস ও অভয় যিনি দুই করে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যদি মানবের নিকট অবতার-পদ-বাচ্য না হইবেন, তবে কে আর হইবে? শাস্ত্রের, লোকাচারের ও সমাজের নানা বিধানে শৃঙ্খলিত হইয়া যাহারা দিবারাত্রি ক্রীতদাসত্বের দুর্ভোগ ভুগিতেছে (১) তাহারা যখন প্রভুকে বলিতে শুনে—'আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু কর্‌বে। বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌বে না,' তখন কি তাহাদের বন্ধন-শৃঙ্খল খুলিয়া পড়ে না? স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া তখন কি তাহারা এই অবতার-বরিষ্ঠ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণেই জীবনের সকল অর্ঘ্য অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারে? অবস্থার

---

(১) (গানে আছে)— (হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম,
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম,
পরিহরি অভিমান লোকাচার।
কত দিনে হ'বে সে প্রেম সঞ্চার।
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

—লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়—শ্রীশ্রীঠাকুর।

বিপাকে পড়িয়া যে ব্যক্তি লোকাচরিত ধর্ম্মকর্ম্মের কিছুই করিতে পারে না, সে যখন শুনিতে পায় তাহারই হৃদয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রভু গাহিতেছেন—মাভৈঃ! "স্মরণ মনন থাক্‌লেই হ'লো", দারুণ হতাশার মধ্যে যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেকি তখন উল্লাসে বলিয়া উঠে না—জয় প্রভু! জয় রামকৃষ্ণ! জয় মুক্তিদাতা! দাসেরও তবে ভরসা আছে—বাঁচিবার আশা আছে! নিরাশায় মৃতকল্প যে, তাহার হৃদয়েও যিনি এইরূপে শক্তি সঞ্চারিত করিতেছেন—জীবন্মৃতকে এইরূপে যিনি বাঁচাইতেছেন—অবতার বলিয়া, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যদি জীবন-কুসুমের অর্ঘ্য স্থাপন না করি, তবে আর কোথায় করিব? যিনি বিশ্বহিতায় নিজের সকল শক্তি অপরে সংক্রমিত করিয়া নিজে নিঃস্ব হইয়াছিলেন, তিনি অবতার-পুরুষ নহেন ত কে আর অবতার পুরুষ? যিনি অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য তাহার সকল পাপ দীক্ষার দক্ষিণারূপে অম্লান বদনে নিজে গ্রহণ করিতেন এবং এইভাবে দিনের পর দিন নিজেকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিতেন, তিনি যদি অবতার না হ'ন তবে অবতার কে? যিনি নিজের পত্নীকেও শ্রীশ্রীজগদম্বা (১) জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, যিনি রাজপথে বারবিলাসিনীকে দেখিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বলিতেন—'আমার মন্দিরের মা, এই বেশে তুই এখানে এসেছিস্?' তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবতার কি পৃথিবীতে আর কখনও আবির্ভূত হইয়াছেন?

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

---

(১) বেদের পরব্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, খৃষ্টানের God, পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানবাদের ব্রহ্ম, যোগীদের আত্মা, ভক্তের ভগবান্—এই সকলকেই শ্রীশ্রীঠাকুর এক কালী বলিয়াই জানিতেন। তিনি "অনেক ঈশ্বর দেখেন" নাই—এক ঈশ্বর দেখিতেন।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
আবিরাবির্ম্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে যাইবার জন্য তাঁহারাই যোগ্য অধিকরী ছিলেন—যাঁহাদিগের তপস্বীর কণ্ঠে সমুচ্চারিত এই মহান্ প্রার্থনা-মন্ত্র বিশ্ব হইতে বিশ্বে, তথা হইতে বিশ্বান্তরে ঝঙ্কৃত হইতে হইতে শেষে শ্রীশ্রীরুদ্রের সিংহাসনতলে যাইয়া উপনীত হইত এবং তাঁহার যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বর লইয়া ফিরিত। ঋষিদের প্রাণ ছিল, তাঁহারা মন্ত্রেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। কিন্তু সেদিন আর নাই! এখন মন্ত্র 'মন্তোর' মাত্র—প্রাণের আবাহন নহে! এই যুগপরিবর্ত্তন যে প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়াছে—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা ভালরূপেই জানিতেন। তিনি বলিলেন না যে, 'অসতো মা সদগময়' বলিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা না করিলে তিনি শুনিবেন না! তিনি বলিলেন—"আমি মা ব'লে এইরূপে ডাক্‌তাম—মা আনন্দময়ী! দেখা দিতে যে হবে! আবার কখনও বল্‌তাম্—'আমি জ্ঞানহীন—সাধনহীন—ভক্তিহীন—আমি কিছুই জানি না—দয়া ক'রে দেখা দিতে হবে।' ঠাকুর এমন করুণ সুরে এইভাবে মাকে ডাকিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা শুনিলেন তাঁহাদিগের হৃদয় গলিয়া গেল—চক্ষে জলধারা বহিল! ঠাকুর গাহিয়া উঠিলেন—"ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন, কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে!" তখন কোথায় পড়িয়া রহিল—অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়!—যুগগুরুর সকরুণ কণ্ঠে উচ্চারিত এই সরল সহজ ও প্রাণের বেদনায় মাখা ক্ষুদ্র প্রার্থনা-মন্ত্র শ্রোতাদিগের হৃদয়ে হৃদয়ে কি কাল-বৈশাখীর ঝড় বহাইল না—প্রাবৃটের ঘন

বারিধারা ঝরাইল না—কঠিন হৃদয়কেও গলাইয়া দিয়া কি পূতধারা করিল না? গূঢ়যুগযুগান্তরচারী এমন প্রভুকেও যদি যুগগুরু বা জগদ্‌গুরু না বলি, তবে আর কাহাকে বলিব? মানবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার দুর্ব্বলতা ও আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে অনন্ত বাধা এবং তাহার প্রতিদিনের জীবন-যুদ্ধ—অল্প কথায়,—মানবের মন, মনের অসংখ্য বন্ধন-শৃঙ্খল—শৃঙ্খলাবদ্ধের অসহ্য যাতনা প্রভৃতি যিনি প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া, ক্ষুদ্রাবয়ব এবং অতিশয় সহজবোধ্য—এক একটি প্রাণস্পর্শা মন্ত্রে তাঁহার উপলব্ধিলব্ধ পরম সত্যকে বিশ্বমানবের কল্যাণার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং স্বয়ং সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, সেই মন্ত্রটি সাধন করিলেই মানুষ মাত্রেই দেবতা হইতে পারিবে, যিনি সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—দেবত্বলাভ মানব মাত্রেরই জন্মগত অধিকার, কারণ দেবতা তাহার মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন, কল্পনার সুদূর স্বর্গে কোনও রত্ন-সিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত নাই—শুধু স্মরণ-মনন, শুধুই স্মরণ-মনন,—আর কিছু নহে—"তাঁহাকে কেবল ভাব, কেবল ধ্যান কর—ভাব, ডোব,—ডুবিতে ডুবিতে প্রাণ শেষ ক'রে দাও", এমন দয়াল ঠকুর যিনি, তিনিই ত সত্যকার যুগের ঠাকুর—তিনিই ত অবিসংবাদী সমকক্ষবিহীন জগদ্‌গুরু। যিনি একমুষ্টি ধূলি হইতে শত শত বিবেকানন্দ গঠন করিতে পারিতেন সেই মহাশক্তিধরকে অবতার বলিব না ত কাহাকে বলিব? তাই তাঁহাকে প্রণাম—তাঁহাকে প্রণাম—তাঁহাকে আবার আবার প্রণাম—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

WHAT GREAT MEN OF EAST & WEST THINK OF HIM

The Advance—Feb 24, 1936.

It is needless to add with how much love and respect I associate my humble name with the great name of the Superman. Above all he was a rare combination of individuality and universality, personality and impersonality. His word and example have been echced in the hearts of Western men and women.

More than once I had recited from memory, though imperfectly, the lesson of thought learned at some former time (but from whom ? One of my very ancient selves...). Now I re-read it, every word clear and complete, in the book of life held out to me by the illiterate genius who knew all its pages by heart—Ramakrishna.

It is always the same Book. It is always the same man—the Son of Man, the Eternal, Our Son, Our God reborn. With each return he reveals himself a little more fully, and more enriched by the universe.

Allowing for differences of country and of time Ramkrishna is the younger brother of our Christ.

I am bringing to Europe, as yet unaware of it, the fruit of a new autumn, a new message of the Soul, the symphony of India, bearing the name of Ramakrishna.

The man whose image I here evoke was the consummation of [illegible] thousand years of the spiritual life of three hundred million people. Although he has been dead forty years, his soul animates modern India. He was no hero of action like Gandhi, no genius in art or thought like Goethe or Tagore, He was a little village Brahmin of Bengal whose outer life was set in a limited frame without striking incident, outside the social and political activity of the time. But his inner life embraced th

whole multiplicity of men and Gods. It was a part of the verv source of Energy, the Divine Shakti, of whom Vidyapati, the old poet of Mithila, and Ramprasad of Bengal sang.

—ROMIAN ROLLAND
(in his "Life of Ramkrishna", etc.)

When we recollect the great covenants of Eastern Wisdom, a luminous example from our contemporary life stands before us Giants of Enlightenment are outstanding—the Blessed Ramakrishna and the fiery Vivekananda. What an unforgettable example of Blessed Hierarchy! There is no literate country where these great names together with those of Abhedananda, Premananda, Brahmananda, Saradananda and other glorious names of the Ramakrishna Order are not cherished. The Blessed Bhagawan Ramakrishna is bringing from the Himalayan heights the symbol of OM. His yellow robe is furling in the wind, His feet touch the white snows, but gloriously. He proceeds to manifest to Humanity the greatest bliss. Stormy clouds indicate the upheavals and distress of Humanity but great and shiny is the halo round the Blessed Bhagawan's head and He carries His great Mission as a light-bringing beacon.

—NICHOLAS ROERICH.

As Sri Ramakrishna's heart and mind were for all countries, his name too is the common property of mankind. All nations of the world—at least those which transcending the racial and national barriers believe in the Divinity of man—can be united.

—SYLVAIN LEVI

The fervent love of God, nay, the sense of complete absorption in Godhead, has nowhere found a stronger and more eloquent expression than in the utterances of Ramakrishna. They show

the exalted nature of his faith. How deep he has seen into the mysteries of knowledge and love of God we see from his sayings.

—F. MAX MULLER (In his "Life and Sayings of Ramakrishna")

Few men have made deeper impress upon the mind of Bengal (why not of India ?) in recent years than Gadadhar Chatterji, known as Ramakrishna Parama-hamsa, and his chief disciple Narendra Nath Dutt, better known under the title of Swami Vivekananda. At a time when the craze for the ideas and ways of the West was at its height, these men stood for the ancient ideal of the East for renunciation in an age of megalomania, for simplicity at a time when discoveries in mechanical science were making life elaborately complex.

He (Ramakrishna) was no scholar, yet he possessed the power of attracting to himself men of light and leading of his day—Keshub Chander Sen, Pundit Iswar Vidyasagar, Bankim Chatterji and Protap Chandra Mozumdear amongst others. By temperament he was more a mystic than a philosopher. The narrative of his life and teaching recalls inevitably the emotional figure of Chaitanya. His knowledge of God was intuitive and he never felt the need of systematic study.

Apparent contradictions were nothing to him. God is the Absolute, the One, the All, the Brahman of the philosopher. But that does not prevent Him from manifesting himself in different aspect in his relations with the phenomenal world—as Krishna in His aspect of Divine love, as Kali in His aspect of creator of the universe and saviour of mankind.

Ramakrishna did not dissent from the monistic explanation of the universe. It was only that he was driven by temperament to attach far greater importance to the Personal Aspect of God. The Absolute of Shankara could be realised, but only in perfect,

Samadhi.....But when a man returned from Samadhi he became a differentiated ego once more, and was thrown back upon the world of relativity so that he perceived the world-system (Maya) as real. Why? Because with the return of his egoity he was convinced that he as an individual was real; and, "so long as his ego is real to him (real relatively) the world is real too, and the Absolute is unreal (unreal relatively.)" He laid constant stress upon this.....And since Samadhi was not achieved by the average man, he must meditate upon and commune with the Personal God, for "so long as you are a person you cannot conceive of, think or perceive God otherwise as a Person."

—LORD RONALDSHAY (In his "Heart of Aryavarta").

Sri Ramakrishna was the supreme representative of modern spiritual India.

—DR. WALTER SCHUBRING, Professor of Indology, Hamburg University, Germany.

The story of Ramkrishna Paramahamsa's life is a story of religion in practice. His life enables us to see God face to face. No one can reda the story of his life without being convinced that God alone is real and that all else is an illusion. Ramakrishna was a living embodiment of godliness. His sayings are not those of a mere learned man but they are pages from the Book of Life.

They are revelations of his own experiences. They therefore leave on the reader an impression which he cannot resist. In this age of scepticism Ramakrishna presents an example of a bright and living faith which gives solace to thousands of men and women who would otherwise have remained without spiritual light. His love knew no limits, geographical or otherwise.

—MAHATMA GANDHI.

In a recent and unique example, in the life of Ramakrishna Paramahamsa we see a colossal spiritual capacity first driviug straight to the divine realisation, taking as it were, the Kingdom of Heaven by violence, and then seizing upon one Yoga method after another and extracting the substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of an intuitive knowledge. Such an example cannot be generalised. Its object also was special and temporal, to exemplify in the great and decisive experience of a Master-soul the truth, now most necessary to humanity, towards which a world long dividedi nto jarring sects and schools is with difficulty labouring, that all sects are forms and fragments of a single integral truth and all disciplines labour in their different ways towards one supreme experience. To know, be and possess the Divine is the one thing needful and it includes or leads up to all the rest.…… all the rest that the Divine Will chooses for us, all necessary form and manifestation, will be added.

—SRI AUROBINDO (In his "The Synthesis of Yoga" In the Arya no. 5.

Then it was that Sri Bhagavan Ramakrishna incarnated himself in India, to demonstrate what the true religion of the Aryan race [illegible]o show where amidst all its various divisions and off-shoots, scattered over the land in the course of its immemorial history, lies the true unity of the Hindu religion, which by its overwhelming number of sects discordant to superficial view, quarrelling constantly with one another and abounding in customs divergent in every way, has constituted itself a misleading enigma for our countrymen and the butt of contempt for foreigners ; and above all, to hold up before men, for their lasting welfare, as a living

embodiment of the Sanatana Dharma, his own wonderful life into which he infused the universal spirit and character of this Dharma, so long cast into oblivion by the process of time.

"Always remember that Sri Ramakrishna came for the good of the world—not for name or fame. Spread only what he came to teach. Never mind his name—it will spread of itself."

"Once more He has come to help His children, once more the opportunity to rise is given to fallen India. India can only rise by sitting at the feet of Sri Ramakrishna."

"It took me six years to understand that Ramakrishna was not a holy man, but Holiness itself. He was the living embodiment of the Vedas, the Upanishads and other Hindu scriptures. He lived in one single life what not only the Hindu but whole human race lived spiritually for ages."

—SWAMI VIVEKANANDA.

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব

বহু সাধকের
বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার
মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে
অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ
রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ বিদেশের
প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার
প্রণতি দিলাম আনি ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The story of Sri Ramakrishna is really a story of inner life. The life of this Man of Realisation, this Messenger from the mystic Realm of the Spirit, has, I believe an abiding value. For in his life as in the lives of prophets and saints, hath shone the Light Eternal. A spiritual genius, Ramakrishna was a union of the mystic, prophet and saint. He has inherited immortality. He belongs to the Temple of the Future. Not yet have we known him well. Not yet has the world realised his true greatness.

I love to think of Ramakrishna as the Child-Man of the 19th century. He was a simple child of the Divine Mother. He was simple, artless, spontaneous, humble, child-like. Therefore he lives. Therefore his influence grows. Our big man, distinguished to-day, is extinguished to-morrow.

Ramakrishna, born in a little village, now belongs to Humanity, We look to-day in wonderment and marvel at his spiritual stature. as we would at a mountain height. Wonderful, his life ; wonderful, his words ! The sayings of Ramakrishna ! How rich in, thought and reflection ! How pregnant in wisdom ! How vital in their appeal and inspiration ! How fragrant with true mysticism ! The sayings of the Saint have a beauty born of meditation. In his message of one Religion in all relgions, of the one Spirit in all prophets, and the one Divine Life in all Humanity may Hindus and Muslims come together, to serve India.

—T. V. VASWANI (In his "Sri Ramakrishna")

(Quoted from Sri Ramakrishna centenary—Progress of work in India and Abroad)—Belur Math :—

It will interest you to know that I lectured this term on religious movements in modern India and a considerable part of the lecture was devoted to Sri Ramkrishna, his teachings and Pupils. **Prof. O. Stein—Prague (Czecho-Slovakia)**

.......The great admiration which I entertain for this noble and beautiful personality (Sri Ramkrishna)....makes me do all that is possible for me for the arrangement of a re-union according to your idea.. ....(Centenary celebrations).— **Mlle. M. Chovin** (celebrated authoress of the 'Bible And India')—Toulouse (France).

........I shall do even the impossible for Sri Ramkrishna's memory. It is he who gives a goal to my life and I am his servant.— **Dr. J. F. Eliet** (a distinguished physician)—Paris. (France).

... .Sri Ramkrishna has been, thanks to Romain Rolland, the first Light to me on my way to Buddhism—**Mon. Francis F. Rouanet.** (well-known Paris Journalist)– Paris (France).

........Hoping many people may enjoy His (Sri Ramkrishna's) Divine message and be helped by it.—**Mrs. Agatha Liefrench**—Oostenburg (Holland).

.... Ramkrishna rightly deserves the name of Prophet of modern India—**Senator Giovanni Gentile,** President of the Institute Italiana Per II Medio Estramo Oriento—Italy.

It is a matter of great honour to be associated with the Centenary of this great Soul (Sri Ramkrishna). I consider my share in it an unavoidable duty... **Srimat Swami Jayendrapurijee Maharaj** Mandâleswar, Govinda Math—Benares.

....Sri Ramkrishna Paramahansa Deba.. shines like a veritable sun among the galaxy of saints....who has attained the Kaivalya, his inmost reality.......**Srimat Swami Krishnanandaji Maharaj,** Mandaleswar—Hardwar.

স্থানাভাবে এইরূপ অন্যান্য মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

শ্রীশ্রীমা

উদ্বোধন কার্য্যালয়ের সৌজন্যে]

[বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু ২য় খণ্ড

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

ও

তাঁহার দুইটি অন্তরঙ্গ

দেবীং প্রসন্নং প্রণতার্ত্তিহন্ত্রীং,
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্ম্মপাত্রীং।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং,
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যং॥

—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।

(১)

কিঞ্চিৎ কম এক শতাব্দী পূর্ব্বে ১২৬০ সালের পৌষের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পলের সময় বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী নামক নগণ্য একটি ক্ষুদ্র গ্রামে নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র পুষ্পবাটিকায় ছোট একটি ফুল ফুটিয়াছিল। বাতাসে শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি ভাসে নাই তখন, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির কোনও চিহ্ন দেখা যায় নাই তখন, দেব-দেবীর কোনও সভা বসে নাই তখন। পৃথিবীর মানুষ, বাঙ্গালার মানুষ, জয়রামবাটীর মানুষ—কোথাও কেহ যে উৎসবে মাতে নাই, জয়গানে আগমন-বার্ত্তা প্রচার করে নাই, তাহা সুনিশ্চিত। দরিদ্র বাঙ্গালীর গৃহে জননীর আবির্ভাব—সুতরাং সম্ভবতঃ শঙ্খধ্বনিও কেহ করে নাই!

ছোট এতটুকু কুঁড়ির মধ্যে তাহার গন্ধ আবদ্ধ ছিল, তাই গন্ধবহ তখন পরাগ চুরি করিয়া সমৃদ্ধ ও সার্থক হইবার অবকাশ পায় নাই; ফুলটি যখন ফুটিয়া উঠিল, কে ভাবিয়াছিল তখন যে, শত সহস্র ফুলের

মতই পুষ্পজন্মের ব্যর্থতায় মলিন হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে ঝরিয়া পড়িবার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই!—তাহার জন্ম হইয়াছিল দেবতার রত্নবেদীর উপর অর্ঘ্যরূপে স্থাপিত হইবার জন্য। মাতৃমূর্ত্তির প্রতীকরূপে লীলা করিবার জন্য সে ফুল ফুটিয়াছিল—এ কথা কে তখন ভাবিতে পারিয়াছে? পৌষ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীর সেই অন্ধকার সন্ধ্যায় শিশির-সিক্ত মেঘমুক্ত আকাশের লক্ষ লক্ষ ভাস্বর তারকারাজিই শুধু শুভ-সূচনার আনন্দে মুগ্ধ হইয়া আনন্দবারিপূর্ণ শত শত চক্ষু মেলিয়া সেই সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমটির দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়াছিল! এইভাবে, এমনি অনাড়ম্বরে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহেও ১২৪২ সালের এক ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় যে ব্রাহ্মণ-কুমারের শুভাগমন হইয়াছিল—আজ তিনি জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ! বাল্যকালে তিনি গদাধর নামে সুপরিচিত ছিলেন। জয়রামবাটীতে আবির্ভূতা জগদ্ধাত্রীর নাম পূর্ব্বাপরই ছিল সারদামণি।

একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, সারদামণির মাতা শ্যামাসুন্দরী একদিন শৌচে গিয়া একটি বিল্ববৃক্ষমূলে বসিতেই দেখিতে পান যে, সেই বৃক্ষের শাখায় একটি সুন্দরী বালিকা ঝুল খেলিতেছে! তাঁহাকে দেখিয়াই বালিকাটি নিম্নে অবতরণ করিল এবং বাতাসের মত তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিল! এই ঘটনার কিছুকাল পরে শ্রীশ্রী মার জন্ম হইয়াছিল। অন্যে [illegible] যাহাই বলুক—তাঁহার পিতা ও মাতা তাঁহাকে দেবকন্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, শ্যামাসুন্দরী পরে অনেক সময় শ্রীশ্রী-মাকে বলিতেন—"মাগো তুই যে আমার কে মা, আমি কি তোকে চিন্‌তে পার্‌ছি মা!"

গদাধরের বাল্যকাল যেমন পল্লীর অন্যান্য বালকের ন্যায় ছিল না,

উহাতে এমন একটি বিশিষ্টতা ছিল যাহা সর্ব্বদা গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—শ্রীমার বাল্যজীবনও ছিল অনেকটা সেইরূপ। বালিকা বয়সেই তিনি দেখিতেন যে, তাঁহারই মত আর একটি বালিকা তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতেছে, তাঁহারই মত কাজও করিতেছে—কিন্তু অন্য কোন লোক নিকটে আসিলেই সে বালিকাটিকে কেহ আর দেখিতে পাইত না।

গদাধর নিজ গ্রামে থাকিবার সময় সকল বিষয়েই প্রতিভার পরিচয় দিলেন, কিন্তু কেতাবী-বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে উদাসীন রহিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল। সেখানেও তিনি ভ্রাতার টোলে পড়িলেন না—বলিলেন, 'চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি চাই না। যে বিদ্যায় ভগবান্ লাভ হয় আমি তাহাই শিখিতে চাই।' জয়রাম-বাটীতেও দেখা যায়, শ্রীশ্রীমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই; পরে তিনি আপন চেষ্টায় কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সরল পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিতেন। তাঁহার মন ও চরিত্রের উপর সেকালের যাত্রা-কথকতা প্রভৃতির অনেক প্রভাব ছিল।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজারী হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফুল-চন্দনের পূজা ছাড়িয়া প্রাণের অর্ঘ্যে জগজ্জননীর পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা ও ভগবান্ লাভের জন্য আকুল রোদন অন্য লোকের নিকট এমনি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল যে, তাহারা বলিল—ছোট ভট্‌চাজ্ পাগল হইয়াছে! তাঁহার জননী চন্দ্রমণি এ কথা শুনিলেন এবং অবিলম্বে পুত্রকে গৃহে আনিয়া, বিবাহ-বন্ধনে সংসারের সহিত বাঁধিবার আয়োজন করিলেন। গদাধরের বয়স তখন ২৪ বৎসর ছিল। চারিদিকে যখন পাত্রীর সন্ধান হইতে লাগিল গদাধরই তখন শ্রীশ্রী-মার কথা বলিয়া দিলেন। তাঁহার

বয়স ছিল তখন ছয় বৎসর মাত্র। বাঙ্গালা দেশে সেকালে এইরূপ অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া দূষণীয় ছিল না।

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে যেদিন এই শুভোদ্বাহ সংঘটিত হয় সেদিন বিবাহ কালে—

জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে যবে বরে ঘেরে রমণী সকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সূতা॥

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি। (১)

বিবাহের কালে হরিদ্রারঞ্জিত এই মাঙ্গলিক সূতা দগ্ধ হওয়ায় সকলের মনেই অমঙ্গলের একটি কালো ছায়া আসিয়া পতিত হইল বটে, কিন্তু সেই শঙ্কা যে ভিত্তিহীন সংস্কার মাত্র তাহা শ্রী-মার পরবর্ত্তী জীবন সপ্রমাণিত করিয়াছে। যাহা হউক, পর বৎসর কুলপ্রথা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীতে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় ৬।৭ বৎসর চলিয়া গেল—গদাধর দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। তিনি যে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার যে পত্নী আছে সে কথা তাঁহার আর মনেই রহিল না! তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে মা মা করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন এবং ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তান্ত্রিক সাধনায় নিযুক্ত [illegible]ন। পত্নী ত দূরের কথা, গদাধর তখন নিজের দেহকে পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন। স্মরণে আছে কেবল মা—মা—মা।

তের বৎসর বয়সের সময় শ্রী-মা যখন অল্পদিনের জন্য শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার একটি অদ্ভুত দর্শন ঘটিয়াছিল। প্রতিদিন হালদার পুষ্করিণীতে স্নানে যাইবার সময় তিনি দেখিতেন যে, কোথা

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

হইতে আটটি রমণী আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের ৪ জন অগ্রে অগ্রে ও ৪ জন মার পশ্চাতে গমন করিতেন। একা একা কেমন করিয়া হাল্‌দার পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া শ্রী-মার মনে যে শঙ্কা জাগিয়াছিল, এই ভাবে সঙ্গিনীলাভ করিবার পর সে শঙ্কা আর রহিল না। কিন্তু সঙ্গিনীরা যে কে এবং কোথা হইতে আসেন শ্রী-মা তাহা বুঝিতে পারিতেন না। কোন ভক্তের নিকটে তিনি বলিয়াছেন যে, যে কয়েক দিন কামারপুকুরে ছিলেন, প্রত্যহই এইরূপ দর্শন ঘটিত। (১)

এই ঘটনার কিছুকাল পর যখন ১২৭৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে আসিলেন তখন তিনি ৬৪ খানি তন্ত্রের সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক বেদান্ত সাধনাতেও সিদ্ধ হইয়াছেন। "জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক অবতার-প্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে" তিনি তখন একাদিক্রমে ছয় মাস অবস্থান করিয়াছেন! তখন ঠাকুরের শরীরটা যে আছে, সে বিষয়ে আদৌ হুঁস্ ছিল না! খাইব, শুইব, শৌচাদি করিব এসকল কথাও মনে উদিত হইত না।…সে অবস্থায় আমি আমারও নাই, আর তুমি তোমারও নাই!"…"কেবল আনন্দ! কেবলই আনন্দ! তার দিক নাই, দেশ নাই, অবলম্বন নাই, রূপ নাই, নামও নাই! কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায়, সে সকলের অতীত এক প্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত! যাহাকে শাস্ত্রে 'আত্মায় আত্মায় রমণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই প্রকার এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থার উপলব্ধিই ঠাকুরের তখন নিরন্তর হইয়াছিল।" (২)

(১) শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।
(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

এইরূপ সমাধির অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে একটি গীত রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ—

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে জগত-সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়া দল মহালয়ে প্রবেশিল,
রহে মাত্র 'আমি আমি' এই ধারা অনুক্ষণ ।
সে ধারাও বন্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্ মনসো গোচরে বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

সুদীর্ঘ ছয়টি মাস এই ভাবে যাঁহার কাটিয়াছিল, যাঁহার মুখে বলপূর্ব্বক আহার তুলিয়া দিয়া জীবন রক্ষা করিবার জন্য কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া ছয়টি মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন —ছয়মাস পর তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত কামারপুকুরে আসিলেন।

ইহার বহু পূর্ব্বেই ত গুরু তোতাপুরী তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়া বলিয়াছিলেন—"তাহাতে আসে যায় কি। স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি [illegible]বে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদ-দৃষ্টি সম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে বহু দূরে রহিয়াছে।" (১)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২)

শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আসিলেন, জয়রামবাটী হইতে নববধূ শ্রী-মাকেও তথায় আনা হইল। তখন তিনি ফুটনোন্মুখী নলিনী। সেই কমল-মালা গলায় তুলিয়া সন্ন্যাসী শিব হইলেন গৃহী-সন্ন্যাসী। শ্রীবুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্যের মত তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত পালনের জন্য অগ্রসর হইলেন না। গুরু তোতাপুরীর আদেশ তাঁহার কর্ণে বাজিতে লাগিল—"স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন কি না পত্নীকে শয্যা-পার্শ্বে লইয়া তিনি তখন সেই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্যপালনে আদৌ পরাঙ্মুখ হইলেন না! "গৃহস্থালীর প্রত্যেক ছোট-বড় ব্যাপার—প্রদীপের শলিতাটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক, ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে" প্রভৃতি সাংসারিক জীবনের সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই তিনি পত্নীকে শিক্ষা দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিলেন—"মানব জীবনের গভীর উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন ও ঈশ্বরে সর্ব্ব-সমর্পণ।" পত্নীর সম্মুখে আদর্শ রূপে জ্বলিতে লাগিল পতির ঐশ্বরিক জীবন—কামগন্ধহীন অথচ প্রেমপরিপূর্ণ ও সুন্দর—সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ছবি যেন হাসিয়া হাসিয়া নাচিতে লাগিল। বেশী দিন নহে সাত মাস মাত্র এই ভাবে কাটিল—তাহারই মধ্যে শ্রীশ্রী-মা বুঝিলেন—"হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে।" "সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে" তাঁহার "অন্তর যে কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত" তাহা তিনি পরেও বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন না! (১)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।
শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

এমন সুখের মধ্যে সাতটি মাস আর কয়টি দিন—উহা সত্যই আসিয়াছিল, কি আসে নাই তাহা বুঝিতেই ত কাটিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন এবং হৃদয় মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের হাস্যমধুর লীলা দেখিতে দেখিতে শ্রী-মা গেলেন পিত্রালয়ে—মনে মনে অনুভব করিলেন, "তিনি যেন অনন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন।" শ্রী-মা ডুবিয়া গেলেন চিত্তের আনন্দ-সমুদ্রে আর শ্রীরামকৃষ্ণ ডুবিয়া গেলেন সাধন-সাগরে—পত্নীর ছায়াও সেই সাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিল না—সাগরের বক্ষ ত দূরের কথা!

শ্রী-মার হৃদয়ের সেই অনুভূতি ও আনন্দ সংসারে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, যে আনন্দানুভূতি নারীকে দেবী করে, যাহা তাহার ইষ্ট-ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত পতিদেবতার মধ্যেই আনিয়া স্থাপিত করে। সেই অপরিসীম আনন্দ শ্রী-মাকে "চপলা না করিয়া শান্ত-স্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব সাধারণের দুঃখ কষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনা-সম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল।" (১)

এই ভাবে জয়রামবাটীতে দিন কাটিতে লাগিল। দিনের পর দিন শ্রী-মা মনে করিতে লাগিলেন, পতিসেবায় চরিতার্থতা দান করিবার জন্য আজ দক্ষিণেশ্বর হইতে আহ্বান আসিল না বটে, কাল নিশ্চয়ই আসিবে—তাঁহার এমন প্রেমময় দেবতুল্য স্বামী, তিনি কি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? দিনের পর দিন যাইতে লাগিল কিন্তু আহ্বান আর আসিল না! মা তখন বর্ষার স্ফীতকায়া ভাগীরথী হইয়াছেন—কূল

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

ছাপাইয়া সে গঙ্গার তরঙ্গ খেলিতেছে, আর সেই তরঙ্গের শিরে শিরে চরণ স্থাপন করিয়া জগতে অতুল পতি-দেবতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! শ্রী-মা সেই দেবতার শ্রীচরণে মনে মনে প্রেমকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে করিতে দণ্ডে দণ্ডে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন! নয়নের সে উষ্ণ প্রস্রবণ ত আর থামে না! ব্যথিত হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল—

সজনি কে কহ আওব মাধাই
বিরহ পয়োনিধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই ॥
এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোঁড়লু জীবনক আশা ॥—বিদ্যাপতি।

মনের যখন এই অবস্থা, সেই সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, গ্রামের পুরুষগণ কল্পনা করিতেছে—শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ হইয়াছেন, "পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া" বেড়াইতে-ছেন! মা শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। সমবয়স্কা রমণীগণ সমবেদনা দেখাইবার জন্য এক একদিন আসিয়া বলিতে লাগিল—আহা! এমন মেয়ের স্বামী কি না পাগল হ'লো! লোকে যে তাঁহাকে এই ভাবে করুণার পাত্রী বলিয়া মনে করিতেছে ইহাই তখন তাঁহার হৃদয়ে বিষের কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল! তিনি মনে মনে জানিতেন তাঁহার আনন্দময় জীবন-দেবতা কি কখনও পাগল হইতে পারেন? ইহা অসম্ভব! কিন্তু যাহাদের জিহ্বাগ্রে তীব্র বিষমাখা তীক্ষ্ণ হুল আছে—তাহাদিগকে কে নিরস্ত করিতে পারে? পতি-নিন্দা যে সতীর প্রাণে কত প্রবলভাবে আঘাত করে ইহা তাহারা

যখন ভাবিয়াই দেখিল না তখন শ্রী-মা নিরুপায় হইয়া সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন এবং নিজের গৃহে নিজেকে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন—প্রতিবেশীদিগের গৃহে যাতায়াত বন্ধ করিলেন। কিন্তু মন বুঝে ত প্রাণ বুঝে না! যে স্বামী তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্রেমের ধারায় সিক্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন—কৈ তিনি ত সেবা লইবার জন্য আর ডাকিলেন না? তবে কি লোকে যাহা বলিতেছে তাহাই ঠিক? অনেক চিন্তার পর মা সঙ্কল্প করিলেন, দক্ষিণেশ্বরেই যাইতে হইবে—তিনি না হয় না-ই ডাকিলেন, কিন্তু আমার সেবা করিবার অধিকার কাড়িয়া লইবে কে? মার পদ্ম-আঁখি সিক্ত করিয়া অবিরল ধারায় জল ঝরিতে লাগিল। কথায় বলে—বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। শ্রী-মার দশা তাহাই হইল! স্ত্রী-সুলভ লজ্জা পথ রোধ করে। কেমন করিয়া তিনি পিতাকে কহিবেন—আমি দক্ষিণেশ্বরে পতি-দর্শনে যাইব! জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বর—সে যে বহু দীর্ঘ পথ—সে পথের স্থানে স্থানে তেপান্তরের মাঠ, আর সেই মাঠে নাকি ডাকাতের দল ঘুরিয়া বেড়ায়! সঙ্গী না পাইলে কেমন করিয়া একাকিনী সেই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিবেন এই চিন্তাতে আকুল হইয়া শ্রী-মা দিবানিশি রোদন করিতে লাগিলেন। সে নয়নাশ্রু আর কেহ দেখিতে পাইল না; দেখিলেন তিনি, আর দেখিলেন তাঁহার অন্তরের ভগবান্। মা কাঁদিতে লাগিলেন—"চোর রমণি জনি মনে মনে রোয়ই—অম্বরে বদন ছপাই।"

১২৭৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রী-মা গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কয়েক জন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার জন্য তখন প্রস্তুত হইতেছিলেন। শ্রী-মার পিতা তাঁহাদিগের

মুখে এই কথা শুনিয়া অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, কন্যার এখন দক্ষিণেশ্বর যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিনি তখন নিজেই সহযাত্রী হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। অর্থের অভাবে শ্রী-মার জন্য পাল্কী সংগ্রহ করা সম্ভব হইল না। শ্রী-মাকে লইয়া সকলে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। সে দিন গঙ্গা চলিলেন সাগরসঙ্গমে—পথের দুর্গমতা কি তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে!

দুই তিন দিন পথ চলিবার পর পথশ্রমে ও ক্লেশে শ্রী-মার প্রবল জ্বর হইল। পিতা পীড়িতা কন্যাকে লইয়া একটি চটিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পরবর্ত্তীকালে মা তাঁহার কোন স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন—"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁস, লজ্জা-সরম রহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম, পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল—মেয়েটির রং কালো, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ গা?' রমণী বলিল,—"আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।" শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম,—"দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাব, তাঁকে দেখ্‌ব, তাঁর সেবা করব, কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে আর ঐ সব হল না।" রমণী বলিল—"সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈ কি। ভাল হ'য়ে—সেখানে যাবে, তাঁকে দেখ্‌বে। তোমার জন্যইত তাঁকে সেখানে আট্‌কে রেখেছি।" আমি বলিলাম—"বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?" মেয়েটি বলিল, "আমি তোমার বোন হই।" আমি বলিলাম—"বটে? তাই তুমি এসেছ!" ঐরূপ কথা বার্ত্তার পরই ঘুমাইয়া পড়িলাম।" (১)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

যখন প্রভাত হইল মা দেখিলেন, দেহে আর জ্বর নাই, দুর্ব্বলতাও নাই; স্বামী-সন্দর্শনের আশায় মন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পিতা ও কন্যা বাকী পথ পদব্রজেই চলিলেন—প্রতিপদক্ষেপ যখন মাকে তাঁহার বাঞ্ছিত তীর্থের নিকটবর্ত্তী করিতেছিল তখন পুনরাগত জ্বরের বেগকে উপলক্ষ্য করিয়া পথে কি আর বিলম্ব করিতে ইচ্ছা হয়? জ্বরের কথা পিতাকে জানিতে না দিয়া শ্রী-মা পিতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন চলিতে লাগিলেন এবং যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে!

ভাগীরথী সমুদ্র পাইয়া তন্মুহূর্ত্তেই নিজেকে তাহার ভিতর নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন—রোগ, শ্রম, ব্যাকুলতা, মনোবেদনা, উৎকণ্ঠা কিছুই আর তখন রহিল না। ঠাকুর কহিলেন—"কিগো, তুমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?" উত্তরে মা বলিলেন—"না, আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টান্‌তে যাব, তোমার ইষ্ট-পথেই সাহায্য কর্‌তে এসেছি।' (১)

যেমন হর—তেমনি তাঁহার পার্ব্বতী! হর-পার্ব্বতীর সেই মিলনে সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর শ্রীবৃন্দাবন হইয়া উঠিল। প্রাণ আনন্দ-উল্লাসে গাহিতে লাগিল—

জো তুম্ তোড়ো পিয়া মৈ নহিঁ তোড়ুঁ।
তোরী প্রীত তোড়ী প্রভু কিণ সঙ্গ জোড়ুঁ॥
তুম্ ভয়ে তরুবর মৈঁ ভঈ পঁখিয়া।
তুম্ ভয়ে সরোবর, মৈঁ তেরী মছিয়া॥
তুম্ ভয়ে গিরিবর মৈঁ ভঈ চারা।
তুম্ ভয়ে চংদা, হম্ ভয়ে চকোরা॥

---

(১) শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

তুম্ ভয়ে মোতী প্রভু, হম্ ভয়ে ধাগা।
তুম্ ভয়ে সোনা, হম্ ভয়ে সুহাগা॥
বাঈ মীরাকে প্রভু, ব্রজকে বাসী।
তুম্ মেরে ঠকোর, মৈঁ তেরী দাসী।

—মীরাবাঈ। (৩)

—হে প্রিয়, তুমি যদি এই বন্ধন ছিঁড়িতে পার, ছিঁড়িয়া ফেল; আমি কখনো ছিঁড়িব না। তোমার প্রীতির ডোর ছিন্ন করিয়া আর আমি কাহার সঙ্গে বাঁধিব? তুমি প্রভু তরুবর, আমি তাহাতে পাখী—তুমি যে সরোবর, আমি তাহাতে মৎস্য—তুমি গিরিবর প্রভু, আর আমি সেই গিরির আশ্রয়ে ক্ষুদ্র একটি চারা-লতা। তুমি চাঁদ আমি চকোর। হে প্রভু, মুক্তা তুমি—আর আমি সেই মুক্তা-হারের সূতা—তুমি সোনা, আমি তোমার সোহাগা। হে ব্রজের বাসী, মীরার প্রভু—তুম্ মেরে ঠাকোর' মেঁ তেরী দাসী।

দাসীকে পায়ে রাখো প্রভু—পায়ে রাখো!

শ্রী-মার কথা শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, পরে এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"ও যদি এত ভাল না হ'তো, আত্মহারা হ'য়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তা' হ'লে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহ-বুদ্ধি আসত কি না কে বলতে পারে?"

(৩)

শ্রী-মা দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন—উন্মেষযৌবনা লীলাময়ী নারী। তিনি একাদিক্রমে আট মাস স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হইলেন; ঠাকুরের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পরীক্ষা আরম্ভ হইল! প্রতিদিন নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া তিনি যেমন পত্নীকে গৃহিণী করিয়া তুলিলেন, যেমন তাঁহাকে

(১) মীরাবাঈ—শ্রীঅনাথ বসু।

শিখাইলেন সংসার-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—যখন 'যেমন তখন তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন', তেমনি তাঁহার অন্তরে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন এক মহতী অধ্যাত্মশক্তি, যাহার বলে কিছুকাল পরই এই গৃহিণী হইয়াছিলেন মা এবং গুরু। এই সময়ে ঠাকুরের মন সর্ব্বদা উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিত এবং প্রায়ই সমাধিতে লীন হইয়া যাইত। তিলেকের জন্যও পতি পত্নী কাহারও মনে দেহবুদ্ধি আসিতে পারিল না! 'আমি পুরুষ' এ ভাব ঠাকুরের মন হইতে মুছিয়া গেল;—তিনি মনে করিতে লাগিলেন, তিনি যেমন জগন্মাতার একজন দাসী, পত্নীও তেমনি তাহাই। তাঁহাকে নারী-বেশে সজ্জিত করিবার জন্য তিনি কোন কোন দিন পত্নীকে বলিতেন। পত্নীও পরমানন্দে পতিকে রমণীর বেশে সাজাইয়া দিলে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। মাতৃভাবের এই আদর্শ স্থাপন করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বিবাহ করিয়াছিলেন,—বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হন নাই!

স্বামী-স্ত্রীতে দক্ষিণেশ্বরে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। "কিন্তু লোকাতীত ঠাকুর তাঁহাকে কখনও জগন্মাতার অংশভাবে এবং কখনও বা আত্মা বা ব্রহ্মভাবে ভিন্ন অন্য কোনো ভাবেই দৃষ্টি করিতে" পারিলেন না। এই কালের একটি কথা শ্রী-মা বলিয়া গিয়াছেন—"একদিন দুপুর বেলায় ঠাকুর ছোট খাটটিতে ব'সে, আমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছি। কেউ কোথাও নাই। জিজ্ঞাসা করলুম—'আমি তোমার কে?, তিনি অমনি উত্তর দিলেন—'তুমি আমার মা আনন্দময়ী।' ঠাকুর স্থূলদেহে অপ্রকট হইলে—"আমার মা-কালী কোথা গেলে গো" বলিয়া শ্রী-মা কাঁদিয়া [illegible]য়াছিলেন!

শ্রী-মা ছিলেন লজ্জাশীলতার প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষিণেশ্বরে অতি ক্ষুদ্র নহবত-ঘরে যখন তিনি থাকিতেন তখন কত লোক যে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত তাহার ঠিকানা নাই—কিন্তু জন-প্রাণীটিও বুঝিতে পারিত না যে, নহবত-ঘরে শ্রী-মা বাস করিতেছেন! শুধু বাসগৃহ নহে—উহাই ছিল আবার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। কোনও স্ত্রী-অতিথি আসিলে তিনিও মার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র নহবত-ঘরেই শয়নের স্থান পাইতেন! রাত্রি তিনটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদির পর মা গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। অন্ধকারে ঘাটে নামিবার সময় একদিন তাঁহার পা একটি কুম্ভীরের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল! তাহার পর হইতে যখনই তিনি নহবত-খানা হইতে গঙ্গার দিকে যাইতেন, শুনিয়াছি সেই দিক্ হইতে অমনি একটি তীব্র আলোকধারা বাহির হইয়া ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত! সেই আলোকে অবগাহন স্নানাদি করিয়া শ্রী-মা নহবত-ঘরে ফিরিতেন এবং শুনিতে পাই প্রতিদিন এক লক্ষ জপ না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। মা যেমন নিজেও জপ করিতেন, তেমনি শিষ্য-শিষ্যা-দিগকেও প্রথমে জপ করিবার জন্যই আদেশ দিয়া বলিতেন—"ধ্যান না হয়, জপ কর্‌বে, জপাৎ সিদ্ধি। জপ কর্‌লেই সিদ্ধি লাভ কর্‌বে। ধ্যান হ'ল ভাল, না হয় জোর ক'রে ধ্যান কর্‌বার দরকার নাই।" (১)

দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পর হইতে "সমস্ত দিন মায়ের বিশ্রাম ছিল না। ভক্তদের জন্য তিন সের—সাড়ে তিন সের আটার রুটি হইত। পান-ই সাজিতেন কত। তারপর ঠাকুরের দুধ খুব ঘন করিয়া জ্বাল দিতেন; কারণ ঠাকুর সর ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্য ঝোল হইত। ঠাকুরের খাবার মা তাঁর ঘরে গিয়া দিয়া আসিতেন!...ছেলেরা কেহ না থাকিলে স্নানের সময় মা ঠাকুরকে তেল মাখাইয়া দিতেন। গোলাপ দিদি

(১) শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীসরল বালা দাসী।

আসিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে ভাতের থালা আনিতে বলেন। তদবধি গোলাপ দিদি প্রত্যহই ভাত লইয়া যাইত। ভাত দিতে গিয়া মা রোজ ঠাকুরকে একবারটি দেখিতে পাইতেন, এইরূপে তাহাও বন্ধ হইল।" (১)

এক সময়ে মা নিজেই বলিয়াছেন—"কখন কখনও ছ'মাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম্ না। মনকে বুঝাতুম্, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস্ যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি।" (২) ঠাকুর শ্রীশ্রী-মার মনে এই ভাবটি বিশেষভাবে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন যে,—'চাঁদা মামা সকলেরই মামা'—ঠাকুরের উপর অন্য ভক্তদিগের যেরূপ দাবী, মার দাবীও ততটুকুই। পরবর্ত্তীকালে মা-গুরু তাঁহার ভক্তদিগের প্রাণে ভরসা আনিবার জন্য সর্ব্বদাই বলিতেন—'ভয় কি, আমাদের ঠাকুর আছেন!' "আমাদের ঠাকুর!"—একলা তাঁহার নহেন!

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে সেই শুভক্ষণ আসিয়া উদিত হইল যখন বহুশত বৎসর পর শ্রীচণ্ডীর মহাবাক্য এই ঘোর কলিযুগেও সত্যের মূর্ত্তি পাইল—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেব্যাদূত সংবাদঃ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শাণিত অস্ত্রখানিকে আরও সুশাণিত করিবার জন্য ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী কালীপূজার দিনটি নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহার বাস-কক্ষে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে

(১) শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীসরলা বালা দাসী

(২) শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

পর ঠাকুর পূজায় বসিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত শ্রী-মা আসিয়া পূজা-পীঠে উপস্থিত হইলেন। কলসে গঙ্গাবারি ছিল। ঠাকুর সেই মন্ত্রপূতঃবারি দিয়া শ্রীশ্রী-মাকে বার বার অভিষিক্ত করিলেন—শেষে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—"হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরা-সুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। ইহার শরীর ও মনকে পবিত্র ক'রে এঁতে আবির্ভূ'তা হ'য়ে সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর।"

তখন শ্রীশ্রী-মার অঙ্গে মন্ত্র সকলের যথাবিধি ন্যাস করা হইল! সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে ঠাকুর তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন এবং সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন! সেই সুপবিত্রক্ষণে পূজ্য এবং পূজকের, পতি এবং পত্নীর পার্থিব সকল সম্বন্ধ একেবারে মুছিয়া গেল!

পূজ্য পূজকেতে দু'য়ে ভাবরাজ্য তেয়াগিয়ে
ভাবাতীতে একত্র মিলন।
দেহ দু'টি প'ড়ে হেথা, মিলিয়া গিয়াছে সেথা,
বিয়ের বারতা বুঝ মন।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

পৃথিবীর মানব ত দূরের কথা—স্বর্গের দেবতারাও যাহা কোন দিন কল্পনা করিতে পারেন নাই, বাঙ্গালার দক্ষিণেশ্বরে সেই মহৎ বৃহৎ অচিন্তিতপূর্ব্ব স্বপ্নেরও অগোচর এবং দেব ও মানবের অসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া গেল! নিশার তৃতীয় প্রহর তখন অতীত হইয়াছে—কলস্বনা ভাগীরথীর কলধ্বনি তখন পূজামণ্ডপের চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, গঙ্গাবারিনিসিক্ত পুণ্যপবন বৃক্ষের পত্র হইতে পত্রান্তরে হিল্লোলিত হইতেছে, মর্ম্মরধ্বনিতে দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণ মুখরিত হইতেছে—সেই সময় ঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্যদশা আসিল। তিনি বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখিলেন এবং তাহারই সহযোগে "পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনকালে ব্যবহৃত

বস্ত্র, আভরণ ও রুদ্রাক্ষের মালাদি সমুদয় দ্রব্য, পূর্ব্বসাধনার সকল ফল" এবং নিজেকে পর্য্যন্ত সেই দেবী-পাদমূলে সমর্পণ করিলেন! সেই দণ্ডে ঠাকুরের সকল পূজার ইতি হইয়া গেল! নারীর মর্য্যদা স্থান পাইল সেদিন হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গেরও ঊর্দ্ধে এবং আজ পর্য্যন্তও এই বিস্ময়কর ব্যাপার সমগ্র বিশ্বের ধারণারও অতীত হইয়া আছে! পৃথিবীর কোন যুগে কোন অবতারে এমনটি কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখন শুনেও নাই! নবরূপে প্রতিষ্ঠিত এই নারী-মহিমাকেই অতিশয় সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন আমাদের শ্রীশ্রী-মা, তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী কর্ম্ম ও চিন্তার ধারাকে পৃথিবীর নারীর আদর্শরূপে দান করিয়া। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"কর্ম্মই লক্ষ্মী। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক—কাজ ছাড়া এক মুহূর্ত্তও কাহারও থাকা উচিত নয়। সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাক্‌লে মনের সমতা রক্ষিত হয়, আর কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন কাটে।" নারী যাহাতে মানুষের পরিবর্ত্তে ভগবান্‌কেই জীবনের সর্ব্বস্ব করে তাহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। স্বামীসঙ্গ যে নারীর ধর্ম্মলাভের প্রধান সহায় একথা যেমন তিনি মুখেও বার বার বলিয়াছেন, কাজেও তেমনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণীই ছিল—"স্বামী-স্ত্রী এক মত হ'লে তবে ধর্ম্ম লাভ হয়।" পতিব্রতা নারীর জীবন যে সংসারে সর্ব্বসুখদায়ক ও সর্ব্বমঙ্গলের নিদান শ্রী-মার জীবন তাহারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। "দীর্ঘকালব্যাপী অশেষবিধ কষ্টের মধ্যেও সর্ব্বপ্রকার আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া যাঁহারা স্বীয় পতির সেবায় অবহিত ও পতিতেই অনুরক্তা, শ্রীশ্রী-মা তাঁহাদের বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন।" শুধু তাহাই নহে—তাঁহাদের অন্তরের অভিলাষ তিনি অযাচিতভাবে পূর্ণ করিয়া দিতেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও অট্টালিকা এবং ভগবান্ ও পতি এতদুভয়ের মধ্যে

পত্নীকে যদি কোনও একটি বাছিয়া লইতে হয় তবে পত্নী পতিকেই লইবেন, ভগবান্‌কে নহে! এ যুগে শ্রী-মাই ছিলেন পতাব্রত্যেই আদর্শ— মাতৃত্বের আদর্শ—নারী-মহিমার গৌরব মুকুট।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সার কথা—সেবা। শ্রীশ্রী-মা ছিলেন সেই সেবার প্রতিমূর্ত্তি। পিতৃগৃহের ও পতিগৃহের দৈনন্দিন তীব্র অসচ্ছলতার মধ্যে সে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরিণতি লাভ করিযাছিল এই মহিয়সী দেবরমণীর জীবনে। সেই অসচ্ছলতাই তাঁহার অলৌকিক আত্মত্যাগ ও পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনকে এতই মহান্, বিরাট ও অনন্য-সাধারণ করিয়াছিল যে, একটি দিনের জন্যও তাঁহার সন্নিকটে আসিলে অতি বড় অবিশ্বাসীও তাঁহাকে দেবী জ্ঞান করিয়া চরণধূলি লইত এবং সেই মহাপ্রসাদ না পাইলে মনে করিত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ভক্তসন্তানগণ তাহাদিগের গর্ভধারিণীর নিকটে যে স্নেহ পায় নাই, এই বিশ্বজননীর নিকট তাহারও বেশী পাইয়াছে। এমন দিনও জয়রামবাটীতে গিয়াছে যখন শহরের কোন ভক্ত সন্তান সেই পল্লীভবনে মার চরণধূলি লইয়া ধন্য হইবার জন্য আসিলে, মা তাহার চা-পানের দুগ্ধের জন্য বাটী হস্তে প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন, তথাপি চা-এর অভাবে পুত্রকে অসুবিধা ভোগ করিতে দেন নাই!

শ্রীশ্রীঠাকুরের যখন গলরোগ হইল তখন অনেকেই ত তাঁহার সেবাধিকার পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রী-মার সেবার কাছে তাঁহাদের সেবা চন্দ্রের কাছে খদ্যোতের মতই নিষ্প্রভ হয়। কি দক্ষিণেশ্বরে, কি কাশীপুরে দিনের পর দিন তিনি সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় রোগী ও রোগশয্যাকে আবর্ত্তন করিয়া ফিরিতেন এবং যেরূপে তাঁহার হৃদয়-নিঙ্‌ড়ানো মমতা মিশাইয়া নানাবিধ পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিতেন তাহার তুলনা নাই। সেই সেবা ছিল একান্ত মৌন,

তিলেকের তরেও তাঁহার মুখে শব্দ ফুটে নাই—সে ছিল হোমধূমগন্ধের ন্যায় সুপবিত্র—ধূপ যেমন নিজেকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া অকাতরে গন্ধ বিলায়, শ্রীশ্রী-মার সেবার রূপও ছিল সেইরূপ। সেবিকাকে চক্ষে দেখিতে পায় নাই কেহ, কিন্তু দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার সেবা মাহাত্ম্যের স্নিগ্ধ কোমল মধুর স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে সকলে, ধন্য হইয়াছে সকলে এবং নবীন প্রাণ-শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়াছে সকলে।

একদিন কোনও ডাক্তারের গৃহিণী—শ্রীশ্রী-মার শিষ্যা প্রার্থনা করিলেন,—"মা আশীর্ব্বাদ করুন, ওঁর যেন পশার বৃদ্ধি হয়।" প্রার্থনা শুনিবামাত্র মাতৃহৃদয়ে প্রবল আঘাত লাগিল। তিনি কহিলেন—"না বাপু, তা' আমি পারবোনি। তেমন আশীর্ব্বাদ করা মানেই লোক-জনের খুব অসুখ-বিসুখ হোক্! তেমন আশীর্ব্বাদ আমি করতে পারবোনি।" একেই বলে মা! শুধু আমার মা নহেন, তোমার মা নহেন—সকলের মা! সকলের মা ছিলেন বলিয়াই গত মহাসমরে যখন লোকক্ষয়ের সংবাদ আসিত তখন তিনি ব্যথায় কাঁদিতেন—উড়িষ্যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মাতৃনিকেতনে অবিরলে তাঁহার নয়ন ঝরিয়াছিল!

কাশীপুরে একদিন আসিল সেই ভীষণ ক্ষণ—বাঙ্গালার পক্ষে ভীষণ, ভারতের পক্ষে ভীষণ, যখন শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রী-মা বলিয়াছেন,—"পরদিন আমি হাতের বালা খুলতে যাই, তিনি খপ্ ক'রে আমার হাত দুটো ধ'রে বল্লেন,—আমি কি কোথাও গেছি গো? এই যেমন এ ঘর থেকে ও-ঘর!" ঠাকুর আছেন—যান নাই বলিয়া শ্রী-মার হাতের বালা খোলা হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনে এবং অন্যস্থানেও তিনি ঠাকুরের দেখা ও তাঁহার আদেশ পাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন—"তুমি আমার দেহত্যাগ যা'

দেখেছিলে, সে দেহ মায়িক। এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি।" শ্রী-মা দেহরক্ষা (১) করার পর তাঁহার ভক্ত সেবক মাষ্টার মহাশয় (শ্রী-ম) তাঁহাকে দর্শন পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং মাকে বলিতে শুনিয়াছিলেন—"আমার কায়া গেছে, ছায়ার মত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

(৪)

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বলিতেন"—শ্রীশ্রী-মা শ্রীশ্রীঠাকুর হইতে অভিন্ন। ঠাকুর হইতে তাঁহার ভিন্নরূপ অস্তিত্ব কল্পিত হইতে পারে না। (২) তিনিও আজ সূক্ষ্মদেহে ভক্ত-হৃদয়বাসিনী……নরলীলায় অবলম্বিত স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধি দেহ পরিত্যক্ত হইলেও শ্রীভগবানের লীলা-বিগ্রহ বিনিষ্ট হয় না। সে চিন্ময় বিগ্রহ নিত্য-বৃন্দাবনে নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিয়া রাস-রসে বিভোর। ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি—লীলা ও সত্য।" আজ তাই আমরা জয়ধ্বনি করি শ্রীশ্রীঠাকুরও আছেন, শ্রীশ্রী-মাও আছেন। আমাদিগের জন্যই যে তাঁহারা আছেন, ইহা অপেক্ষা শুভ সমাচার আর কি হইতে পারে। যেখানে তাঁহাদের কীর্ত্তন হয় সেইখানেই তাঁহারা আছেন; শাস্ত্রেই আছে—"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

---

(১) শ্রীশ্রী-মা উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের নানাতীর্থাদি দর্শনের পর শত শত নরনারীকে শান্তির পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) বলিতে গেলে ইহা শ্রী-মারই মুখের কথা। তিনি বলিতেন—"ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখবে, আর যখন যে ভাবে দর্শন পাবে, সেই ভাবেই ধ্যান স্তুতি করবে।…ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট সব পাবে। উনিই সব।……ঠাকুর ব'লে গেছেন, এখানকার সকলকে তিনি শেষ দিনে দেখা দিবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।……(ঠাকুর) আমাকে (বলেছিলেন)—দেখো, এর পর ঘর ঘর আমার পূজো হবে। পরে দেখবে—একেই (ঠাকুরকেই) সবাই মানবে……।" কোন এক সময়ে "শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র রায় বর্ম্মনকে মা বলিয়াছিলেন, 'যে ঠাকুর, সেই মা—এই জেনে জপ ধ্যান করবে।"—শ্রীশ্রী-মায়ের কথা—উদ্বোধন কার্য্যালয় এবং শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

শুনিয়াছি শ্রীশ্রীঠাকুর আপনভাবে কখনও কখনও গাহিতেন,—

এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বল্‌ব কায়,
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়।
হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বল্‌তে নারি, কইতে নারি—নারী হওয়া একি দায়।

দেবকণ্ঠে এই গান গাহিতে গাহিতে তিনি শ্রী-মাকে বলিতেন—"শুধু কি আমারই দায়—তোমারও দায়।" "নিজে স্থূল দেহে লীলা সম্বরণ করিলে পাছে তদ্‌গত প্রাণা মা-ও দেহ-ত্যাগে অভিলাষিণী হন, সে জন্য ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন—'কল্‌কাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিল্‌বিল্ কর্‌ছে, তুমি তাদের দেখ্‌বে। আমি আর কি করেছি? তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী কর্‌তে হবে!" তথাপি ঠাকুর চলিয়া যাইবার পর মারও যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তখন ঠাকুর দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন—'না, তুমি থাকো, অনেক কাজ বাকী আছে।' শ্রীশ্রী-মা পরে বলিতেন—'শেষে দেখলুম, তাই-তো অনেক কাজ বাকী।'

সত্যই অনেক কাজ বাকী ছিল, সত্যই অনেক কাজ বাকী আছে—তাই শ্রীশ্রী-মা ও শ্রীশ্রীঠাকুররে আবার আসিতে হইবে। যাঁহারা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের' সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁহারাই জানেন,—ঠাকুর স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন—(১) "আর একবার আস্‌তে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না।" (২) "দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই।……জানি কিনা আর একবার আস্‌তে হ'বে (৩) "যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর যে কবে আসিবেন, কোথায় আবার আসিবেন সে কথা তিনিই জানেন। তবে তাঁহার আগমনের যে প্রয়োজন

হইয়াছে, দেশের দিকে চাহিলে তাহাই মনে হয়। পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীশ্রী-মার সঙ্গে স্বামী অরূপানন্দের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা এইরূপঃ—ভক্ত আশুতোষ রায় ঠাকুরের দেহরক্ষার অনেক দিন পর তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন—"রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া—পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, পায়ে খড়ম, হাতে চিম্‌টা।" ঠাকুরের এই বেশ সম্বন্ধে স্বামী অরূপানন্দ শ্রী-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, খড়ম-পায়ে চিম্‌টে হাতে কেন দেখ্‌লুম্?" মা কহিলেন—

"সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল-বেশে আস্‌বেন বলেছেন। বাউল বেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানি দাড়ি। বল্‌লেন, 'বর্দ্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব। পথে কাদের ছেলে হাগ্‌বে, হয়ত ভাঙ্গা কড়ায় রান্না হবে, ভাঙ্গা পাথর-বাসন হাতে, ঝুলি বগলে। যাচ্ছেন, তো যাচ্ছেন, খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন—কোন দিক্‌বিদিক্ খেয়ালও নাই।"

"বর্দ্ধমানের রাস্তা কেন?"

"ঐ দিকে দেশ।"

"তবে কি বাঙ্গালী?"

"হ্যাঁ বাঙ্গালী। আমি শুনে বল্‌লুম—ও কি গো, তোমার একি সাধ?"

তিনি হেসে বল্লেন, হ্যাঁ তোমার হাতে হুঁকো-কল্কে থাক্‌বে।"

"যখন বৃন্দাবনে যাই ছেলেরা (ভক্তবৃন্দ) সবাই রেল থেকে নেমে আগে চলেছে, পেছনে আমরা। গোলাপ জিনিষপত্র সকলকে নামিয়ে দিচ্ছিল। আমার হাতে লাটুর (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) হুঁকো-কল্কে দিয়েছে—ওরা ফেলে গেছে। লক্ষ্মী বল্‌ছে—এই তোমার হুঁকো-কল্কে ধরা হ'য়ে গেল। আমিও, ঠাকুর-ঠাকুর। এই আমার হুঁকো-

কম্বে ধরা হয়ে গেল—বলেই অমনি ফেলে দিয়েছি।" শ্রীশ্রী-মা এই সম্বন্ধে সময়ান্তরে বলিয়াছিলেন—'লক্ষ্মী বলেছিল, আমাকে তামাক-কাটা কর্‌লেও আর আস্‌ছি না।' তিনি (শ্রীঠাকুর) হেসে বল্‌লেন—আমি যদি আসি তো থাক্‌বি কোথা? প্রাণ টিক্‌বে না। কলমীর দল, এক জায়গায় ব'সে টান্‌লেই সব আস্‌বে।" সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রী-মার বাণী হইতেই জানা যায় যে, তাঁহারা আবার আসিবেন এবং বাঙ্গালা দেশকেই ধন্য করিবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর শ্রীশ্রী-মা কেন যে দীর্ঘদিন ছিলেন তাহারও কিছু আভাস পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব জীবনে সন্ন্যাস ভাব ছিল প্রধান। গৃহীর প্রতি তাঁহার কোনও বিরাগ ছিল না কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগ ছিল বেশী। শ্রী-মার পার্থিব জীবনে দেখা যায়, গার্হস্থ্যভাব ছিল প্রধান। সন্ন্যাসীর প্রতি বিরাগ ছিল না, কিন্তু গৃহীর প্রতি ছিল বিশেষ অনুরাগ। শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল আত্মীয়-স্বজনের সংসর্গের বাহিরে, আর শ্রী-মার জীবন ছিল তাঁহাদিগকেই বেষ্টন করিয়া; তাঁহাদিগের পরিচর্য্যাই ছিল তাঁহার একটি প্রধান ব্রত। শ্রীশ্রীঠাকুর মুদ্রা স্পর্শ করিতে পারিতেন না—এমন কি অজ্ঞাতে টাকা-পয়সা দেহে লাগিলেও হাত বাঁকিয়া যাইত —দেহে যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। কিন্তু শ্রী-মা অর্থ রক্ষা করিতেন, সেই অর্থে দেব-দ্বিজের পূজা, অতিথির সেবা, আর্ত্তের অভাবমোচন প্রভৃতি হইত। কোনা-কিছুর তিলমাত্র অপচয় হইতেছে, শ্রী-মা ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি পুরু করিয়া তরকারীর খোসা ছাড়াইলেও তিনি বিরক্ত হইতেন; বলিতেন, এমন ক'রে কি জিনিষের অপচয় করে।' ঠাকুর ছিলেন গৃহী-সন্ন্যাসী, আর মা ছিলেন গৃহিণী—ঠাকুর ছিলেন শিব, মা শিবানী ছিলেন না—তিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা'

ছিলেন জগদ্ধাত্রী—আর শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর চক্ষে তিনি ছিলেন বাঙ্গালার শারদীয়া প্রতিমা, স্বয়ং সিংহবাহিনী দুর্গা। কেহ তাঁহাতে শ্রীশ্রীশ্যামার মূর্ত্তি দেখিত, কেহ দেখিত মা যেন তাহারই গর্ভধারিণীর রূপে বিরাজ করিতেছেন। বিষ্ণুপুর রেল-ষ্টেশনের একটি পশ্চিমা কুলী একদিন দেখিল, মা তাহার আরাধ্যাদেবী শ্রীশ্রীজানকীর মূর্ত্তিতে ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম্মের উপর উপবিষ্টা! সে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"তু মেরী জান্‌কী, তুঝে ম্যায়নে কিত্‌নে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইত্‌নে রোজ তু কাঁহা থী।" মা তাহাকে শান্ত করিয়া কৃপা দান করিলেন। ভাবমুখে অবস্থান করিতে করিতে মা কখন-কখনও নিজেই বলিয়া উঠিতেন—"আমি ভগবতী,—ষষ্ঠী, মা কালী, শীতলা, মনসা—সেও আমি।" (১) একবার বিক্রমপুরের কাঁঠালতলীতে ৺বনদুর্গার বাড়ীতে বসিয়া একজন ভক্ত নিরন্তর "মা-মা" বলিয়া ডাকিতেন ও একটি চাকুরী প্রার্থনা করিতেন। একদিন তিনি দেখিলেন ত্রিশূলধারিণী গৈরিকপরিহিতা একটি যোগিনী মূর্ত্তি নিকটে আসিয়া তাঁহার দেহে হস্ত বুলাইয়া স্নেহ-মধুর স্বরে কহিলেন—'আর কাঁদিস্‌নি তোর চাক্‌রির যোগাড় হচ্ছে।' কিছুদিন পর ঢাকার বোর্ড-অব-রিভিনিউ অফিসে তাঁহার চাকুরি হইল। ক্রমে দশ বৎসর চলিয়া গেল একদিন তিনি শ্রী-মাকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখিলেন—ইনি যে সেই বনদুর্গা-বাড়ীর ত্রিশূলধারিণী যোগিনী!

(১) একদিন একজন ভক্ত শ্রী-মা'কে বলিয়াছিলেন—"মা তোমাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ কালী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী এসব বলেন। গীতায় আছে অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলেছিলেন, স্বয়ং তিনিও একথা অর্জ্জুনকে বলেছিলেন। এই স্ব ং বলায় ঐ কথায় আরও জোর হয়েছে। তোমার কথা যা' শুনেছি, তা' আমি বিশ্বাস কচ্ছি। তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তা'হলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তোমার নিজের মুখেই শুন্‌তে চাই ও কথা সত্য কি না।

মা কহিলেন—হাঁ, সত্য।" শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

গৃহিগণ শ্রী-মার জীবন-কথা হইতে যে যে বিষয় শিক্ষা করিতে পারেন—সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা হইতে ঠিক তাহা পারেন না। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ একদিন কতিপয় ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা দেখে তো এলে রাজরাজেশ্বরী সাধ ক'রে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজ্‌ছেন, চাল ঝাড়্‌ছেন—এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্য্যন্ত পরিষ্কার কর্‌ছেন। মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট কর্‌ছেন, গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য, অপরিসীম করুণা, সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য।"

"মার কাছে যে সকল স্ত্রীলোক থাক্‌তেন, তাঁরা সকল বর্ণের ভক্তের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে চাহিতেন না, এবং মাকে অনুযোগ ক'রে বল্‌তেন—তুমি বামনের মেয়ে—গুরু, ওরা তোমার শিষ্য। তুমি ওদের এঁটো পাড় কেন? এতে যে ওদের অকল্যাণ হবে।' তা'তে মা উত্তর দিতেন,—"আমি যে মা গো—মায়ে ছেলের কর্‌বে না ত, কে কর্‌বে?" তিনি বলিতেন,—সংসারে থাকিতে হইলে জাতি-বিচার মানিয়া চলিতে হয়; কিন্তু মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ যেখানে—গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেই হইবে। সেখানে তিনি ছিলেন মা—মার কাছে আবার পুত্রের জাতি-বিচার কি?

মা আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন—"পৃথিবীর মত সহ্য গুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে; মানুষেরও সেই রকম চাই।" দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী চলিতে না পারিলেই যে মানুষ দুঃখ পায় একথা তিনি নানা ভাবে বলিয়া গিয়াছেন—শুধু বলা নয়, নিজের আচরণেও দেখাইয়া গিয়াছেন। সমুদায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম শ্রীশ্রী-মার ও ঠাকুরের সেই একটি বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে—'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যাকে যেমন তাকে তেমন;

যখন যেমন, তখন তেমন।' ইহা অপেক্ষা অল্প কথায় গৃহধর্ম্মের তত্ত্ব প্রকাশ করা সম্ভব নহে। অনেকে আসিয়া শ্রীশ্রী-মার নিকট আপন আপন দুঃখ নিবেদন করিত। মা সময়ে সময়ে বলিতেন—"সকলেই বলে এ দুঃখ—ও দুঃখ—ভগবান্‌কে এত ডাক্‌লুম, তবু দুঃখ গেল না। কিন্তু দুঃখইত ভগবানের দয়ার দান।"

শ্রী-মা বলিতেন—"যার যা প্রাপ্য, তাকে তা দিতে হয়।" তাঁহার দ্বারে ভিখারী বিমুখ হইত না—ক্ষুধার্ত্ত শুষ্ক মুখে ফিরিত না—নিজে প্রতিবেশীর ঘরে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াও তিনি অতিথি-সৎকার করিতেন। লোক-শিক্ষাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য! সংসার যে বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র এবং সেই সংসারে থাকিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিয়া কর্ম্মবন্ধন খণ্ডন করাই যে গৃহীর প্রধান কর্ত্তব্য, শ্রীশ্রী-মার জীবনের প্রতিদিনের ঘটনাবলী আলেচনা করিলে আমরা ইহার অনেক প্রমাণ পাই—তাঁহার বাণীও আমাদিগকে সেই শিক্ষাই দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই বাণী—'যার আছে সে মাপো (অর্থাৎ সৎকাজে ব্যয় কর) আর যার নাই সে জপো (অর্থাৎ ভগবানের নাম জপ কর)' —শ্রী-মার মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত। সাধনা করিলে গৃহস্থও যে ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন, শ্রীশ্রীঠাকুর একথা বার বার বলিয়া গিয়াছেন এবং শ্রী-মা তাহাই হাতে-কলমে দেখাইয়াছেন। শ্রীশ্রী-মার মধ্যে দুইটি ভাব ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—একটি মাতৃভাব, অপরটি গুরুভাব। গুরুভাবকে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন—কিন্তু মাতৃভাব বিকশিত হইয়াছিল সদ্যোস্ফুটিত কমলের মত। প্রতি কথায়, প্রতি কাজে সে ভাব প্রকাশ পাইত। জনৈক ভক্ত একদিন কথা-প্রসঙ্গে শ্রী-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর আপনি যেমন সংসারে থেকে লোককে শিক্ষা

দীক্ষা দিচ্ছেন. আর আর অবতারে ত তাঁদের শক্তিরা এরূপ কাজ করেছেন ব'লে শোনা যায় না; আর আর অবতারে কেবল তাঁদের পার্ষদ ভক্তেরাই লোকশিক্ষা দিয়েছেন। এবার এই নূতনত্বের কারণ কি?" মা উত্তর দিলেন—"বাবা জানতো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখ্‌তেন; সেই মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্য এবার আমাকে রেখে গেছেন।" (১)

"জগৎকারণকে মা বলিয়া ডাকা এবং সকলের ভিতর সেই মাতৃ-রূপিণীকে দেখা এই যুগের বিশিষ্ট আদর্শ।" ঠাকুর তাঁহার নিজ জীবনে সেই পরম আদর্শটী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শ যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয় সেইজন্য তিনি মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে অপ্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী-মার এই মাতৃভাব ভারতের সীমা ছাড়াইয়া ইউরোপ ও আমেরিকাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে।

---

(১) একদিন কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেছিলেন? মা উত্তর দিলেন—"হাঁ বাবা"।

শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ রক্ষার পর তিনি অনেকবার শ্রী-মাকে দর্শন দিয়াছেন। . শ্রীবৃন্দাবনে "ঘন ঘন দর্শন দিয়া ঠাকুর তাহাকে আনন্দে ভরপুর করিয়া" রাখিতেন। শ্রীশ্রী-মার জীবন কাহিনী (শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য) পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রী-মাও নানা সময়ে এবং নানা অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে কোন কোন ভক্তকে দেখা দিতেন এবং ভক্তগণ নিবেদন না করিলেও তিনি [illegible]দের মনের কথা জানিতে পারিয়া, যখন প্রয়োজন মনে করিতেন তখনই তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর চক্ষে শ্রী-মা ছিলেন এবং এখনও আছেন সাক্ষাৎ জগদম্বা স্বরূপ। মার পূজা করিলেই তাঁহারা মনে করেন শ্রীশ্রীদুর্গার পূজা করা হইল। ভক্ত শিষ্যা যুবতি "শ্রীশ্রীমাকে চণ্ডীজ্ঞানে পূজা করা ও লাল পেড়ে সাড়ী দেওয়া স্বপ্নে দেখেছে। তাই বেবে ব'লে নিয়ে এসে লজ্জায় মাকে বলতে পারছে না; বলছে, 'দিদি, তুমি বল।' আমি ঐ কথা মাকে বলতেই মা হেসে বল্লেন—জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন, কি বল মা। দাও, সাড়ীখানি ত পরতে হবে।" চওড়া লালপেড়ে সাড়ীখানি মা পরলেন, কি চমৎকার দেখাতে লাগল। মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রৈলুম—চোখে জল এল।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

ভক্তের মা হইয়াছিলেন শেষে বিশ্বের মা। সন্ন্যাসী-ভক্তদিগের সন্ন্যাস কালে প্রাপ্ত নাম ধরিয়া ডাকিতে তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিত! তিনি বলিতেন—'আমি যে মা।' তাই তিনি তাহাদিগের সংসারাশ্রমের নাম ধরিয়া ডাকিতেন; এত স্নেহ ছিল তাঁর—কিন্তু তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য—অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসিনী। সকলের মধ্যে তিনি নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, নিজের মধ্যে কাহাকেও টানেন নাই—তাই তিনি ছিলেন ঈশ্বরের ঈশ্বরী, মহেশের ঘরণী। মার মত পত্নীতেই এই যুগে শিবের বিবাহের গুহ্য অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন গোলাপ-মাকে বলিয়াছিলেন—"ও সারদা—সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাক্‌লে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"

মা যখন গুরু হইয়াছিলেন তখনও তিনি ছিলেন মা। কোন ভক্তের দুশ্চরিতের কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি গুরুর মত তীক্ষ্ণ হইতেন না, মার মতই কহিতেন—"কি হয়েছে তার? আমার ছেলের একটি ছেড়ে পঁচিশটা কর্‌লেও কিছু হবে না—ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।" এমন কথাও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাহির হইয়াছে—"কলিতে অনেক লোক সন্ন্যাসী হইবে। নাচিয়া গাহিয়া তাহারা নরকে যাইবে।" তিনি বাহ্য-সন্ন্যাস অপেক্ষা অন্তঃসন্ন্যাসের প্রশংসা করিতেন, কারণ "বাহিরের ভেক সাধুত্বের অভিমান জাগ্রত রাখিয়া অনেকের পক্ষে উল্টা বন্ধনের কারণ হয়।" ভক্তদিগকে অসীম ভরসা দিয়া মা বলিতেন—"মনের বাসনা-কামনাগুলো মিটিয়ে ফেল; পরে তো ঠাকুরই আছেন। শেষে ঠাকুরকে আস্‌তেই হবে তোমাদের নিতে।" শ্রীশ্রীঠাকুরও যেমন শত সহস্র নরনারীর পাপ নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন, শ্রী-মাও ঠিক সেইরূপই করিতেন, বলিতেন,—"দয়ার মন্ত্র

দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কি লাভ! মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক্।" "বাবা কি বল্‌বো, এমন সব লোক আসে, যারা না করেছে এমন কাজটি নাই। আমায় এসে মা ব'লে ডাকে, আমি ভুলে যাই—যে যার যোগ্য নয়, তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাত দিলে যেন বোল্‌তায় কামড়ায়!···ভাল ছেলের মা-তো সকলেই হ'তে পারে, মন্দটিকে কে নেয়?" (১) দীক্ষা দিয়া মা সন্তানকে কহিতেন—"বল, আমি জন্ম জন্মান্তরে যা' কিছু পাপ করেছি সব তোমায় অর্পণ কর্‌লুম!" ভক্তের জন্য ইহাই ছিল তাঁহার দক্ষিণা-বাক্য! এইরূপ না হইলে কি মা? (২) কখনও বা কাহাকেও বলিতেন—

---

(১) শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

(২) শ্রীশ্রী-মার অহেতুক কৃপা যে কিরূপ ছিল তাহার আর একটু পরিচয় দিতেছি। একজন শিষ্য একদিন কহিলেন—'মা সাধন-ভজন কিছু হ'য়ে উঠ্‌ছে না।' মা বলিলেন—'তোমাকে কিছু কর্‌তে হ'বে না, যা' কর্‌তে হয় আমি কর্‌বো।' বিস্মিত হইয়া শিষ্য বলিলেন—'তবে এখন হ'তে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি আমার নিজকৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না?' মা উত্তর দিলেন—'তুমি কি কর্‌বে? যা' কর্‌তে হয় আমি করবো'······তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না। তোমার জন্য আমিই কর্‌ছি।······(যেখানে যত সন্তান আছে) সকলের জন্যই আমায় কর্‌তে হয়।.. .. যার যার নাম মনে আসে তাদের জন্য জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই ব'লে প্রার্থনা করি—ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক যায়গায় রয়েছে যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয় তাই করো।"—শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

—"একটি সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা কর্ম্মবিপাকে দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণা হ'য়ে পড়েন.....একদিন কোন সাধুর [illegible]ড়ে সদুপদেশ পেয়ে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রম বুঝ্‌তে পেরে বিশেষ অনুতপ্তা হন এবং সেই সাধুর [illegible] একদিন বাগবাজারের বাটিতে শ্রীশ্রী-মায়ের চরণপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন; ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ কর্‌তে সঙ্কুচিতা হ'য়ে, দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তিনি নিজের সমস্ত পাপের কথা মায়ের কাছে ব্যক্ত ক'রে বল্‌লেন—'মা আমার উপায় কি হবে?...···শ্রীশ্রী-মা তখন অগ্রসর হ'য়ে নিজের পবিত্র বাহু দ্বারা মহিলাটির গলদেশ বেষ্টন ক'রে ধ'রে, সস্নেহে বল্‌লেন—'এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝ্‌তে পেরেছ—অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ ক'রে দাও—ভয় কি?.. ···কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন!"—(শ্রীশ্রীমায়ের কথা।)

"ঠাকুরের কছে এই ব'লে প্রার্থনা কর—আমার পূর্ব্ব জন্মের, ইহ জন্মের কুকর্ম্মের ভার তুমি নাও।" শ্রীশ্রীঠাকুরের মত মা-ও ছিলেন গুরু কিন্তু সর্ব্বদা সকলকে ঠাকুরের উপরই নির্ভর করিতে বলিতেন। বলিতেন—ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা কর্‌বে। প্রাণের ব্যথা কেঁদে বল্‌বে।"

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে,
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্‌॥ (১)

(৫)

শ্রীশ্রী-মা যখন গুরু হইয়াছেন এবং বহু নর-নারী তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া এ জন্মে শান্তি ও পরজন্ম সম্বন্ধে ভয়শূন্য হইয়াছেন, তখন একদিন কোনও ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন—"মা, ঠাকুরের কাছে যারা যেত, তাদের কত ভাব, সমাধি এ সব হ'ত; আপনি ত আমাদের সে রকমটি কর্‌ছেন না।' মা বলিলেন,—'ঠাকুর করেছিলেন, সে আর ক'টির? (হাতে গণিবার মত করিয়া দেখাইয়া) হাতে গোণা যায়। তাতেই তাঁর শরীর এত শীগ্‌গির গেল! আমি যদি অমনটি করি, তবে ক'দিন এ শরীর থাক্‌বে? আমার কত ছেলেকে দেখ্‌তে হচ্ছে!" (২) যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুরের অপেক্ষা শ্রী-মার মন্ত্র শিষ্য-সংখ্যা যে অনেক বেশী তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ঠাকুর নিজেই মাকে বলিয়া

(১) শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।
(২) শ্রীশ্রীসারদা দেবী— ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

গিয়াছিলেন যে, অনেক "বাকি কাজ" শেষ করিবার জন্য তিনি মাকে রাখিয়া যাইতেছেন। সেই বাকি কাজটি ছিল, পাপী-পুণ্যবান্ নির্ব্বিশেষে কৃপাপ্রদান। "নিজে অসীম-শক্তিময়ী এবং সহনশীলতার প্রতিমূর্ত্তি হইলেও, নবদেহধারিণী শ্রীশ্রী-মা নিত্য বহুলোকের পাপ-জ্বালার সংসর্গে আসিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় শেষ কালে এক এক সময়ে যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া না পড়িতেন এমন নহে।······মা একদিন বলিয়াছিলেম,—'এ শবীর আর রয় না। এক একদিন ঠাকুরকে বলি,—আর কেন? সেদিন এক পাল এনে হাজির করেন!" (১)

ভক্তদিগের কথা উঠিলেই শ্রী-মা বলিতেন—"শরৎ আর যোগীন্—এ দু'টি আমার অন্তরঙ্গ।" (২) যোগীন্ বা স্বামী যোগানন্দের পিতা নবীনচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের অন্যতম বনিয়াদি ধনাঢ্য জমীদার ছিলেন এবং সেখানেই বাস করিতেন। নবীনচন্দ্র সেকালে একজন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাধনার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া "ভারত ভাগবতাদি পাঠ শুনিতেন। যোগীন্দ্র যখন কিশোর মাত্র তখনই তাঁহার ধীরতা, বিনয়-মধুর প্রকৃতি সকলকে আকর্ষণ করিত। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালে তাঁহার সর্ব্বদা মনে হইত, তিনি পৃথিবীর লোক নহেন, এখানে তাঁহার আবাস নহে' অতি দূরের

---

(১) শ্রীশ্রীসারদা দেবী, শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রী-মার মত শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজও ভক্তদিগের পাপ গ্রহণ করিয়া নানা সময়ে নানা ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করিতেন। ব্রহ্মচারী রামানন্দ একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা! আপনার পায়ে ঘা হলো কেন?" শ্রীশ্রীস্বামীজি বলিলেন—"বেটা! গৃহস্থগণ কত প্রকার বাসনা কামনা নিয়ে আমাকে প্রণাম করে, পায়ের উপর টাকা দেয়—নিষ্কামভাবে দান ক'জন করে? সেই সব কামনা-বাসনা-মূলক দান গ্রহণ করলে পাপ হয়—তার ফলেই আমার পায়ে এই ব্যাধি। বেটা! দান যত কম গ্রহণ করা যায় ততই ভাল—শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত—স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি—শিবম্, ফাল্গুন, ১০৩৬।

(২) শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

স্বামী যোগানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়ের সৌজন্যে]

[বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু ২য় খণ্ড

কোন নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁহার যথার্থ আবাস এবং সেখানেই—তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত সঙ্গী-সকল······রহিয়াছে। আমরা (স্বামী সারদানন্দ) তাঁহাকে কখন ক্রোধ করিতে দেখি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, ‘আমাদিগের ভিতর যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে কামজিৎ থাকে ত সে যোগীন্।······দক্ষিণেশ্বরে বস-বাস থাকায় যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে যোগীন্ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলেন।······যে ছয় জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বর-কোটি বলিয়া জগদম্বার কৃপায় তিনি (ঠাকুর) পরে জানিতে পারিয়াছিলেন’ স্বামী যোগানন্দ ছিলেন তাঁহাদিগের অন্যতম। (১)

নিজের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাতার নয়নাশ্রু উপেক্ষা করিতে না পারিয়া যোগীন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে হইল। তিনি বলিতেন “বিবাহ করিয়াই মনে হইল, ঈশ্বরলাভের আশা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র; যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, তাঁহার কাছে আর কিসের জন্য যাইব; এখন যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল।” (২) যোগীন্দ্রনাথ কিছু দিন পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। ভক্তের অদর্শনে ঠাকুর ক্রমেই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন কৌশলে যোগীন্দ্রনাথকে নিকটে আনাইয়া কহিলেন—“বিবাহ করিয়াছিস্ তাহাতে ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখ্টা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; যদি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস্ তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস্—তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব।” (৩)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২) ঐ

(৩) ঐ

এই ঘটনার কিছুকাল পর হইতে অন্তঃসন্ন্যাসী যোগীন্দ্রনাথ শ্রীমন্দিরে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় দিনপাত করিতে লাগিলেন—তাঁহার মাতা, পত্নী, সংসার স্থানান্তরে পড়িয়া রহিল—যোগীন্দ্রের মনে আর তাঁহাদিগের স্থান রহিল না, যোগীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেবা করিয়া গৃহে ফিরিতেন, কিন্তু মনে জানিতেন বনে আসিলেন! এক দিন নানা ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি অধিক হইয়া গেল বলিয়া তিনি ঠাকুরের গৃহমধ্যেই শয়ন করিলেন। গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন,—ঠাকুর আপন শয্যায় নাই! গৃহের দ্বার খোলা! গাড়ু প্রভৃতি জল-পাত্রও ত যথাস্থানেই আছে! সহসা যোগীন্দ্রনাথেব মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—ঠাকুর কি তবে নিজ পত্নীর নিকটে নহবতে শয়ন করিতে গিয়াছেন?—"তবে কি তিনিও মুখে যাহা বলেন, কার্য্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন?" যোগীন্দ্রনাথ গৃহের বাহির হইয়া সন্দিগ্ধনয়নে নহবতের দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

যোগীন্দ্রনাথ বলিতেন—"কিছুকাল ঐরূপ করিতে না করিতে পঞ্চবটীর দিক্ হইতে চটী জুতার চট্ চট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং অবিলম্বে ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"কিরে তুই এখানে দাঁড়াইয়া আছিস্ যে?" অন্তর্যামী ঠাকুরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যোগীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন! কিন্তু ভক্তের অপরাধ গ্রহণ না করিয়া তিনি প্রসন্নবদনে কহিলেন—"বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখ্‌বি, রাত্রে দেখ্‌বি তবে বিশ্বাস কর্‌বি।" স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন—"গুরুপদে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাঁহার এবং তাঁহার অন্তর্ধানে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর সেবাতে প্রাণপাত করিয়া স্বামী যোগানন্দ পরজীবনে পূর্ব্বোক্ত অপরাধের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় তীব্র-বৈরাগ্য-

সম্পন্ন, জ্ঞান ও ভক্তির সমভাবে অধিকারী সমাধিবান্ যোগীপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।"(১)

"৺কাশীক্ষেত্রে অতি কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে…তাঁহার (স্বামী যোগানন্দের) শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যোগানন্দ মহারাজ মার অন্তরের বস্তু ছিলেন। তাঁহার অসুখ বাড়িতেছে দেখিলে মা বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেন, আবার তিনি একটু ভাল আছেন দেখিলে নিজেকেও ভাল বোধ করিতেন! তাঁহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মার শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শরীর যাইতে (১৫ই মাঘ, ১৩০৫ সাল) মা বলিয়াছিলেন,—বাড়ীর একখানা ইঁট খস্‌ল, এবার সব যাবে।"

"স্বামী যোগানন্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি শ্রীশ্রী-মা বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন—

যোগীনের মত আমাকে কেউ ভালবাস্‌ত না। আমার যোগীন্‌কে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত, সে রেখে দিত। মা তীর্থে-টীর্থে যাবেন, তখন খরচ কর্‌বেন। সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে ব'সে থাকৃত।… যোগীন্ দু' আনা, চার আনা, আট আনা ক'রে দ'শ টাকা আমার জন্য জমিয়েছিল।……যোগীন্ যখন দেহ রাখ্‌লে, নির্ব্বাণ চাইলে। গিরিশ-বাবু (নাট্য সম্রাট্) বল্‌লেন—ছ্যাখ্ যোগীন্, নির্ব্বাণ নিস্‌নি। ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে; চন্দ্র সূর্য্য তাঁর চক্ষু—অত বড় ভাবিস্ নি। যেমন ঠাকুরটি ছিলেন, তেমনটি ভেবে ভেবে তাঁর কাছে চ'লে যা।…… যোগীন্ যখন দেহ রাখ্‌লে সে বল্‌লে—মা আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর"(২)

সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল যথাশক্তি শ্রীশ্রী-মার সেবা করিয়া ঈশ্বরকোটি

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।
(২) শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

মহাপুরুষ স্বামী যোগানন্দ রক্তামাশয় ও জ্বরে কাতর হইয়া ১৩০৫ সালের ১৫ই মাঘ যে দিন দেহরক্ষা করিলেন সেদিন শ্রীশ্রী-মার হৃদয়ে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহার পর প্রায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত স্বামী যোগানন্দের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত।

স্বামী যোগানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রস্থান করিতেই সেবকের সেই শূন্য স্থান গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক বিংশ বর্ষ যিনি নিজেকে শ্রীশ্রী-মার চরণতলে অর্ঘ্যের ন্যায় রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মাতাঠাকুরাণীর দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বা সন্ন্যাস-জীবনে পবিত্র মাতৃনামে চিহ্নিত ভক্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন—"তোর ভৈরবের ভাব। তোর ভিতর শিব আছে জান্‌বি, আর আমার মধ্যে শক্তি আছে। তোর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য আমার মধ্যে বিদ্যমান।" তাঁহার ভিতরের এই প্রচ্ছন্ন ভৈরবই বোধ হয় তাঁহার দ্বারা "ভারতে শক্তিপূজা" নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করাইয়া একাল এবং অনাগত কালের জন্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুরুর মত স্বামী সারদানন্দও জগতের নারীমূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীমহাকালীর শক্তিকেই বিকসিত দেখিতেন,—উহা ছিল তাঁহার নিত্য উপলব্ধির বস্তু, মুখের একটা কথা মাত্র নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীর শ্রীশ্রীজগদম্বা সারদা দেবীও তাই অনায়াসে এই শক্তি-ভক্তের স্বরূপ বুঝিয়া বলিয়াছিলেন— "শরৎ আর যোগীন্—এ দু'টি আমার অন্তরঙ্গ……শরৎ যে ক'দিন আছে, সে কদিন আমার ওখানে (কলিকাতায়) থাকা চল্‌বে; তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে—দেখি না।…শরৎ হচ্চে আমার ভারী।"

যাঁহারা মনে করেন দিনান্তে সামান্য হবিষ্যান্ন এবং বৎসরান্তে কয়েক

খানি বসন মাত্রেই যে হিন্দু-বিধবার একমাত্র প্রয়োজন ছিল তাঁহার "ভারী" হওয়ার গৌরব এতই কি বেশী—তাঁহাদিগকে বলি, শ্রীশ্রীমার এই "অন্তরঙ্গ" দুইটি যে শুধু—তাহারই ভার লইয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহারা ভার লইয়াছিলেন শ্রীশ্রী-মার, মার আত্মীয় পরিজনদিগের এবং প্রতিদিন জলস্রোতের মত যে জনস্রোত তাঁহার চরণধুলি লইয়া সফলকাম হইবার জন্য কখনও বা জয়রামবাটীতে এবং কখনও বা কলিকাতায় মাতৃ-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত, অন্তরঙ্গগণ ইঁহাদের সকলেরই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইঁহাদের সেবা, পরিচর্য্যা, মার নিকট দীক্ষাদি গ্রহণের সুযোগদান, মাতৃচরণে অর্ঘ্যপ্রদান প্রভৃতি সকল বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া, শ্রীশ্রী-মার এই অপূর্ব্ব সেবক দুইটি মৌনসেবাব্রতের প্রাণবন্ত প্রতীকরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই বলিয়াই গৌরব করিতেন যে,—"আমি মার দারোয়ান" এবং শ্রীশ্রী-মার প্রীতির জন্যই সেই দারোয়ানির সর্ব্ব কর্ত্তব্য দিনের পর দিন প্রতিপালিত হইত। শুনিতে পাই মার কথা বলিতে বলিতে মহারাজ এক একদিন তন্ময় হইয়া বলিতেন—"মাকে কি বুঝ্‌ব, তবে একথা বলতে পারি—এতবড় মন দেখিনি, আর্ দেখ্‌বও না", কোন দিন বা এই ভাবে ভাবিত হইয়া মাতৃচরণে উৎসৃষ্ট-হৃদয়ের আবেগভরে তিনি গাহিয়া উঠিতেন—

তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব, তাই ব'সে ভাবিতেছি॥
বিচিত্র ভাবের মেলা,
ভাঙ্গা গড় দু'টি বেলা
ঠিক যেন ছেলে-খেলা, বুঝ্‌তে পেরেছি॥

এতকাল রইলাম কাছে,
বেড়াইলাম পাছে পাছে—
চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি ॥

১৮৬৬ সালের পৌষ মাসে কলিকাতায় শ্রীযুত শরৎ চন্দ্রের জন্ম হয় প্রথমে এলবার্ট স্কুলে, পরে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে পাঠ সাঙ্গ করিয় তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে যখ তাঁহার বয়স আনুমানিক বিংশ বর্ষ তখন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সহিত পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হইতেই সংসারের প্রতি অনুরাগ দূর হইতে থাকে। যখন উৎকট গলরোগে পীড়িত হইয়া ঠাকুর কাশীপুর-উদ্যানে বাস করিতে-ছিলেন শরৎচন্দ্র তখন সর্ব্বদাই তাঁহার সেবা করিতেন। একদিন এই কাশীপুরেই ভক্ত মণিলালের সহিত কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছিলেন— "যখন যেরূপ লোক আসবে আগে (মা) দেখিয়ে দিত। এই চক্ষে— ভাবে না !—দেখ্‌লাম, চৈতন্য দেবের সঙ্কীর্ত্তন—বটতলা থেকে বকুল তলার দিকে যাচ্চে। তাতে বলরামকে দেখ্‌লাম, আর যেন তোমায় দেখ্‌লাম ।……শশীকে আর শরৎকে দেখেছিলাম, ঋষিকৃষ্ণের (যীশু-খৃষ্টের) দলে ছিল।" (১)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-রক্ষার পর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন,—কোথায় যাইবেন, কি করিবেন অনেকেই তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। ঠাকুর তাঁহাদিগকে গৈরিক দান করিয়াছিলেন সত্য, এবং মাধুকরী করিতেও অভ্যস্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহারা যে সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন এরূপ কোনও বিশেষ আদেশ ছিল না। অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে অনেকেই প্রথমে

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শরৎচন্দ্রও বেদনাকাতর-হৃদয়ে গৃহে আসিলেন এবং স্থির করিলেন, পুনরায় মেডিকেল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিবেন। যাহা হউক, কিছুকাল পর নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) গুরুভ্রাতাদিগকে সম্মিলিত করিলেন এবং বরাহনগর-মঠ স্থাপিত হইল। শরৎচন্দ্র তদবধি মঠেই বাস করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে গৃহে গিয়া পিতা-মাতাকে দেখিয়া আসিতেন।

প্রথমে বরাহনগর-মঠে এবং পরে আলমবাজার-মঠে অবস্থানকালে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন তাহা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। দেখা যাইত এই সময়ে শরৎচন্দ্র—তাঁহাকে এখন হইতে শরৎ-মহারাজ নামেই অভিহিত করিব—দিবা রাত্রি জপে ও ধ্যানেই নিযুক্ত থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রাণের আবেগে আকুল হইয়া রোদন করিয়া উঠিতেন। সে করুণ রোদনধ্বনি শুনিলে পাষাণও গলিয়া যাইত। কখনও বা বলিতেন—"তাইত জীবনটা কি হ'ল। চোখের উপর এই অদ্ভুত আদর্শ দেখ্‌লাম, যাঁর আশ্রয়ে এলুম তিনিও ত চ'লে গেলেন, কিছুইত কুল-কিনারা পাচ্ছিনা,—বাড়ী-ঘর ছাড়া, আর ভিক্ষে ক'রে খাওয়া, এইত হয়েছে সার। জীবনটা কি এই ক'রেই যাবে!" আকুল হইয়া শরৎ-মহারাজ গাহিয়া উঠিতেন—

মায় গুলাম্, মায় গুলাম্,
মায় গুলাম্ তেরি।
তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান্,
তু দেওয়ান্ মেরি॥
তু দেওয়ান্, মেহেরবান্,
নাম তেরা মীয়া।
দো রোটী, এক ল্যাঙ্গোটি
মাঙ্গে কবিয়া॥

প্রথমে মৃদুকণ্ঠে গান আরম্ভ হইল—ক্রমে উচ্চে, উচ্চে—আরও উচ্চে সুর উঠিতে লাগিল—শেষে অবরুদ্ধ অশ্রুধারা আর বাধা মানিল না, নয়নের পথে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঝরিতে লাগিল। "তখন গলার আওয়াজ বেশ চড়া হইয়াছে, অনবরত কাঁদিতেছেন আর চোখে জল গড়াইতেছে—যাকে চলিত কথায় বলে ডুক্‌রে কাঁদা। ঠিক সেইভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন করুণস্বরে কান্না সুরু করিলেন যে, শুনিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল।" (১)

* * * *

ভিক্ষা করিয়া সংগৃহীত চাউলের সঙ্গে তেলাকুঁচার পাতা সিদ্ধ করিয়া লবণ ও লঙ্কা সহযোগে তাহাই ভোজন এবং নিরন্তর জপ-ধ্যান করাই ছিল বরাহনগর-মঠের সন্ন্যাসিদিগের একমাত্র কার্য্য। দেখা যাইত সন্ন্যাসিগণ তখন দেহে বিভিন্ন হইলেও প্রাণে এক হইয়াছেন এবং সকলেই নরেন্দ্রনাথকে অবিসংবাদী নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যে মৌন সেবাব্রত শরৎ মহারাজকে দেবত্ব দান করিয়া তাঁহারই জীবনাদর্শে গঠিত রামকৃষ্ণ মিশন্‌কেও নর-নারায়ণের সেবায় গৌরবের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—বরাহনগর এবং আলমবাজার মঠে বাসকালেই মহারাজের দৈনন্দিন জীবনে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট হইত। "বাল্যকাল হইতেই এই সেবাপরায়ণতা তাঁহার মজ্জাগত ছিল। গুরু-ভ্রাতাগণের হাতের কাজ ছিনাইয়া লইয়া নিজে একাকী সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে এবং রোগ-শয্যায় তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া প্রাণ-ঢালা শুশ্রূষায় তাঁহাদিগকে নিরাময় করিতে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার স্নেহাকুল হৃদয়ের আবেগমাখা কোমল হস্তস্পর্শ রোগীর মনে

(১) ৺স্বামী সারদানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবর্ত্তক, ভাদ্র—১৩৩৪।

যাদুমন্ত্রের মত কার্য্যকরী হইত; এবং আশায় উৎফুল্ল হইয়া রোগী সহজেই সুস্থ হইয়া উঠিত।" (১) আলমবাজারের মঠে থাকিবার সময় শরৎ-মহারাজ সর্ব্বদাই বলিতেন—"ভগবান্ ত পাওয়া গেল না। লাভের মধ্যে হ'ল—এই বাড়ী-ঘর-দোর ছাড়া, আর এর বাড়ী—ওর বাড়ী ভিক্ষা ক'রে খাওয়া—এ-কূলও গেল, ও-কূলও গেল—এ ব্যর্থ জীবন রেখে আর কি হ'বে; যাক্ যতদিন না দেহটি যায়, সকলের সেবা ক'রে ক'রে বেড়াব—এতেও লোকের কিছু উপকার হ'তে পারবে, কারও কিছুমাত্র সেবা করতে পার্‌ব ত!" (২)

"একবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এক ভাইয়ের বসন্ত রোগ হয়, তিনি কাঁসারিপাড়ার কোন এক স্থানে থাকিতেন।......শরৎ-মহারাজ রোগীর শুশ্রূষা করিতে রাজী হইলেন। তখন তাঁহার ডান হাতের প্রথম আঙ্গুলটি অর্থাৎ বুড়া-আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলটি কাটিয়া গিয়া একটু ঘা হইয়াছিল। তিনি বেশ জানিতেন যে, ক্ষতস্থানে যদি বসন্তের বিষ লাগে, তাহা হইলে আর অব্যাহতি নাই।......তিনি......ঘায়ের জায়গাতে ন্যাকড়া জড়াইয়া একটা সূতা বাঁধিলেন, আর বাকী ক'টা আঙ্গুল দিয়া রোগীর গায়ে ঔষধ মালিশ করা, হাত বুলানো এই রকম করিতে লাগিলেন।......গিরিশ বাবু (নাট্য-সম্রাট্) এই সময়ে খবর পাইয়া বলিলেন—'ওরে শরতের কি মহত্ব দেখ্‌লি?......(ওকে) জানি হোঁত্‌কা ব'লে—কুঁদো শরীর, বোকা—হাবা......(ওর) ভেতর যে এত মহত্ব আছে এটা জান্‌তুম না রে।......শরৎ যে প্রাণের আশা ত্যাগ ক'রে সেবা করতে গেল, এটা কি আশ্চর্য্য বল্ দেখি।'......এই সেবা-

(১) স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য। উদ্বোধন—ভাদ্র, ১৩৩৭।

(২) ৺স্বামী সারদানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু। প্রবর্ত্তক-ভাদ্র, ১৩৩৪।

ভাবটাই পরে রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবাধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।" (১) শ্রীশ্রী-মা একবার প্রীতিপ্রসন্নকণ্ঠে বলিয়াছিলেন--"ব্রহ্মজ্ঞ অনেক আছেন,—শরতের মত এমন হৃদয়বান্ দিল্-দরিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই, সমস্ত পৃথিবীতে নাই।" শ্রীশ্রীমৎ সারদানন্দ বা শরৎ-মহারাজের হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে শ্রীশ্রী-মার এই একটি উক্তিই যথেষ্ট—উহার পর আর কিছু বলিবার থাকে না।

য়ুরোপের কোন রুধিরাক্ত সমরক্ষেত্রে শত্রুর নিদারুণ আঘাতে মৃত-প্রায় বীর সেনাপতি একদিন জলপূর্ণ পানপাত্রটি নিজের তৃষা-দগ্ধ ওষ্ঠের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী মরণোন্মুখ সৈনিককে দিয়া বলিয়াছিলেন—'পান কর, পান কর—আমার চেয়ে তোমার দরকার বেশী।' এই অপূর্ব্ব মহত্ত্বের বিবরণ যখনই আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখি তখনই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই—ভাবি, সেই দেশই ধন্য যে দেশে এমন মহাপুরুষ জন্ম লাভ করেন। তখন আমাদের মনে হয় না যে, জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশও এইরূপ মহতের চরণরেণুস্পর্শে একদিন পবিত্র হইয়াছিল। শরৎ-মহারাজ ছিলেন সেইরূপ একটি মহাপুরুষ যিনি একদিন নিজের শেষ সম্বলটি প্রসন্নচিত্তে অপরকে দান করিয়াছিলেন—"নিজের দেহ ও নিজের প্রাণের কোন মমতা" রাখেন নাই। (২)

---

(১) ৺স্বামী সারদানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবর্ত্তক—ভাদ্র, ১৩৩৪।

(২) "বরাহনগর-মঠ হইতে শরৎ-মহারাজ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া গেলেন। হিমালয় পাহাড়ের নানা স্থানে [illegible] করিতে লাগিলেন।" নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াও যখন ভগবদ্দর্শন ঘটিল না তখন তিনি "স্থির [illegible] অনাহারে দেহটা শুকাইয়া নাশ করিবেন।......তিনি চলতি পথ ছাড়িয়া দিলেন এবং যে দিকে চোখ যায় সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।......শরৎ মহারাজের দু' দিন কোন আহার জুটে নাই,—অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, সম্মুখের একটা উঁচু পাহাড় থেকে নীচে পড়িবেন, তখন দেহ চূর্ণ হইয়া যাইবে।......তিনি সেই উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন কিন্তু নীচে পড়িয়া দেহত্যাগ করা ঘটিল না, একজন তপস্বী উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন। সেই সাধুর অতিথি হইয়া তিনি "আড়াই দিন" পরে "কাঁপড়ার আটার রুটি" ও "বিচুটি পাতার" ঝোল গলাধঃকরণ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর হইতে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) প্রায় দশ-এগারো বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ও কঠোর তপস্বীরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সে সাধনার বিবরণ তিনি নিজে কখনও প্রকাশ করেন নাই বলিয়া উহা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি যে শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন ইহাতে সংশয় করিবার কারণ নাই। (১)

নিয়ম-নিষ্ঠার অভাবে আজ বাঙ্গালাদেশ ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইতে চলিয়াছে; নিয়ম ভঙ্গ এবং নেতৃস্থানীয়দিগের আদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন বর্ত্তমান যুগে যেমন বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় জীবনের কলঙ্ক, তেমনি উহা বাঙ্গালার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেরও কলঙ্করূপে দেখা দিয়াছে।

"অনেক দিন পাহাড়ে থাকিয়া এবং অনিশ্চিত এবং নানাপ্রকার জিনিস আহার করিয়া শরৎ-মহারাজের আমাশয় হইয়া গেল।... বড় কৃশ হইয়া গেলেন। হাত পায়ের আর জোর নাই। হাতে একটি লাঠি, কাঁধে কম্বল আর অপর হাতে একটি কমণ্ডলু—এই লইয়া তিনি ধীরে ধীরে দুর্ব্বল শরীরে (পাহাড় হইতে) নামিতে সুরু করিলেন। একবার করিয়া লাঠির উপর ভর দিতেছেন আর একটি পা ফেলিতেছেন, অতি কষ্টে কষ্টে তিনি নামিতেছেন। সম্মুখ দিকে চাহিয়া দেখেন যে, একটি বৃদ্ধ সাধু পাহাড়ে উঠিতেছেন, হাতে লাঠি নাই। তাঁর বড় কষ্ট হইতেছে। সাধুটি একবার করিয়া উঠিতেছেন আর শরৎ-মহারাজের লাঠিটির দিকে চাহিতেছেন। শরৎ-মহারাজের যদিও লাঠিটি তখন নিতান্ত আবশ্যক ছিল, কিন্তু তিনি ভাবিলেন, –'আমি খুব উপর থেকে নীচে নামছি; দাঁড়িয়ে না পারি, বসে বসেও—ঘেঁসে ঘেঁসেও নামতে পারব—কিন্তু সাধুটী নীচে থেকে উপর দিকে উঠছেন'—এই ভাবিয়া শরৎ-মহারাজ লাঠিটি সাধুকে দিলেন...এবং উভয়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। গিরিশবাবু এই কথাটি শুনিয়া প্রায় বলিতেন, 'শরতের কি উঁচু ভাব, নিজের রুগ্ন শরীর, চল্‌তে অসমর্থ, একমাত্র সম্বল তার হাতের লাঠিটি। সেইটি আশ্রয় ক'রে সে পথে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে চল্‌ছে, কিন্তু বৃদ্ধ সাধুর কষ্ট দেখে নিজের শেষ সম্বল পর্যন্ত ত্যাগ কর্‌লে। কটা লোক এ সময় হাতের লাঠিটি দিতে পারে? শরতের কি মহা বৈরাগ্যের ভাব,—নিজের দেহ, নিজের প্রাণের কোন মমতা রাখে না। একেই বলে ভিতর থেকে ত্যাগী!"—৺স্বামী সারদানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবর্ত্তক—ভাদ্র, ১৩৩৪।

(১) "ভারতে শক্তি পূজা" নামক উপাদেয় পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়া গিয়াছেন—যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্ত্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তি-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অর্পিত হইল।" তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এই উক্তি হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু এমন দিন বাঙ্গালায় ছিল যখন নেতার বা গুরুর আদেশ জীবন-দানে পালন করিবার জন্য বাঙ্গালার কতকগুলি মহাপুরুষ—যাঁহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু—সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। "বরিশালে শরৎ-মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—'আপনার জীবনে কি কোন বিশেষ বাসনা আছে?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—"কৈ এক মাত্র ঠাকুরের আদেশ পালন করা ছাড়া আর ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না।' (১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের পর যখন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনও বাঙ্গালার সেই তরুণ সন্ন্যাসিদিগের প্রধান ভাব ছিল—নরেন্দ্র-নাথের আদেশ পালন। সেই জন্যই তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াও আবার ঘর ছাড়িয়া বনবাসী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বা অম্লান বদনে সপ্তসাগর অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে বা আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। একালের বিলাত-যাত্রা এবং সেকালের বিলাত-যাত্রার মধ্যে যে গুরুতর ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে বয়সে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণাশ্রিত বাঙ্গালার কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসী প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বিলাত-যাত্রা করিয়াছিলেন—সেই সকল বিষয় চিন্তা করিলে এই কথাটিই সর্ব্ব প্রথমে মনে আসে যে, নেতৃস্থানীয় নরেন্দ্রনাথের আদেশ প্রতিপালন করাই সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন—আদেশের যুক্তি-যুক্ততা বিচার করিয়া দেখিবার ইচ্ছা কখনও কাহারও হৃদয়ে উপস্থিত হয় নাই। এই নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন্ গঠিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছিল।

---

(১) স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য। উদ্বোধন—আষাঢ়, ১৩৩৭।

স্বামী সারদানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়ের সৌজন্যে

"স্বামীজীর বাক্য, স্বামীজীর আদেশ তাঁর (শরৎ-মহারাজের) পক্ষে অভ্রান্ত বেদবাণী ছিল, স্বামীজীর কথায় তিনি কখনও বিচার বা দ্বিধা করেন নাই। নিজের কোন বিবেচনাশক্তি এ বিষয়ে তিনি প্রয়োগ করেন নাই। স্বামীজী এই কথা বলিয়া গেছেন, ব্যস্—এর উপর আর কোন বিচার নাই। তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া সেই কার্য্য করিতেন।" "গুরু এবং গুরুভাই যে এক" শরৎ-মহারাজের জীবনের একাংশ তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

শরৎ-মহারাজ বলিতেন—"আলমবাজারের মঠে—মনে কর্‌লুম যে সাধন ভজন কর্‌ব, সাধুগিরি ক'রে প'ড়ে থাক্‌ব—এমন সময় স্বামীজীর এক চিঠি এলো যে, শরৎ ইংলণ্ডে চ'লে আয়! চল্ বাবা চল্—চল্লুম। ইংলণ্ডে বলে—'লেক্‌চার কর্, লেক্‌চার কর্!" আমার ত প্রাণ আঁৎকে উঠ্‌ল—আরে বাবু আমি কি লেকচার জানি? বল্লে—'তোকে মার্‌ব, ঠ্যাঙ্গাবো!' আমি বল্লুম—মারো আর ঠ্যাঙ্গাও আর Work House-এ নিয়ে গিয়ে খাটাও—আমার ও-জিনিস নাই! একবার গিয়ে লেক্‌চার দিতে দাঁড়াবো—পারিত ভাল, নচেৎ এক চোঁ-চাঁ দৌড় মেরে দেশে পালাবো, আর সাধুগিরি ক'রে আলমবাজারে প'ড়ে থাক্‌বো! আমি ত বাবু হাবা-গোবা লোক—স্বামীজী যা বলেন তা-ই শুনি—এই পর্য্যন্ত আমার কাজ।"

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ইংলণ্ডে গেলেন এবং দক্ষতার সহিত তথায় বেদান্ত প্রচার করিলেন। স্বামীজী আদেশ দিলেন—'ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যাইয়া প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হও।' শরৎ-মহারাজ কাল বিলম্ব না করিয়া আট্‌লাণ্টিক্ অতিক্রম করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বোষ্টন নগরের নিকটবর্ত্তী কেম্ব্রিজ নামক গ্রামে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইল। তাঁহার সারগর্ভ বাণী শুনিবার জন্য দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ

আসিতে লাগিল, এমন সময় ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান আসিল—"শরৎ ভারতে ফিরিয়া এস।" স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অবিলম্বে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন—কেম্ব্রিজে একটি মঠ স্থাপন পূর্ব্বক বেদান্ত প্রচার করিবার যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা কল্পনায়ই রহিয়া গেল! পরে কোন সময়ে শরৎ-মহারাজ বলিয়াছিলেন—"দেখ হে লণ্ডন থেকে ত গুড্উইনের সঙ্গে আমি আমেরিকায় গেলুম্। কেম্ব্রিজে বেশ লেক্‌চার জম্‌লো, নানা জায়গা থেকে লোক আস্‌তে লাগলো, মনে করলুম্ এইখানে একটা মঠ ক'রে কাজ কর্‌বো; কিন্তু যে সময় কাজটা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে, স্বামীজীর এক চিঠি গেল—'শরৎ চলে আয়।' আমি ভাব্‌লুম, কাজ আমার নয়, কাজ তোমার, তুমি বলেছ তাই কাজ কর্‌ছি—এখন তুমি বল্‌ছ ফিরে যেতে, ব্যস্, যাচ্ছি, কাজ রইল প'ড়ে। এইত পুঁটুলি—পাঁটলা গুটিয়ে দিলুম্ চম্পট্—তারপর কাজ চলুক্ আর না চলুক্, আমি তার দায়ী নই; আমার কাজ আদেশ শোনা, আমি তা করেছি।"

* * * *

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ যখন স্থাপিত হয় তখন উহার নাম ছিল "রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন।" স্বামী বিবেকানন্দ মঠ-প্রতিষ্ঠার দিন বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্ত্তনা কর্‌তে কখনও উপদেশ দেন নাই। তিনি সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেইগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে তা শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ! সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত ক'রে যেতে আমার জন্ম হয় নাই। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই

আমাদের জন্ম।……সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন্। তিনি অনন্ত ভাবময়……তাঁর [কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ এখনই তৈরি হতে পারে।……" (১)

সেই নবগঠিত "রামকৃষ্ণ প্রচার বা মিশনের" উদ্দেশ্য ছিল—"মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্য্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা "এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।" স্বামী বিবেকানন্দ "প্রচারের" সাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন। কলিকাতার কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শ্রীশ্রী-মার অন্যতম অন্তরঙ্গ স্বামী যোগানন্দ সহকারী সভাপতিরূপে মনোনীত হইয়া নিষ্ঠার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে ব্রতী ছিলেন। তখন প্রতি রবিবারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে "প্রচারের" অধিবেশন হইত—কারণ মঠের কোন গৃহ ছিল না।

বেলুড়ে যখন মঠ স্থাপিত হয় তখন স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে শিষ্যবর্গকে বলিতেন—"সকলকে এই কথা শুনুগে—'তোমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোল।'……ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।" স্বামীজীর সেই কাজ তাঁহারই নিজের কথায় বলি—"যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা

(১) স্বামি-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে ত যাবিই; তা' ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর্—নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে।" (১)

শ্রীশ্রী-মার অন্তরঙ্গ নীরব-কর্ম্মী স্বামী সারদানন্দ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই সেবার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন—আজীবন তিনি দাসই রহিয়া গেলেন, কখনও কর্ত্তা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন নাই—অথচ তাঁহারই ইঙ্গিতে বর্ষের পর বর্ষ "মিশনের" শত সহস্র মুদ্রা সেবাকার্য্যে ব্যয় হইয়া গিয়াছে! বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি মঠের অধ্যক্ষতা করিতে সম্মত হন নাই, 'সেক্রেটারি' থাকিয়াই জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর মঠের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠগুলিকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন কিন্তু কেহ কখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি কোনরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন! তিনি সকলকে স্নেহে সিক্ত করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন—নিজের সর্ব্বত্যাগের আদর্শে অপরকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বাহিরে অত্যন্ত গম্ভীর—যেন বজ্রাদপি কঠোর, কিন্তু অন্তরে একেবারেই কোমল। শ্রীশ্রী-মার কৃপাপ্রাপ্ত অপরাধী সেবকের দুঃখে তিনি নিজে কাঁদিতেন, অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য দণ্ড তুলিতেন না! বলিতেন—"যে ভাবের চিন্তা মনে স্থান দিলে নিজের ক্ষুদ্র বিশ্বাস-ভক্তির হানি হয়, সে ভাবের চিন্তা কখনও মনের মধ্যে স্থান দিও না। আজ তোমরা তাকে এমন দেখ্‌ছ, দশ বছর পরে সে যে একজন মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়াবে না,—কি ক'রে জান্‌লে? তখন তোমরাই বল্‌বে, তা' হবে না? সে যে মার কৃপা পেয়েছিল! মার মহিমা, মার শক্তি কতটুকু—আমাদের কি সাধ্য বুঝি!" (২)

(১) স্বামি-শিষ্য সংবাদ— শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(২) স্বামী-সারদানন্দ— ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য। উদ্বোধন—ভাদ্র, ১৩৩৭।

শ্রীশ্রী-মার ভক্ত সেবক অনেকে আছেন, কিন্তু শরৎ-মহারাজ যেমন মাতৃ-সেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছিলেন, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদিগের মধ্যে বা অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যে কয়টি তেমন দেখিতে পাওয়া যায় ? তাঁহার মাতৃসেবা নারী-মাত্রের সেবায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—মহিলাদিগের ভিতর ঠাকুরের ভাবধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। স্বামীজীর এই মন্ত্র মূর্ত্তি লইয়াছিল শরৎ-মহারাজে। স্বামীজীর এই কল্পনাকে তিনিই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই তাঁহারই চেষ্টায় বেলুড়মঠে মাতৃ-মন্দির—জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির—আর বাগবাজারে মাতৃমন্দির। এই শেষোক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি নিজ-দায়িত্বে একাদশ সহস্র মুদ্রা ঋণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ! বাগবাজারের এই শ্রীমন্দিরে বাঙ্গালার কত নর-নারী যে শ্রীশ্রী-মার নিকট অযাচিত কৃপা লাভ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। স্বামী সারদানন্দ এই ভাবে নারী জাতির অন্তরে ভাবময় ঠাকুরের ভাবধারা প্রবেশ করাইয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পাণ্ডিত্য, মনস্তত্ত্বালোচনায় গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বে প্রগাঢ় অভিজ্ঞান তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে" উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সুবৃহৎ জীবন-কথা পাঠ করিবার সুযোগ যাঁহার হয় নাই, তিনি ঠাকুরকে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ! আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে অবতার-পুরুষদিগের নানা কাহিনী বর্ণিত আছে বটে, সে কাহিনী শুধু অবতারেরই কাহিনী—মানুষ সেখানে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে! শ্রীভগবান্ মানুষের ভিতর দিয়াই অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার লীলা হয়—মানুষী-লীলা। মানুষের আবরণে দেবতা সেখানে প্রচ্ছন্ন

থাকেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গে' ঠাকুরের মানুষভাব ও দেবভাব এরূপ সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পাঠকের সম্মুখে দেব-মানব স্বয়ং আসিয়া অবতীর্ণ হন এবং তাহার দুর্ব্বল চিত্তের সংশয়-সন্দেহ চিরদিনের মত দূর করিয়া দেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বাঙ্গালীর মহামূল্য সম্পদ্ এবং বঙ্গ ভাষার কণ্ঠে যে হীরক-হার শোভা পাইতেছে ইহা তাহার মধ্যমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবনেতিহাস কোন ভারতীয় ভাষায় ত নাই-ই, ভারতের বাহিরেও অন্য কোন ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ।

নিষ্কাম নীরব কর্ম্মবীর, লাঞ্ছিতের শরণ, আশ্রয়হীনের অবলম্বন, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সম্মিলিত মূর্ত্তি, আর্ত্তের বন্ধু—সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ যোগী স্বামী সারদানন্দের তিরোধানের পর (২রা ভাদ্র, ১৩৩৪) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মাসিক বসুমতীতে" মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"কর্ম্মে—মঠ-নিয়ন্ত্রণে—ভক্ত-সম্প্রদায়কে উপদেশ দানে—ভালবাসা বিতরণে ব্যাপৃত থাকিয়াও শরৎ-মহারাজের সাধনার বিরাম ছিল না। জীবন-লীলার শেষাংশে বহুমূত্র রোগে জর্জ্জরিত, অসুস্থ শরীরে তাঁহার ধ্যান, সাধনা আরও বাড়িয়া চলিয়াছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে ধ্যানে বসিতেন, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সামান্য আহারের পর, বিভিন্ন মঠের ও ভক্তগণের শতাধিক পত্রের উত্তর দিতেন,—'উদ্বোধন', গ্রন্থ-প্রচার, মঠের কার্য্যাদির রিপোর্ট প্রভৃতি দেখিতেন। অপরাহ্নে তিনি সমবেত মহিলাগণকে ও সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন।......এই কঠোর ধ্যানের ফলে কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতে কহিতে গত ২১শে শ্রাবণ (১৩৩৪ সাল) শনিবার তিনি দুরারোগ্য সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েন।......"

'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলা সংবরণের পর স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞান, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ত্যাগ—লোকাতীত ভালবাসা, স্বামী প্রেমানন্দের ভক্তি, স্বামী শিবানন্দের তপস্যা, শ্রীমৎ অদ্ভুতানন্দের যোগবল, স্বামী অখণ্ডানন্দের (গঙ্গাধর মহারাজের) সেবাব্রত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী-মহারাজ) পূজা এবং তুরীয়ানন্দ স্বামীর (হরি-মহারাজের) নিষ্ঠা—কঠোরতা; স্বামী সারদানন্দের কর্ম্ম-সাধনা-সমন্বয়ের সম্মিলিত জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রভাবে বেলুড় মঠে—বিশ্ব-জনমঙ্গল-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানে—ত্যাগে—সাধনায়—ভক্তিতে—ভালবাসায়—সেবায়—করুণায় সূর্য্যসম কল্যাণকর দিব্য-জ্ঞান জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। এই জ্যোতিঃমণ্ডলের জ্যোতিঃকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও এক এক জ্যোতিঃ-রশ্মিরেখা—এক এক ত্যাগদীপ্ত সন্ন্যাসী। তাঁহাদের মহিমা-কিরণের প্রভায় ভারত ও জগৎ যুগে যুগে উদ্দীপিত—অনুপ্রাণিত—উদ্বোধিত—সঞ্জীবিত হইবে। এই জ্যোতিঃ অবিনশ্বর—চির-অপরিম্লান। এই পুণ্যপ্রভায় ভারত চিরদিনই—জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, পুণ্যের আলোক সম্প্রসারিত করিয়া, জগতের মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া, মঙ্গল সংসাধন করিবে।······জানি প্রভু, তুমি মানবের মুক্তিমন্ত্রের গুরু, মুক্ত আত্মা—ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে বিরাজিত, স্বয়ং ব্রহ্ম। জগতে তোমার বিনাশ নাই,—তুমি সর্ব্বকালে—সর্ব্বস্থলে—সর্ব্ব অন্তরে নিত্য বিরাজিত ;······করুণাময় তুমি, তোমার আশীর্ব্বাদের, করুণার পূত-ধারায় ভারত ও জগৎ পবিত্র হউক—ধন্য হউক—বাঙ্গালী মাতৃমন্ত্রের সাধনায় জয়লাভ করুক্।"

স্বামী বিবেকানন্দ

বাঙ্গালার ধর্মগুরু ২য় খণ্ড

স্বামী বিবেকানন্দ

চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্—পৌরুষ প্রকাশ কর।

* * * * *

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমর ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণে আমার কল্যাণ,—আর বল দিন রাত—'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বা আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা,—আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।

স্বামী বিবেকানন্দ।

এই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ! বিদ্রোহের ধ্বজা হস্তে জন্ম হইয়াছিল তাঁহার (১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ), বিদ্রোহের ধ্বজা হস্তেই তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণ ঘটিয়াছিল! সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আমূল-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পাশ্চাত্য জগতের জড়-সভ্যতার অনুকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এমন কি কখনও কখনও নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! তাঁহার জীবনের অল্প কয়েকটি মাত্র বৎসর বিশ্বদগ্ধকারী অগ্নির সামান্য একটি শিখা মাত্র ছিল না—উহা ছিল বিরাট অনল-স্তম্ভ, যাহারা সমুন্নত শিখর স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া অন্ধকারের এত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে, তখনকার শিক্ষিত সমাজের মত এখনকার শিক্ষিত

সমাজও পশ্চাতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া না চাহিলে সেই অনল-স্তম্ভের চূড়া দেখিতে পায় না।

কলিকাতার গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটের আঢ্য বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ কালে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া তাঁহার শিক্ষাগুরু, ইষ্ট ও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সুপ্রাচীন ভারতের বহুশত বৎসরের তপস্যা, জ্ঞান ও চিন্তার বেদস্বরূপ—তিনি ত একটি ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না; প্রাচীন ভারতের সেই পুরাতন বেদের ভাষ্যকার হইয়াছিলেন নবীন ভারতের সম্মিলিত শঙ্কর-রামানুজ—স্বামী বিবেকানন্দ এবং সেই বেদ-প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে এক নব্য ভারত—যাহার দেহের প্রতি অঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মুদ্রা পড়িতেছে।

সম্পন্ন গৃহস্থের অতিশয় প্রতিভাশালী শ্রুতিধর পুত্র নরেন্দ্রনাথ বাল্যে ও কৈশোরে দুঃখের মুখ দেখেন নাই বলিয়া তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, দুঃখের মুকুট মাথায় দিয়া সুখ আসে। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পারিবারিক মান, সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র পাদপীঠ ছিল পিতার অর্জ্জিত রাশি রাশি অর্থ। তাঁহার মনস্বিনী জননী তখন মাসিক -সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া সংসার পরিচালনা করিতেন। সেই সহস্র মুদ্রা অকস্মাৎ যখন ত্রিশের মলিন কোঠায় নামিল তখন নরেন্দ্রনাথের পুরাতন আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বাস-গৃহখানি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে—ফুলের বোঁটায় বোঁটায় কাঁটা আছে। ফুল যতই শুকায়, কাঁটা ততই মুখ উঁচু করে। যাহারা মানুষ তাহারা সেই কাঁটার তীক্ষ্ণ মুখ চরণে দলিত করিবার জন্য বল সঞ্চয় করে; সেই বল আসে মনে।

দুঃখের কাঁটা ক্রমেই এমন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল যে, নরেন্দ্রনাথের গৃহে এ-বেলার আহারের সংস্থান আছে ত ও-বেলার নাই! এমন অনেক রাত্রি কাটিল নরেন্দ্রনাথ যখন শুধু খানিকটা জল মাত্র পান করিয়াই কাটাইলেন—মাকে কহিলেন, বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছেন! পায়ের পুরাতন জুতা ছিঁড়িয়া গেল—নূতন জুতা ক্রয় করিবার মত অর্থ জুটিল না! নরেন্দ্রনাথ চাকুরির সন্ধানে কলিকাতার পথে পথে নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন! তিনি তখন কলিকাতা ইউনিভার্সিটির মোহর দেওয়া একজন প্রতিভাশালী গ্রাজুয়েট! এত প্রতিভা তাঁহার যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পূর্ব্ব দিন, এক রাত্রি পাঠ করিয়াই ইউক্লিডের জ্যামিতির চারিখানি খণ্ডই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এফ্‌ এ পড়িবার সময় ন্যায় শাস্ত্রের সকল ইংরাজি গ্রন্থই তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল—বি, এ, পরীক্ষার পূর্ব্বে ইউরোপের সমুদয় দর্শনশাস্ত্র এবং সমগ্র ইউরোপের প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস তাঁহার কণ্ঠাগ্রে আসিয়াছিল! সংস্কৃত ন্যায়-দর্শন-কাব্যাদিতে তাঁহার সমকক্ষ কোনও ছাত্র তখন কলিকাতায় ছিল না! বহু অধ্যয়নের ফলে শেষে তাঁহার এরূপ শক্তি জন্মিয়াছিল যে, কোন পুস্তকের প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করিলেই, প্যারাটিতে কি আছে তাহা তিনি বলিতে পারিতেন—শেষে, পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়িলেই সেই পৃষ্ঠায় কি আছে তাহা তিনি বুঝিয়া লইতেন! নরেন্দ্রনাথ এইভাবে নিজেই মূর্ত্তিমন্ত বিদ্যা হইয়াছিলেন—শুধু বিদ্বান্ হন নাই!

যাহা হউক, প্রথম-জীবনে চাকুরির চেষ্টায় নগ্নপদে রৌদ্রতপ্ত রাজপথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তাঁহার পদতলে ফোস্কা পড়িল। আর চলিতে পারেন না দেখিয়া অবসন্ন ক্ষুধার্ত্ত দেহে অক্‌টারলোনি মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন। নিকটে একটি ব্রাহ্ম-বন্ধু ছিলেন। সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি গাহিয়া উঠিলেন—"বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্ম নিশ্বাস পবনে—।"

বিরক্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—“নে নে চুপ্ কর্! ক্ষুধার তাড়নায় যাদের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পেতে হয় না—গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাদের নাই—টানা-পাখার হাওয়া খেতে-খেতে তাদের কাছে ও-গান বেশ লাগ্‌বে! আমারও একদিন লাগ্‌তো! কঠোর সত্যের সম্মুখে এখন মনে হচ্ছে, এ সব বিষম ব্যঙ্গ!” (১) যাঁহাকে সম্রাটের অধিক মান ও ভগবানের অবতারের প্রাপ্য ভক্তি অর্পণ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবী নিজেকে নীরবে প্রস্তুত করিতেছিল, সেই অসাধারণ দেব-মানব অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী হইয়াও কলিকাতার রাজপথের একজন অতি দীন ভিখারী অপেক্ষাও তখন দীন হইয়াছিলেন! দারিদ্র্য শুধু যে দেহকেই দুঃখ দেয়, তাহা নহে—মনকেও হত্যা করে! এই সময়ে একদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় আকুমার ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ ভগবানের নাম করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মাতা বলিয়া উঠিলেন—“চুপ্ কর্ ছোঁড়া—ছেলেবেলা থেকে ভগবান্, আর ভগবান্! ভগবান্ ত সবই কর্‌লেন!”

নরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার মন কহিল—“যে ভগবান্ তোমাকে ইহলোকে দু’টি আহার দিতে পারেন না, তিনি যে পরলোকে সুখে রাখিবেন তাহা কি বিশ্বাস কর?”

ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার উপরও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন! শেষ-আঘাতের দণ্ডটি উদ্যত করিয়া দারিদ্র্য-দৈত্য তখন খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—‘নাই—নাই—ঈশ্বর নাই! যদিই থাকেন, তাঁহাকে ডাকিয়া কোন ফল নাই!’

লোকে বলিতে লাগিল, ‘নরেন্দ্রনাথ এইবারে নাস্তিক হইয়াছে।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

এই এতদিন ব্রাহ্মসমাজে ঘোরা-ফেরা করিল—দু'একদিন দক্ষিণেশ্বরের পাগ্‌লা বামুনটার কাছেও গেল—এখন একেবারে নাস্তিক!' কেহ কেহ বলিল 'শুধু কি নাস্তিক? নরেন এখন মাতাল—বেশ্যাসক্ত। নিরামিষ-ভোজী হ'য়ে কম্বলের উপর প'ড়ে থাকে—ও একটা ভাণ মাত্র!' অপরে বলিল—'হাঁ, নরেন্দ্র বলে কিনা রাত্রে নিদ্রা গেলেই দেখে, চোখের সাম্‌নে জ্যোতিঃ জ্বল্‌ছে! এতদিনে বোঝা গেল—বোতলের মাত্রা বাড়্‌লেই, অমন জ্যোতি-টোতি অনেক দেখা যায়!'

কথা কাণে হাঁটে। এই অপবাদের কথা [illegible] শুনিলেন আর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া শুনিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই ত ঠাকুর তাঁহাকে [illegible] স্নেহ করিতেন, তাঁহার প্রশংসা ঠাকুরের মুখে ধরিত না। পরে [illegible] ঠাকুর বলিতেন—'নরেন যেন খাপ্-খোলা তলোয়ার—সে যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।' আবার সেকালের [illegible] কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন—"কেশব যেমন [illegible] শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর [illegible] আঠারোটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখিলাম কেশব ও [illegible] অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে, নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হওয়ায় [illegible] লেশ পর্য্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছে।"

যাহা হউক, "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ"—তাই প্রথম অবস্থাতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিলেন এবং দেবতার মত [illegible] দেখাইয়া তাঁহার নিকট যুক্তকরে বলিয়াছিলেন—"জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ।" ঠাকুরের এই আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ

তখন নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ—ত একেবারে উন্মাদ—তাহা না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে!"(১)

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দর্শন হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"একদিন দেখিতেছি— মন সমাধিপথে জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, তারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাব-জগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তর সমূহ যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্ত্তি সমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ম্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, সেখানে মূর্ত্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্য-দেহধারী দেবদেবী সকলে পর্য্যন্ত যেমন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহু দূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্য জ্যোতিঃঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম জ্ঞানে ও পুণ্যে, ত্যাগে ও প্রেমে ইঁহারা মানব ত দূরের কথা দেবদেবীদিগকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি; এমন সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র বিরহিত সমরস জ্যোতির্ম্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণ পূর্ব্বক নিজ অপূর্ব্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বান-পূর্ব্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেম-স্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধস্তিমিত নির্নিমেষলোচনে সেই অপূর্ব্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত দেব-শিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল—'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।'...... তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই (ঋষির) শরীর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোম-মার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।" (দর্শনোক্ত দেবশিশুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অন্য সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর স্বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

সেই নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অপবাদ শুনিয়া প্রেমময় ঠাকুর আদৌ বিশ্বাস করিলেন না। যাঁহারা অপবাদের সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন তীব্রকণ্ঠে তাঁহাদিগকে বলিলেন—"চুপ্ কর্ শালারা;—মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখনো আমাকে ঐ সব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না!"(১)

লোকপ্রচারিত কলঙ্ককাহিনী শুনিয়াও নরেন্দ্রনাথ উদাসীন হইয়া রহিলেন এবং স্থির করিলেন, পিতামহের মত সন্ন্যাস লইয়া দেশত্যাগী হইবেন। সংসারত্যাগের দিন-ক্ষণ মনে মনে স্থির করিয়া নরেন্দ্রনাথ একবার—শেষবার—ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিবামাত্র ঠাকুর সহসা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সস্নেহে ধারণ পূর্ব্বক সজল নয়নে গাহিয়া উঠিলেন—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই,—
(আমার) মনে সন্দ হয়,
বুঝি তোমারে হারাই, হা—রাই!

নরেন্দ্র গান শুনিয়া ঠাকুরের মতই ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।—

"পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া ঠাকুর কহিলেন—জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি, ততদিন আমার জন্য থাক।"

নরেন্দ্রনাথের আর সংসার ত্যাগ করা হইল না।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২)

ঠাকুরের দর্শনলাভের অল্পদিন পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের পিতা পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী এটর্ণি ছিলেন। ধর্ম্ম-কর্ম্ম যদি কিছু থাকে তবে তাহা বাইবেলেই আমোদের ছিল তাঁহার অভিমত। অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজে সুখে থাকব এবং "যথা সম্ভব দান করিয়া দশজনকে সুখী করিব—ইহাই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল।" সে যুগ ছিল পাশ্চাত্যের যুগ। যুগশক্তির প্রভাব হইতে নরেন্দ্রনাথও প্রথমে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই—পরে হইয়াছিলেন। প্রথমে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে উহাকেই ভিত্তি করিয়া "সত্য বস্তু" নির্ণয় করিবার ইচ্ছা বলবতী হইলেও, অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইল—প্রাচীর পথই ভাল, কি প্রতীচীর পথই ভাল। নরেন্দ্র-নাথের প্রভূত মানসিক বল ছিল, তাই তিনি পাশ্চাত্যের গুণভাগ গ্রহণ করিয়া দোষভাগ ত্যাগ করিতে পারিলেন এবং ভারতের হারাণো-সংস্কৃতির সহিত তাহার পুনর্ম্মিলন ঘটাইলেন। তাই পরবর্ত্তী কালে দেখি, তিনি তারস্বরে বলিতেছেন—"সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন! সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলো-মেলো ভাব আসিয়াছে,—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই, সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই—কতকগুলি ভাবের বদ্‌হজম হইয়া ঠেলিয়া পাকাইয়া গিয়াছে।......সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ সকল আচার সাহেবদের মত-বিরুদ্ধ! কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ? বোধ হয়, সাহেবেরা এরূপ বলিয়া থাকে।" অন্য এক সময়ে তিনি বলিয়া-ছেন—"হে ভারত! এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা—এই

দাস-সুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ?......মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জ্জন না করিলে কোনও বস্তুই নিজের হয় না।"

যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া নরেন্দ্রনাথ [illegible] মনে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বাপরই তিনি ধ্যান করিতে ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবৎলাভের জন্য ধ্যানের মত প্রকৃষ্ট পথ আর নাই। ক্রমেই তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি?" উত্তরে শুনিলেন—"না দেখি নাই, তিনি আছেন, তাহা শুনিয়াছি।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে নরেন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া তাঁহার পরম যত্নের হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন—আপন মনে কহিলেন—'যাক্ এই আবর্জনার স্তূপ, ইহারা কেহই বলে না যে ভগবান্‌কে কেহ দেখিয়াছে! তিনি যদি সত্যের ভগবান্ হন কেন তাঁহার দর্শন পাইব না!' কলেজে পড়িবার সময় নরেন্দ্রনাথ আচার্য্য হেষ্টি সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, "প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভবে" কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাবসমাধি হইত। সমাধি [illegible] বলে ছাত্রগণ তাহা বুঝিতে না পারায় সাহেব বলিয়াছিলেন—[illegible] প্রকার অবস্থার অধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।—একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল এরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি,—তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।"

হেষ্টি সাহেবের নিকট ঠাকুরের কথা শুনিবার পর, ঠাকুরের ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রের বাটীতে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ

হয় (নভেম্বর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে)। নরেন্দ্র তখন জেনেরাল্ এসেম্‌ব্লিজ্ কলেজে এফ্ এ পড়িতেন। ইহার পরেও ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যখন ঈশ্বর দর্শন করেন নাই তখন কে আর নরেন্দ্রনাথকে ঈশ্বর-দর্শনের পথ বলিয়া দিবে! নরেন্দ্রনাথ উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মন কহিল—ঈশ্বর সত্য স্বরূপ বলিয়াই স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কি তাঁহাকে দেখিয়াছে? না, সকলেই শুধু শুনিয়াছে যে, ঈশ্বর আছেন! তখন মনে পড়িয়া গেল দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথা। নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটিলেন—সত্যই ছুটিলেন এবং ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন—"মশায়, আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?" উত্তর হইল—"হাঁ দেখেছি, এই যেমন তোমাকে দেখ্‌ছি—ঠিক এই রকম। এই যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি—ঠিক এমনি ক'রে তাঁর সঙ্গেও কথা কয়েছি!" (১)

নরেন্দ্র জানিতেন এই পূজারী-ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ-উন্মাদ। সেই উন্মাদের কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন,—এই উন্মাদ ঈশ্বর দর্শন করিবেন, ইহাও কি সম্ভব! কিন্তু তিনি ত বলিলেন—'হাঁ দেখেছি!'

উন্মাদ-ঠাকুর সেদিন আর যাহাই বলিয়া থাকুন—কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্র-কেশরীকে দক্ষিণেশ্বরের পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন! বহুবার সেই পিঞ্জর ভাঙ্গিতে বিফল প্রয়াস করিয়া বাঙ্গালার এই নৃসিংহাবতার শেষে সেই উন্মাদের শ্রীচরণেই আননাকে লুটাইয়া দিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

(১) The Life of the Swami Vivekananda—By his Eastern and Western Disciples.

মায় গুলাম্, মায় গুলাম্, মায় গুলাম্ তেরা।
তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান্ তু, দেওয়ান্ মেরা।

* * * *

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীর যে কক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকিতেন, একদিন সেইখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি নরেন্দ্র-নাথের অঙ্গে নিজের চরণ স্থাপিত করিবামাত্র নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন—"দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত" তাঁহার "আমিত্ব যেন এক সর্ব্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে।" মরণ সম্মুখে—অতিশয় নিকটে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওগো তুমি আমায় একি করলে—আমার বাপ-মা আছেন।" এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঠাকুর খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষস্থল স্পর্শ করিতে করিতে বলিলেন—"তবে এখন থাক্—একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে।" (১)

যুবক নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন—কি এ? ইহা কি মোহিনী ইচ্ছাশক্তির সংক্রমণ, না সম্মোহনবিদ্যার প্রভাব? এ সমস্যার মীমাংসা হইল না বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরই কালীবাড়ীর নিকটবর্ত্তী যদুনাথ মল্লিকের উদ্যানবাটীকায় একটি নির্জ্জন কক্ষে ঠাকুরের অদ্ভুত স্পর্শ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে সেই অবস্থায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র যে-দিন জানিতে পারিবেন সত্য সত্যই তিনি কে—সেই দিনই তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

মহাপুরুষ, নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধের থাক্—নরেন্দ্র ঈশ্বরকোটি, কেবল লোক-শিক্ষার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই দুই দিনের সাক্ষাতের ফলে যেরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল তাহাতে কলেজের ইংরাজী-পড়া ছাত্র নরেন্দ্রনাথও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন—কিন্তু মনে মনে পণ করিলেন—বিনা বিচারে ঠাকুরের কোনও কথাই মানিয়া লওয়া হইবে না—স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত যুক্তিকে উন্মাদের চরণে অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার দাস হওয়া চলিবে না। পাছে নিজের অজ্ঞাতে নিজেকে বিকাইয়া না দেন সে বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ তখন জাগ্রত-সচেতন রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার প্রাণ নিরন্তর ঠাকুরকেই চাহিতেছে, অথচ যুক্তি কহিতেছে—দেখিতেছ না ঠাকুর উন্মাদ। তুমি কি শেষে উন্মাদের পায়ে মাথা রাখিবে?

মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব লইয়া কয়েক দিন কাটিয়া গেল। ঠাকুর সুবিধা পাইলেই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অদ্বৈততত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কহিলেন—জীব ও ব্রহ্ম এক। সবই তিনি—তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নাই।

নরেন্দ্রনাথ মন দিয়া শুনিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন—এ উন্মাদ বলে কি? ঘটী ঈশ্বর, বাটী ঈশ্বর—তুমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর—ওই বৃক্ষ, ওই মন্দির সবই ঈশ্বর। ইহাও কি সম্ভব? পার্শ্বে উপবিষ্ট ভক্ত হাজরাকে তিনি বলিলেন—কখনও ইহা সম্ভব নহে—সত্যও নহে। এ সকল কথা যুক্তিবিরুদ্ধ।

ঠাকুর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া নরেন্দ্রের যুক্তি-তর্ক-বিচার সহাস্য বদনে শুনিলেন এবং নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়াই নিজে সমাধিমগ্ন হইয়া গেলেন।

পরে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ঠাকুরের ঐ দিনকার অদ্ভুত স্পর্শে

মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্য সত্যই দেখিতে লাগিলাম—ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই !…… সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমিল না। বাটীতে ফিরিলাম—সেখানেও তাহাই—যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম, সে সকলই তিনি।……খাইতে বসিলাম,—দেখি অন্ন, থালা, যিনি পরিবেশন করিতেছেন সে সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে!……খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে সকল সময়েই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্ব্বদা কেমন একটি ঘোরে আচ্ছন্ন রহিলাম। রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ী আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু অন্য সময়ের ন্যায় উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না! মনে হইত, উহাও যাহা, আমিও তাহাই। ····হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুষ্পার্শ্বের লৌহ-রেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম—যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল, অথবা সত্যকার!……এইরূপে কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম ইহাই অদ্বৈত-বিজ্ঞানের আভাস মাত্র! তবে ত শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নহে।"

হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সহিত ভ্রমণকালে নরেন্দ্রনাথ নিজের এই দিব্যানুভূতির বিষয় বলিতে বলিতে গাহিয়া উঠিলেন—

প্রেম ধন বিলায় গোরা রায়।
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়।
(তোরা কে নিবিরে আয়।)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে
তবু না ফুরায়।

প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু
নদে ভেসে যায়।
(গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে)
নদে ভেসে যায়।

গীত শেষ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন—"সত্য সত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল—গোরা রায় যাহাকে যাহা-ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন! কি অদ্ভুত শক্তি!......রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে;—কত কথা, কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন! সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন।" (১)

নরেন্দ্রনাথের প্রাণ তখন বলিতে লাগিল—

দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধি;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নর নারী।
সিন্ধু রোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্র সূর্য্যে তোমারি বচন,
মৃদু মন্দ পবন-আলাপ,
এ সকল সত্য কথা।(২)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।
(২) গাই গীত শুনাতে তোমায়—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ।

(৩)

নরেন্দ্রনাথের পারিবারিক দুঃখ-দৈন্যের কথা শুনিয়া ভক্তগতপ্রাণ ঠাকুরের অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথও একদিন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'মাকে বলিয়া আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করুন'।

ঠাকুর কহিলেন—"ওরে আমি যে ও-সব কথা বল্‌তে পারিনে। তুই যা-না কেন? মাকে মানিস্ না, সেই জন্যই তোর এত কষ্ট।" সত্য সত্যই তখন পর্য্যন্তও নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসহীন ছিলেন, কারণ তখনও তাঁহার মধ্যে প্রতিমা-পূজা-বিরোধী ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন!

ঠাকুরের কথা শুনিয়া নরেন্দ্র বলিলেন—'আমি মাকে জানি না—আপনাকে জানি। আপনাকেই বল্‌তে হবে।'

ঠাকুর কহিলেন—'ওরে আমি ত কতবার বলেছি। তুই মাকে মানিস্ না, সেই জন্যই ত মা শুনে না। আজ মঙ্গলবার, আমি বল্‌ছি, আজ রাত্রে কালী-ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে তুই যা' চাইবি, মা তোকে তা-ই দেবেন।'

নরেন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি আসিল। প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন—'এইবার মার কাছে যা।'

নরেন্দ্রনাথ শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার চরণ টলিতে লাগিল—হৃদয় এক একবার সঙ্কুচিত হইতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল, পাথরের জড়-প্রতিমা কি কখনও মনুষ্যের বেদনা বুঝিতে পারে? মিথ্যা

মন্দিরের দ্বারে আসিবামাত্র নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন—একি অপরূপ! মৃণ্ময়ী প্রতিমা—চিন্ময়ী! জীবিতা—হাস্যময়ী করুণাময়ী—সৌন্দর্য্যময়ী—ঐশ্বর্য্যময়ী! নরেন্দ্রনাথ বিহ্বল হইয়া প্রণাম করিলেন। যুক্ত করে চাহিলেন—'মা মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও মা—যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি, তা-ই করো মা—!'

তিনি ধনরত্ন, সুখ-সম্পদ্ কত কি চাহিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন—তাঁহার কাছে ভিখারীর মত মুষ্টি ভিক্ষা চাহিতে পারিলেন না! একবার—দুইবার—তিনবার ধনরত্ন চাহিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে মার দ্বারে পাঠাইলেন—তিনবারই নরেন্দ্রনাথ চাহিলেন,—বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তি।

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল—'হায়! কি করিলাম! আমার মা-ভ্রাতা-ভগ্নী সকলেই যে অনাহারে পড়িয়া আছেন! কি চাহিলাম? জগন্মাতার কাছে আমি এ কি চাহিলাম?'

নিরুপায় হইয়া নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পায়ের উপর পড়িলেন। কহিলেন—'আমি চাহিতে পারিলাম না, কিন্তু আমার হইয়া আপনাকেই চাহিতে হইবে!'

বিশেষ পীড়া-পীড়ির পর ঠাকুর কহিলেন—'আচ্ছা যা, তোদের [illegible] ভাত-কাপড়ের কখনো অভাব হবে না।'

হিমালয় কাঁপিয়া উঠিল—কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার ঋজু উচ্চ চূড়া সেই মুহূর্তে খসিয়া খসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল! নরেন্দ্রনাথ—সেই প্রতিমা বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ যুক্ত করে ঠাকুরকে কহিলেন—'আমাকে একখানি [illegible] গান শিখাইয়া দিন।'

তখন ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন—বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথও গাহিতে লাগিলেন—

মা ত্বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা, পরাৎপরা।
তোরে জানি মা—ও দীন দয়াময়ী,—
তুমি দুর্গমেতে দুঃখ হরা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমিই আদ্য মূলে গো মা —
আছ সর্ব্বঘটে, অক্ষপুটে'—
সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা,—
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী,
সদা-শিবের মনোহরা।

গানের সুর নরেন্দ্রনাথের হৃদয় সিক্ত করিয়া মধুস্রোতের মত ঠাকুরের কক্ষের বাহিরে আসিল—সুর কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণ ছাইয়া ফেলিল—সুর ভাগীরথীর শত তরঙ্গের শিরে শিরে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিল। সমস্ত রাত্রি এই গান গাহিতে গাহিতে মাতৃনামের মধুরভাবে প্রমত্ত নরেন্দ্রনাথ নিশিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সেই স্বপ্নহীন নিদ্রার ঘোরে প্রতিমা-পূজা-বিরোধী ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল। তাহার চিতাভস্মের উপর ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন—যুগযুগান্তরের সঞ্চিত-ধ্বান্তবিনাশী এক অগ্নিময় বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী—বরাভয়করা জগন্মাতার শ্রীকরধৃত সুশাণিত অসির ফলকের মতই একান্ত তীক্ষ্ণ ও অপরাজেয়। কিছুকাল পর এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হইয়াছিল—'আপনার আলো,

কেবল পরের ভালোয় হয়—আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়। পরের মুক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া যদি দু'চার বার নরককুণ্ডেও যাইতে হয়—সেও ভাল—তবুও সকলের মুক্তির জন্যই অপেক্ষা করিতে হইবে—সমষ্টির মুক্তি চাই—ব্যষ্টির মুক্তি চাই না। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ্ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোক-হিতং চরন্তঃ—বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা—এই আমার ধর্ম্ম,······'হে মানব! মৃতের পূজা হইতে তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি, গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি।'

* * * *

নরেন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ পাইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে, কলিকাতায় নানা ভক্তদিগের গৃহে—পরে ঠাকুর অসুস্থ হইলে শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরে তাঁহার পদ প্রান্তে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করায় নরেন্দ্রনাথ অনায়াসে জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অন্যান্য দশ জন গুরুভ্রাতার নেতা, ভ্রাতা ও বন্ধু হইয়া উঠিলেন। কখনও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী-মূলে, কখনও বা কাশীপুরের উদ্যানে এই নবীন সন্ন্যাসিগণ কঠোর তপস্যা করিতেন এবং নিজেদের দেহ পাত করিয়াও গুরুসেবায় রত থাকিতেন। ঠাকুর ইহাদিগকে গৈরিক দান-করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাস-[illegible] ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসগ্রহণ কালে গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বিরজা হোমকালে তন্ত্রধারক হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ এই সময় আপন আপন ভাবানুযায়ী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের নাম হইয়াছিল—বিবিদিষানন্দ। পরে আমেরিকা যাত্রাকালে স্বামী বিবিদিষানন্দ নিজেকে স্বামী

বিবেকানন্দ নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। সেই অবধি নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ নামেই সুপরিচিত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

(৪)

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আবাল্য নির্ভিক ও তেজস্বী। এই তেজস্বিতা শুধু তাঁহার মনেরই সম্পদ্ ছিল তাহা নহে—দেহেরও ছিল। অশ্বারোহণ, যষ্টি-ক্রীড়া, মুদ্গর হেলন, কুস্তি, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতিতে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিয়া সত্যসত্যই একটি সিংহ হইয়াছিলেন—তাই ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। উত্তরকালে তিনি তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—পৃথিবীতে 'পাপ' বলিয়া অন্য কিছু নাই—আছে দুর্ব্বলতা; সেই দুর্ব্বলতাই 'পাপ'। ওই শোনো ঋষিবাক্য—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। আগে দেহে সবল হও তবে মনে সবল হইতে পারিবে। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব তোমার মধ্যেই গুপ্ত আছে। সবল হইয়া সেই ঈশ্বরকে বিকশিত কর—প্রকাশিত কর—নিজে ঈশ্বর হও।' বলিয়াছিলেন—"মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড়। Physique—টাকে (দেহটাকে) আগে গ'ড়ে তোল। তবে ত মনের উপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে।"

এই তেজোপূর্ণ উপদেশবাক্য শুনিয়া শিষ্য বলিলেন—"মহাশয় 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু 'ব্রহ্মচর্য্যহীনেন' বলেছেন।"

স্বামীজি বলিলেন—"ত' বলুনগে। আমি বলছি The physically weak are unfit for the realisation of the self."......ঠাকুর বলতেন—'শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হ'তে পারে না।'... মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে খুব জোর করবি। আমি 'হীন' আমি 'হীন' বলতে বলতে মানুষ হীন হ'য়ে যায়। আহার, চাল-চলন, ভাব ও

ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হ'বে—সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হ'বে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হ'বে—যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণ-স্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে দেশের লোক survive করতে পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতটা মিশে যাবে।" (১)

মানুষকে পাপী বলা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই—ইহাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ! দুর্ব্বল মানব অসংখ্য ভ্রম করিতে পারে। কিন্তু সে যখন অনুতপ্ত হয় শ্রীভগবান্ তাহাকে ক্ষমা করেন—তাহাকে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করেন না! খৃষ্টানির অনুকরণে বাঙ্গালার ব্রাহ্মসমাজ এই পাপ-বাদ প্রচার করিয়া যখন মানুষকে আশাহীন ও সাহসহীন করিয়া তুলিতেছিল তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ। এসব বুঝি খৃষ্টানী মত?……আমি তাঁর নাম করেছি,—ঈশ্বর, কি রাম, কি হরি বলেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।" শ্রীমাকে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি মুক্ত এ কথা বলতে বলতে সে মুক্ত হ'য়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' একথা বলতে বলতে সে ব্যক্তি বদ্ধই রয়ে যায়। যে কেবল বলে—'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই প'ড়ে যায়।"

যুবক নরেন্দ্রনাথের মনের তেজ এমনই ছিল যে, কোনও লোকেরই [illegible]ন কথা তিনি মানিতেন না—ঠাকুরের কথা পর্য্যন্ত নহে! এতই প্রবল ছিল তাঁহার আত্মপ্রত্যয়। ঠাকুর তাই বলিতেন—"নরেন্দ্র তাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না।…আমারই অপেক্ষা রাখে না।" নরেন্দ্র-

(১) স্বামি-শিষ্যসংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নাথের এই তেজস্বিতা সাধারণের চক্ষে নিন্দনীয় হইয়া উঠিল। লোকে বলিত—নরেন্দ্রনাথ দাম্ভিক ও উদ্ধত! নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত সত্যপ্রিয়। মিথ্যার গা ঘেঁষিয়াও তিনি চলিতেন না। একদিন হোটেলে আহার করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন—"মশায় আজ হোটেলে, সাধারণে যাহাকে অখাদ্য বলে, তাহাই খাইয়া আসিয়াছি।" ঠাকুর বুঝিলেন, নরেন্দ্রের ঐ কথা বলিবার কারণ—"তাঁহাকে স্পর্শ করিতে বা তাঁহার (ঠাকুরের) গৃহস্থিত ঘটি-বাটি প্রভৃতি পাত্রসকল ব্যবহার করিতে দিতে যদি তাঁহার (ঠাকুরের) আপত্তি থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিবেন।...ঐরূপ বুঝিয়া বলিলেন—'তোর তাহাতে দোষ লাগিবে না; শোর-গরু খাইয়া যদি কেহ ভগবানে মন রাখে, তাহা হইলে উহা হবিষ্যান্নের তুল্য,—আর শাক-পাতা খাইয়া যদি বিষয়-বাসনায় ডুবে থাকে, তাহা হইলে উহা শোর-গরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে।" (১) সাধারণ লোকে না বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথের কঠোর সত্যপ্রিয়তাকে মিথ্যার ভাণ অথবা অপরিণত বুদ্ধির নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিত। কিন্তু ঠাকুর জানিতেন নরেন্দ্রনাথ কি এবং কে, তাই বলিতেন—"নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না!—যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বল্‌তে-কইতে, আবার তেমনি ধর্ম্মবিষয়ে। সে রাত ভোর ধ্যান করে, ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে সকাল হ'য়ে যায়, হুঁস্ থাকে না। আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ টং টং করচে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কাণ টিপে কোনও রকমে দুই তিনটা পাশ করেছে, বাস্, এই পর্য্যন্ত। ঐ কর্‌তেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ — শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহোদয়।

নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে খেলে সব কাজ করে—পাশ-করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়,—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে ব'সে তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?" (১)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—"নরেন্দ্রের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানসিক শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ বিশাল আত্মবিশ্বাস হইতে সমুদিত হয়, তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বাধীনাচরণ তাঁহার স্বাভাবিক আত্মসংযমের পরিচায়ক ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাঁহার লোকমান্যে উদাসীনতা তদীয় পূত স্বভাবের আত্মপ্রসাদ হইতেই সমুত্থিত হইয়া থাকে। তিনি (ঠাকুর) বুঝিয়াছিলেন, কালে নরেন্দ্রের অসাধারণ স্বভাব সহস্রদল কমলের ন্যায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া নিজ অনুপম গৌরব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।" (২)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র-চরিত্র এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন। কাশীপুর-বাগানে একদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন—'আমাকে নির্ব্বিকল্প সমাধির অধিকারী করিতেই হইবে। আমি দিবানিশা সেই সমাধিতে মগ্ন থাকিতে চাই—এ সংসার আর আমার ভাল লাগে না। জীবনরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এক একবার নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিব, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া রহিব।'—নরেন্দ্রনাথ জানিতেন সাধনার এই চরম ফল অন্যের নিকট যতই কেন দুষ্প্রাপ্য না হউক, উহা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুষ্টিমধ্যে নিবদ্ধ। তিনি স্পর্শ মাত্রেই, দৃষ্টি মাত্রেই, ইঙ্গিত মাত্রেই যাহাকে-তাহাকে এই

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

(২) ঐ

পরম ধনের অধিকারী করিতে পারেন। ঠাকুরের অসম্মতি দেখিয়া নরেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ঠাকুর অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন—"ধিক্ তোকে নরেন্! তোর একটু লজ্জা হ'লো না!—এত বড় আধার তুই, আর তুই কি না নিজের জন্য এই তুচ্ছ বস্তুটি চাইলি! আমি মনে করেছিলাম তুই একটা বৃহৎ অশ্বত্থ বা বট—তোর ছায়ায় ব'সে শত শত আর্ত্ত নর-নারী শান্তি পাবে। কোথায় তুই তারই জন্য প্রস্তুত হবি—না নিজের মুক্তির পথ খুঁজ্‌ছিস্। নরেন্ এসব ছোট-খাটো লাভের দিকে আসিস্ না! তুই কেন এক-ঘেয়ে হবি? জানিস্ ত, আমি বহুভাবে শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করি। তুইও তাই কর্—জ্ঞানী হ', ভক্তও হ'! শত সহস্র নর-নারীর মধ্যে নারায়ণকে লাভ কর, আবার সমাধিমগ্ন হ'য়ে ব্রহ্মেও বিলীন হ'!"

নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, পরম দয়াল ঠাকুর তাঁহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি দিতে কাতর নহেন—কিন্তু লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অন্তরের মন্দির যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন তিনি যে ব্রহ্মে বিলুপ্ত হইয়া রহিবেন, ঠাকুর তাহা চাহেন না! রাজপুত্র কি শেষে ভিখারীর মত মুক্তি-ভিক্ষা লইয়াই তুষ্ট থাকিবে? ইহাই ছিল ঠাকুরের ভাব।

তখনকার মত নরেন্দ্রনাথ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু নরেন্দ্র চাহিয়াছেন—তাঁহাকে ত ঠাকুরের কিছুই অদেয় ছিল না—সেই নরেন্দ্র রিক্ত হস্তে ফিরিয়া গেল দেখিয়া ঠাকুরের কোমল প্রাণে ব্যথা বাজিল। ইহারও কয়েকদিন পর নরেন্দ্রনাথ একদিন কাশীপুর-বাগানে পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিতে, করিতেই অকস্মাৎ সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল একটী দুর্জ্জয় জ্যোতিঃ-তরঙ্গ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—তাঁহার মন সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। মন ঊর্দ্ধে-ঊর্দ্ধে-ঊর্দ্ধে ছুটিতে লাগিল—আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররাজি পলকে অন্ধকারে

লুকাইল—আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল—বিশ্ব যেন গড়াইতে গড়াইতে কোথায় সরিয়া গেল, আর সম্মুখে প্রকাশিত হইল সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর অনন্ত ভগবানের অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্র—অন্য যাহা কিছু ছিল সবই যেন মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল! আমিত্ব-বোধ পর্য্যন্ত তখন আর রহিল না। সেই অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি মানবের ভাষায় কিরূপে প্রকাশিত হইতে পারে—যে উহা পাইয়াছে সে-ই শুধু জানে উহা কি, আর হে দয়াল স্বামি! তুমি জানাও যারে সে-ই জানে—শুধু সে-ই জানে!

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত যখন নরেন্দ্রনাথের চৈতন্য ফিরিল না তখন অন্যান্য ভক্ত ও সেবকগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। কাশীপুর-বাগানে একটা ঘোরতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল—হায় হায় নরেন্দ্রনাথ বুঝি সহসা মরিয়া গেল! কিছুক্ষণ পর সুপ্তোত্থিতের মত নরেন্দ্রনাথ পার্শ্ববর্ত্তী গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন—"গোপালদা, গোপালদা, আমার দেহ কোথায় গেল? হাত-পা-চোখ মুখ?"

তাহার পরই সব নীরব—স্থির—বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য শূন্য—নয়ন-পলক-হীন—দেহ শ্বাস-প্রশ্বাসহীন হইয়া গেল!

সকলের মুখেই তখন এক কথা—হায় হায়! নরেন্ কি মরিয়া গেল—নরেন্ কি মরিয়া গেল!

দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে ঠাকুর রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। অতি সাবধানে তাঁহার নিকট সকল সমাচার নিবেদন করিলে, তিনি একটু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন—"থাকৃতে দাও, অমনি থাকৃতে দাও। সমাধি সমাধি ব'লে নরেন্ আমাকে হায়রান্ ক'রে তুলেছিল। (১)

(১) The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern and Wester Disciples, Vol. 1.

নরেন্দ্রনাথের সমাধি ভঙ্গ হইলে পর ঠাকুর স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন—'মা আজ তোকে সব দেখিয়ে দিয়েছে। ধন-রত্ন যেমন সিন্ধুকে বন্ধ থাকে—এই সমাধির সৌভাগ্যও আজ থেকে চাবি দেওয়া রৈল। এখন আর পাবি না! আমার অনেক কাজ তোকে করতে হবে—নরেন্! আগে সেই কাজগুলো শেষ কর্—তারপর যোগ্য-কালে সিন্ধুক খোলা পাবি!'

* * * * *

এই ঘটনার পর কয়েক মাস চলিয়া গেল। ঠাকুরের গলরোগ কিছুতেই কমিল না। ঠাকুর যে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার—সাধারণ মনুষ্য নহেন, অনেক ভক্ত তখন তাহাই বিশ্বাস করিতেন। ঠাকুর নিজেও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ইঙ্গিত করিতেন। অনেকেই ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করিল, করিলেন না কেবল নরেন্দ্রনাথ! তিনি কহিলেন—ঠাকুর ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত মহা-মানব—ঠাকুর দেব-নর—কিন্তু ঠাকুর যে ভগবানের অবতার ইহা আমার মন মানিতে চাহে না! তিনি কহিলেন—"এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable creation ও Animal creation—এদের মাঝামাঝি এমন একটি point আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী, স্থির করা ভারি কঠিন—সেইরূপ Man-world ও God-world এই দুইয়ের মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন—এই ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।" (১)

অন্তরে একটি তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ভক্তগণ দিবারাত্রি ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রী-মার মৌন-সেবা—কাশীপুর-বাগানকে মহামহিমময় করিয়া তুলিল। দলে দলে লোকে

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

আসিয়া ঠাকুরের চরণ দর্শন করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল— সকলেই বুঝিল সোনার চাঁদ এখন অস্তাচলগামী হইয়াছেন! (১)

একদিন—তখন ঠাকুরের বাক্‌-শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে—কথা বলিতে বিশেষ কষ্ট হয়—নরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া ঠাকুর তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একখানি কাগজ তাঁহাকে দিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল —নরেন্দ্রনাথ অন্য ভক্তদের শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদের ভার গ্রহণ করিবেন। নরেন্দ্রনাথ রোদন করিতে করিতে বলিলেন—'না-না, আমি তাহা পারিব না।' ঠাকুর অতিশয় কষ্টে কহিলেন—"তোর হাড় পারিবে আমার যোগ-সিদ্ধি তোর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হ'য়ে তোকে শক্তি দিবে।"

ইহার পর আরও কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল। ঠাকুর নরেন্দ্র-নাথকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—"একটু ধ্যান কর্‌।" নরেন্দ্র সেই নির্জ্জন কক্ষে ধ্যানের সম্রাটের সম্মুখে ধ্যানে বসিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা হারাইলেন! ধ্যান হইতে যখন ব্যুত্থিত হইলেন তখন নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন—সেই ভাঙ্গা শরীর যেন সহসা আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনার চোখে জল কেন?"

ঠাকুর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"নরেন্—নরেন্। আজ

(১) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি শেষবার আলমোড়ায় গমন করিয়াছিলেন এবং [illegible] কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পীড়ার বিষয় বলিয়াছিলেন। কেমন করিয়া [illegible] নরেন্দ্রনাথ [illegible] সাংঘাতিক ও সংক্রামক [illegible] জীবন। [illegible] এই সব কথা হইয়াছিল।" স্বামী বিবেকানন্দ-[illegible]

আমি সত্য সত্যই ফকির হ'লাম—একেবারে কপর্দ্দকহীন কাঙ্গাল! আমার যাহা কিছু শক্তি ছিল আজ সব তোকে দান করলাম। এরই বলে তুই পৃথীবিতে নানা মহৎ কার্য্য সাধন করবি। কাজ শেষ হ'লে তুই ধরাধাম ছাড়তে পারবি—তার আগে নয়!"

নরেন্দ্রনাথ আকুল হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অলৌকিক-প্রতিভাসম্পন্ন প্রখর তার্কিক নরেন্দ্রনাথের মুখে কোনও কথা ফুটিল না! লোকে, যেমন লোককে একটা সুন্দর ফুল তুলিয়া উপহার দেয়—ঠাকুরও তেমনি নরেন্দ্রনাথকে উপহার দিলেন। কি দিলেন? দিলেন বুঝি তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠাতা মা কালীকেই! এতদিন সেই কালীই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ,—এখন শয্যায় পড়িয়া রহিল চর্ম্মে আচ্ছাদিত কয়েকখানি অস্থি মাত্র! আর সেই নবীন সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথের হৃদি-পদ্মের উপর শক্তিময়ী মা আসিয়া অসি হস্তে দাঁড়াইলেন। (১)

ইহার পর দুই দিন চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন মধ্যরাত্রিতে বাঙ্গালায় দীপ-নির্ব্বাণের মর্ম্মন্তুদ বেদনা-মাখা চরম মুহূর্ত্তটি সেই কক্ষের দ্বারে আসিয়া দেখা দিল। ভক্ত ও সেবক, যাঁহারা সেই শব তুল্য দেহখানি ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন, অশ্রুর পর অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া তাঁহাদের চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের পর কতকগুলি বিষাদমাখা মুহূর্ত্ত কোন্ পথে চলিয়া গেল কেহ বুঝিতে পারিল না! নরেন্দ্রনাথ তখন ভাবিতেছিলেন—মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এখন যদি ঠাকুর বলেন, তিনি অবতার—আমি মানিব এবং জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত সেই বিশ্বাসকেই সবলে ধরিয়া থাকিব!

(১) পরবর্ত্তীকালে স্বামীজি তাঁহার শিষ্য শরৎচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"* * ঐ যে ঠাকুর তাঁকে—'কালী' 'কালী' ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু' তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে, সেইটেই আমাকে এদিক্ ওদিক্ কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—স্থির হ'য়ে থাকতে দেয় না! আপনার সুখের দিকে একটুও চাইতে দেয় না।"—স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু।

নরেন্দ্রের মনের কথা মনে থাকিতে থাকিতেই ঠাকুর অতিশয় বেদনা-কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—"নরেন্! নরেন্—!" তাহার পর অতিশয় সুস্পষ্ট ভাবে বলিলেন—"এখনও অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ—ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণ। বেদান্তের মায়া নহে—সত্য সত্যই রামকৃষ্ণ!"

পরক্ষণেই স্তিমিত প্রদীপ নিবিয়া গেল! (১৬ই আগষ্ট—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ—রবিবার)!

বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ পরাজয়ের গৌরবে বজ্রাহতের মত বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়ন-মন-জীবন গুরুদেবের চরণযুগল জড়াইয়া রহিল!

(৫)

বরাহনগরের মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব দেহ ভস্মীভূত হইলে পর ভক্তগণ সেই অমূল্য চিতাভস্ম একটি তাম্র-কলসে রক্ষা করিলেন। চিতাভস্মের অধিকার লইয়া গৃহস্থ-ভক্ত ও সন্ন্যাসী-ভক্তদিগের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ গুরু-ভ্রাতাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া গৃহীদিগের হস্তে তাম্র-কলস অর্পণ করিলেন। পরে সকলেই শুনিয়াছিলেন যে, দেহ-রক্ষার পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখা দিয়াছিলেন এবং জীবিতকালেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুই আমায় যেখানে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাবো ও থাকবো। তা' গাছ-তলায়ই কি, আর কুটীরই কি!" যাঁহারা গৈরিক [illegible] করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর [illegible] অভাবে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন—কেহ বা তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইলেন। যে কয়েকজন সঙ্কল্প করিলেন—তাঁহারা সন্ন্যাসীই থাকিবেন, [illegible] অন্তর্ধানের পর বরাহনগরে ভূতের-বাড়ী বলিয়া পরিত্যক্ত একটি ভগ্ন জীর্ণ ও বাসের অযোগ্য বাটি ভাড়া লইয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ

স্থাপন করিলেন। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত (১৮৮৬—১৮৯২ খৃষ্টাব্দ) সেই খানেই মঠ ছিল, পরে উহা আলমবাজারে উঠিয়া যায় (১৮৯২—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ দেহাবশেষ ভক্তগণ গোপনে একটি কৌটায় রক্ষা করিয়াছিলেন, উহাই তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে স্থাপিত হইল এবং ঠাকুরের মূর্ত্তি-পূজার ব্যবস্থা হইল।

মঠবাসীদের তখন তীব্র বৈরাগ্য—তাঁহাদের প্রাণ-পাখী হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ তখন তাঁহাদিগকে পক্ষপুটে আবৃত করিয়া রাখিলেন। তীব্র তপস্যা ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠে সকলের দিন কাটিতে লাগিল। শিব ও সেবা—ইহাই তখন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় ছিল। সন্ন্যাসীরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ভদ্র সন্তান—কলেজের কৃতী-ছাত্র। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী তখন কাহারও-কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিল! তাঁহারা সংসারের সকল প্রলোভন, সকল ভোগ ও সুখ ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের জয় বলিতে বলিতে সন্ন্যাসব্রত পালন করিতে লাগিলেন। রাজনগরী কলিকাতা তখন ইহাদিগের কোনও সংবাদ রাখিত না—প্রতিবেশী-গৃহস্থ-বালকগণ ইহাদিগকে দেখিলেই তখন নানারূপ ব্যঙ্গ করিত! কেহ তখন বুঝিতে পারে নাই যে, মাত্র দ্বাদশ বর্ষের পরই ইহারা জগৎ-জয় করিবেন এবং বৃহত্তর ভারতে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

'ওম্ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া নরেন্দ্রনাথ নিজেকে ঠাকুরের চরণে অর্পণ করিয়া গুরু-ভ্রাতাদিগকে কহিলেন—'বল ভাই—জয় রামকৃষ্ণ। আজ থেকে মানুষ তৈরি করা আমাদের জীবনের ব্রত হোক্—এইটিই হোক্—আমাদের একমাত্র সাধনা। এসো আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে নিজ নিজ জীবনে সফল করি এবং বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দি!"

সন্ন্যাসীরও আহার এবং বসনের প্রয়োজন হয়—কিন্তু তাঁহারা পথ

করিলেন, সেজন্য কোনও আত্মীয়ের দ্বারস্থ হইবেন না। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন—“প্রথম কয়েক মাস কাহারও কাছ থেকে কোনও দ্রব্যাদি লওয়া হইত না। সকলে মুষ্টিভিক্ষা ক’রে কিছু চা’ল আন্‌ত। তাহা একটা হাণ্ডাতে সিদ্ধ করা হ’ত। আর নুণ লঙ্কা আর একটা হাঁড়িতে সিদ্ধ করা হ’ত। কখন-কখনও তাতে তেলাকুঁচার পাতাও কুচিয়ে দেওয়া হ’ত। এই হ’ল ভাত—আর এই হ’ল তরকারি। তারপর সেই ভাতগুলো একটা কাপড়ে ঢেলে, সকলে চারিদিক ঘিরে বস্‌ত এবং সেই লঙ্কাজলের একটা বাটি ভাতের গাদার উপর থাকৃত। একবার ক’রে ভাত মুখে দিত, আর একবার লঙ্কার জল মুখে দিত। জিভ্‌টা জ্ব’লে উঠ্‌লে ভাতটা নেবে যেত। আর জল খাবার জন্য একটা মাত্র পিতলের হিন্দুস্থানী ঘটি ছিল, তাইতে সকলে জল খেত।…আমিও দু’একবার এই লঙ্কার জল আর ভাত খেয়েছিলুম।”

আহারের ব্যবস্থা যেমন ছিল, শয়নের ব্যবস্থাও ছিল অনুরূপ। বিছানার মধ্যে সম্বল ছিল চ্যাটাই এবং তাহারই উপর “সুতা বার করা” একখানি সতরঞ্চি। শক্ত ইঁট উপাধানের কার্য্য করিত। মশার অত্যন্ত উৎপাত বলিয়া মঠে একটি মশারি ছিল। রাত্রে গায়ে লেপ-কম্বল কিছুই ছিল না।……শীতকালে গায়ে ঠাণ্ডা লাগ্‌লে, পরস্পর ঘেঁষা-ঘেঁষি ক’রে শুতো। তাতেও শীত না ভাঙ্গলে খানিকক্ষণ কুস্তি, ল’ড়ে নিত।” পরে খানকতক কম্বল ও কয়েকটি খেরোর বালিশ হইয়াছিল।

“প্রথমে সকলের এক একখানি ক’রে কাপড় ছিল, আর জোড়া কতক চটি জুতা ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে পায়ে জুতা দেওয়া সকলে ত্যাগ করিলেন—শুধু পায়ে বেড়াইতেন। তারপর কাপড় দুটুকরা ক’রে বহির্ব্বাস করিয়া পরিতে লাগিলেন এবং ভিতরে একটা ক’রে কৌপীন থাকিত। ক্রমে, বহির্ব্বাস ছিঁড়িয়া যাইল। [illegible]খানা

বহির্ব্বাসে ঠেকিল। যিনি বাড়ীর বাহিরে যাইতেন, তিনি কৌপীনের উপর একখানা বহির্ব্বাস প'রে বেরুতেন; কিন্তু যাঁহারা ভিতরে থাকিতেন, তাঁহারা কৌপীন পরিয়াই থাকিতেন। অবশেষে কৌপীনও ছিঁড়িয়া গেল! মহা বৈরাগ্য—কাউকে কিছু ফুটিবেন না বা বলিবেন না। এই জন্যই অনেকেই বাড়ীর ভিতর কৌপীন পরাও ছাড়িয়া দিলেন।......তখনকার দিনে ঈশ্বর লাভই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য – আর বাকী সব জিনিসই ছিল তুচ্ছ।"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণই যেন আবার স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি লইয়া বরাহনগর এবং আলমবাজার মঠে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। মঠের কোন্ দিক দিয়া দিনের আলোক প্রবেশ করিয়া, দিন-শেষে কোন্ পথে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর বা মন সন্ন্যাসি-দিগের তখন ছিল না। বেদ, পুরাণ, উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইংরাজি সাহিত্য ও সঙ্গে সঙ্গে জপ, ধ্যান, পূজা, কীর্ত্তনে তাঁহাদিগের সকল সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন দিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-মূলে ধুনি জ্বালাইয়া, কোন দিন বা বরাহনগরের মহাশ্মশানে তাঁহারা তপস্যা করিতে লাগিলেন। ধূলা-কাদা লাগিয়া দেহ যে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার কেশ যে জটা বাঁধিতেছে, অনাহারে এবং অল্পাহারে দেহ যে দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে—কে তাহার খোঁজ লয়! এ সকলই ত অনিত্য—আজ আছে কাল নাই! কিন্তু জীবন গেলে ত এ জীবনে ভগবান্ লাভ করা আর হইল না। তাঁহাদের কর্ণে সর্ব্বক্ষণ বজ্রের মত বাজিতে লাগিল ঠাকুর বলিয়াছেন—যেমন করিয়াই হউক এই জীবনে ঈশ্বরকে পাইতে হইবে. তাহার পর অন্য চিন্তা এবং অন্য কাজ!

(১) [illegible] দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা)।

এখন হইতে আমরা নরেন্দ্রনাথকে স্বামীজি বলিব, কারণ মঠস্থাপনের পরই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—আর নরেন্দ্রনাথ ছিলেন না।

মোটামুটি মঠের ব্যবস্থা করিয়া এবং যে কয়েকজন গুরুভ্রাতা গৃহে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আবার সন্ন্যাসাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়া স্বামীজি একাকী তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। পণ ছিল আপনা হইতেই যদি কিছু জুটে তবে তাহাই আহার করিবেন এবং যথাসম্ভব পদব্রজে পথ চলিবেন! আলমবাজার হইতে হিমালয়ে এবং হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারী—স্বামীজি ভারতের নানা তীর্থে ও নানা নগরে গমন করিলেন এবং নানা গিরিগুহায় কিংবা কাননতুল্য নির্জ্জন স্থানে কতই না তপস্যা করিলেন; এমন দিন কত গেল যখন ক্রমান্বয়ে তিন চারি দিন খাদ্যই জুটিল না! কখনও বা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, কিংবা কোনও ভগ্ন জীর্ণ দেবালয়ে দিবস-রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। কোন কোন সময়ে উন্মুক্ত আকাশতল তাঁহার আশ্রয় হইল, শিশিরসম্পাতের কালে বৃক্ষতল তাঁহার কুটীর হইল! এমনও দিন গেল যখন মধ্যাহ্ন-তপনতাপে তপ্ত মরুভূমিতেই বিশ্রাম করিতে হইল! (১)

(১) ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বক্তৃতায় স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"আমি কতবার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়াছি। কতদিন অনাহারে যাপন করিয়া পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছি—গাছের তলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।...... কিন্তু শেষে হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে—'আমার আবার মৃত্যুভয় কি? আমার জন্মও নাই মরণও নাই। ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। সোঽহং সোঽহং। প্রকৃতি আমায় নষ্ট করিতে পারে না, প্রকৃতি ত আমার দাসী। হে মহেশ্বর, তোমার শক্তি প্রকাশ কর, হৃতরাজ্য পুনর্জয় কর—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।' অমনি আমার দেহে প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছে [illegible] আসিয়াছে, হৃদয়ে সাহস দেখা দিয়াছে, মনে তেজ বাড়িয়াছে...... অমনি সকল বিপদ [illegible] গিয়াছে। বাস্তবিক সকলই স্বপ্ন—পর্বতপ্রমাণ বিপদ হউক বা কেন, ভয় পাইও না—দেখিবে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে—আঘাত কর, দেখিবে অবলুপ্ত হইয়াছে—পাহাড় কুড়, দেখিবে চূর্ণ হইয়াছে।" [illegible] স্বামীজি বলিতেন,—জড়ের উপর চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা। অতএব বলের আধার চৈতন্যের নিকট [illegible] একান্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তিনি সর্বদা বলিতেন—শক্তি চাই, শক্তি [illegible] ......[illegible] বাক্য [illegible]। তাঁহার প্রত্যেক [illegible]।" ([illegible])—স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথ নাথ বসু।

ভ্রমণ করিতে করিতে একবার স্বামীজির ইচ্ছা হইল গির্ণারের সুবিখ্যাত মহাপুরুষ গাজিপুরে অবস্থিত পাওহারি-বাবার নিকট দীক্ষা লইবেন, কারণ বাবার দেবোপম চরিত্র ও হঠ-যোগে সিদ্ধি তাঁহাকে খুবই আকর্ষণ করিয়াছিল! বাবাজির আশ্রমের সন্নিকটে আসিয়া স্বামীজি ব্যাকুল হইয়া সাক্ষাতের জন্য একটি নির্জ্জন লেবু-বাগানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্রমে যাইবার জন্য যখনই যাত্রা করেন তখনই সম্মুখে দেখেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সজলনেত্রে দণ্ডায়মান! সেই জলভারাক্রান্ত নয়ন দুইটিতে তখন ছিল কত ব্যথা—কত আকুলতা! পাওহারী বাবা, না রামকৃষ্ণ?—এই সমস্যা তখন এমন জটিল হইয়া দেখা দিল যে, স্বামীজির আর বাবার আশ্রমে যাওয়া হইল না। একদিন নহে—দুইদিন নহে—শুনিতে পাই স্বামীজি একুশ দিন বাবার আশ্রমে যাত্রার সঙ্কল্প মাত্রেই এইভাবে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন! স্বামীজি শেষে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না—কাঁদিতে কাঁদিতে ভূতলে পতিত হইয়া ঠাকুরের দেবমূর্ত্তিকে কহিলেন—'প্রভু, প্রভু, মার্জ্জনা কর। জীবনে-মরণে আমি তোমারই কিঙ্কর। জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ!'

* * * * *

ইহার পর অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল—স্বামীজির প্রব্রজ্যা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতেই লাগিল। কত দার্শনিক, কত রাজনীতিবিৎ, নানা নগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তার্কিকেরা তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে তর্কে পরাজিত হইতে লাগিলেন! এইভাবে ভারতের রাজমুকুটধারী নৃপতি হইতে আরম্ভ করিয়া দীন দরিদ্রের সহিত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া স্বামীজি দিব্যচক্ষে দেখিলেন—ভারতের উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের জন্য দিনের পর দিন যে শৃঙ্খল রচনা করিয়াছিল

এবং এখনও দিনের পর দিন যে-ভাবে শৃঙ্খলটিকে পূর্ব্ববৎ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাই সমগ্র ভারতের বন্ধন-শৃঙ্খল। ধর্ম্মের আগার ভারতবর্ষ আর ধর্ম্ম চাহে না—চাহে সে তাহার চরণ-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া মুক্তির জীবন লাভ করিতে—বিধি-বিধান-লোকাচার ও সামাজিক দণ্ড যাহাদিগকে এতদিন ফুটিতে দেয় নাই, ভারত এখন তাহাদিগকেই ফুটাইয়া তুলিতে চাহে এবং সেইজন্যই চাহে স্বার্থশূন্য সেবা—দয়ার গান সে চাহে না!

ভারতসাগরের তরঙ্গবিধৌত কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যাননিমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভারতবর্ষকে দেখিতে লাগিলেন; সেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ভারত চলচ্চিত্রের মত তাঁহার হৃদয় যবনিকার উপর দিয়া একের পর এক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চিত্রনাট্যের শেষ দৃশ্য শেষ হইবার পূর্ব্বে স্বামীজি শুনিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত ভারত-মহাসাগর গভীর গর্জ্জন করিয়া কহিতেছে—"বিবেকানন্দ, তোমার বেদ-বেদান্ত, গীতা-উপনিষদ্ আমার গর্ভে নিক্ষেপ কর এবং যেখানে হইতে পার, যে দেশ হইতে পার ভারতের জন্য অন্ন আন। ওই শোন তোমার গুরুবাক্য—"খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।"

বেলুড়-মঠ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন "মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত।" ইহাদিগকে একদিন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া স্বামীজি [illegible]লেন—"এদের দেখ্‌লুম, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরল চিত্ত—এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।... [illegible] কিছু দুঃখ দূর কর্‌তে পারবি? নতুবা গেরুয়া প'রে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। [illegible] ইচ্ছা হয় মঠফঠ সব বিক্রী ক'রে দিই, এই সব গরীব দুঃখী, [illegible]

দের বিলিয়ে দিই। আমরা ত গাছতলা সার করেছি। আহা! দেশের লোক খেতে পর্‌তে পার্‌ছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুল্‌ছি? ওদেশে (আমেরিকায়) যখন গিয়েছিলুম—মাকে কত বল্লুম,—'মা! এখানে লোকে ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্ব্যচোষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ কর্‌ছে!—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে ম'রে যাচ্ছে—মা! তাদের কোন উপায় হবে না? ওদেশে ধর্ম্মপ্রচার কর্‌তে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এ দেশের লোকের জন্য যদি অন্ন-সংস্থান কর্‌তে পারি। দেশের লোকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখা-পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়-লোকদের বুঝিয়ে কড়ি-পাতি যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই। আহা! দেশের গরীব দুঃখীদের জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্চে—যে মেথর-মুদ্দফরাস্ একদিন কার্য্য বন্ধ কর্‌লে শহরে হাহাকার রব উঠে—হায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে!......দেশে কি আর দয়া-ধর্ম্ম আছে রে বাপ্! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মারো ঝেঁটা—মারো লাথি! ইচ্ছে হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন-দরিদ্র আছিস্' —ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা জাগ্‌বেন না।......রে সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখ্‌ছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার

না হ'লে, কোনও দেশ কোন্ কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস্—? একটা অঙ্গ প'ড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও, ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জানবি।" (১)

ভারত-ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া স্বামীজি যখন মান্দ্রাজে আসিলেন তখন সমস্ত দক্ষিণ-ভারত তাঁহার প্রশংসাবাদে মুখরিত হইতেছে। মান্দ্রাজের বন্ধুদিগের ও খেতড়ীর রাজার অনুরোধে ও অর্থানুকূল্যে তিনি মার্কিণ দেশের চিকাগো নগরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মমহাসম্মেলনে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মন তখনো দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্পটি গ্রহণ করিতে পারিল না! এইরূপ সংশয়াকুল চিত্তে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর মান্দ্রাজের সমুদ্র-তীর হইতে সাগরে নামিয়া তরঙ্গের শিরে শিরে পদক্ষেপ পূর্ব্বক হাঁটিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বলিতেছেন—"আর বিলম্ব কেন? এসো—চলে এসো!" স্বামীজি শ্রীশ্রী-মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্রের উত্তর আসিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল তিনি ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন।

"মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে (নরেন্দ্রনাথকে) শুধু যে ঠাকুরের প্রধান শিষ্য বলিয়াই স্নেহ করিতেন তাহা নহে, তিনি জানিতেন লীলা-পর ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন, কারণ ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার একদিন এইরূপ অদ্ভুত দর্শন হইয়াছিল—যেন ঠাকুর নরেন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিতেছেন।......এক্ষণে নরেন্দ্রের পত্র পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন।" নরেন্দ্র শ্রীশ্রীমাকে লিখিয়াছিলেন—মহাবীর যেমন রাম নাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের উপর লাফ দিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ঠাকুরের নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু।

চলিলাম।" পুত্রকে সমুদ্রপারে দূর বিদেশে যাইবার অনুমতি দিতে স্নেহময়ী জননীর হৃদয় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় তিনিও নরেন্দ্রনাথের ন্যায় স্বপ্নে দেখিলেন—"ঠাকুর যেন তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন।"

এই স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীশ্রী-মার হৃদয় শান্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রসন্ন-চিত্তে নরেন্দ্রনাথকে সমুদ্র-যাত্রার আদেশ দিলেন।

শ্রীশ্রী-মার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তিনি একাকীই হাসিতে লাগিলেন—নাচিতে লাগিলেন—আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। হর্ষোৎফুল্ল হৃদয় মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিল—'আর কেন বিলম্ব কর? অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—ওই শোনো প্রতীচী তোমাকে ডাকিতেছে—এসো এসো সন্ন্যাসি, জড়বাদীদের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা শোনাও—ভারতের জ্ঞানমঞ্জুষা হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি হীরক-কণক মণি-মরকত লইয়া বৃষ্টির ধারার মত বর্ষণ কর—অন্ধকার প্রতীচী আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।'

স্বামীজি তখন স্বামী বিবিদিষানন্দের পরিবর্ত্তে স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই নামেই পরিচিত থাকিয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। (৩১শে মে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ।)

স্বামীজি যে জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা কলোম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, ক্যান্টন, নাগাসাকি, কোবি, ইয়াকোহামা প্রভৃতি নানা বন্দরে ভিড়িতে ভিড়িতে চলিল। স্বামীজি সেই সকল স্থান দর্শন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পত্রাবলীতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইয়োকোহামা (জাপান) হইতে তিনি মাদ্রাজী বন্ধু-দিগকে লিখিয়াছিলেন—"......আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে

প্রতি বৎসর—চীন ও জাপানে যাক্।……জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ। কিন্তু তোমরা কি কচ্ছো? না, সারাজীবন কেবল বাজে বোক্‌চো। এসো, এদের দেখে যাও, তারপর লজ্জায় মুখ লুকাও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাহিরে গেলে তোমাদের জাত যায়—এমন আহাম্মোক্ জাত! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ব'সে আছ—হাজার বছর ধ'রে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার ক'রে শক্তি ক্ষয় কচ্ছো! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি!……এসো, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? দেশকে ভালবাস? তা' হ'লে এসো, ভাল হ'বার জন্য, উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করো। পেছোনে চেয়ো না—অতি নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জন কাঁদে কাঁদুক্, তবুও পেছোনে চেয়ো না—কেবল সাম্‌নে এগিয়ে যাও।……"

(৬)

জুলাই মাসের শেষভাগে চিকাগো নগরে আসিয়া স্বামীজি শুনিলেন বিশ্বধর্ম্মমহাসম্মেলন বসিতে আরও দেড় মাস বাকী। চিকাগো ক্রোড়পতিদেরই বিলাস-নগরী—নিরন্ন ভারতবাসীর জন্য নহে! তাঁহার সঙ্গে সামান্য অর্থ ছিল। তাহা জলের স্রোতের মত শেষ হইয়া যাইতে লাগিল! মহাসম্মেলনের বৈঠক পর্য্যন্ত সে অর্থ থাকিবে কি না তদ্বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। স্বামীজি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলেন, তিনি যে ভারতের কোনও একটি সুপরিচিত

ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতিনিধি, এরূপ পরিচয়পত্র না থাকিলে ধর্ম্মমহাসম্মেলনে কোনও কথা বলিবারই তাঁহার অধিকার হইবে না! শুধু ইহাই নহে—সভার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত তখন গত হইয়াছে! অন্য কেহ এইরূপ অবস্থায় পড়িলে একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইতেন কিন্তু স্বামীজি জানিতেন, শ্রীগুরুর আদেশ পাইয়া তিনি আমেরিকায় আসিয়াছেন; সে দেশে যদি তাঁহার কিছু করিবার থাকে গুরুদেবই তাহার পথ করিয়া দিবেন! তিনি ত প্রভুর কিঙ্কর মাত্র!

নানারূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া কোনও দিন অনাহারে, কোনও দিন অর্দ্ধাহারে—কোনও তুষারাচ্ছন্ন রজনী রেল-ষ্টেশনের বৃহৎকায় প্যাকিং-বাক্সের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া অপ্রত্যাশিত ও অপরিচিত আমেরিকান্ বন্ধুদিগের সাহায্যে শেষে স্বামীজি (১) মহাসম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। প্রাচ্য-সদস্যদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থলে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত তাঁহার থাকিবারও ব্যবস্থা হইল!

অতি বৃহৎ ও সুসজ্জিত সেই নয়নমনোহর অট্টালিকা আর্ট ইনষ্টিটিউট্। তাহারই একটা বিরাটকায় সভাগৃহে (Hall of Columbus) বিশ্বের মনীষা যেন সে দিন (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ) মিলিত হইয়াছিল। আভিজাত্য ও বিদ্যার গৌরবে শ্রেষ্ঠ, গণ্যমান্য প্রতিভা-সম্পন্ন ও অসাধারণ বাক্যবীর ছয় সাত সহস্র শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা দিবার জন্য মাত্র ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স্ক স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রথমবার

(১) স্বামীজি ১২ দিন চিকাগোতে থাকিয়া শেষে বোষ্টন্ নগরে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, কারণ সেখানে খরচ-পত্র কম। বোষ্টনে অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্ ভাষার অধ্যাপক—সুপ্রসিদ্ধ জে, এচ্, রাইট্ মহোদয় ছিলেন একজন। ধর্ম্মমহাসম্মেলনে যাহাতে স্বামীজি উপস্থিত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে ইনি এবং চিকাগোর মিসেস্ জর্জ, ডব্লিউ, হেল্ নাম্নী একটি সহৃদয় মহিলা সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনায় স্বামীজির দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, ঠাকুর অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন।

দাঁড়াইলেন! তাঁহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল! বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি বলিলেন—'এখন নহে —পরে।'

সর্ব্বনাশ! অন্যের মত তিনি ত কোনও লিখিত অভিভাষণ আনেন নাই—পূর্ব্বরাত্রে তিনি রেল-ষ্টেশনের প্যাকিং-বাক্সের মধ্যে অনাহারে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সুতরাং অভিভাষণ রচনা করিবারও ত সুযোগ ছিল না! যাহা হউক, বক্তৃতা করিবার জন্য যখন শেষবার তাঁহার ডাক পড়িল তখন মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া স্বামীজি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জপূর্ণ বদন, সুগঠিত দেহ, দীপ্তিমান্ নয়ন, সুবৃহৎ উষ্ণীষ ও উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের সুদীর্ঘ রেশমী আল্‌খাল্লা মুহূর্ত্তে শত শত কৌতূহলী চক্ষুকে আকর্ষণ করিল!

সেই মহাসভাকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজি ডাকিয়া কহিলেন—"আমেরিকার ভাই—বোন্‌গণ—!"

পরমুহূর্ত্তেই করতালি বাজিতে লাগিল—ঘন ঘন, আরও ঘন ঘন—আরও ঘন ঘন!

সেই সপ্ত সহস্র নর-নারী কি সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইল নাকি? তাহারা মুহূর্ত্তে আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। সপ্ত সহস্র নর-নারী যেন এক সঙ্গে পাগল হইয়া উঠিল!

কেন এরূপ হইয়াছিল? স্বামীজির সেই মমতা-মাখানো সম্ভাষণ—"আমেরিকার ভাই-বোন্‌গণ!"—ইহারই জন্য। পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বক্তা নানা-রূপে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—কিন্তু সে সকল সম্বোধনে প্রাণ ছিল না, একাত্মবোধ ছিল না—ছিল শুধু সাধারণ শিষ্টাচার মাত্র! আমেরিকান্‌গণ যে, সে সকল বক্তাদিগের আত্মীয় এ পরিচয় সে সকল সম্ভাষণে

ছিল না। কিন্তু একি আশ্চর্য্য—বর্ব্বর-হিন্দু-পৌত্তলিক-ধর্ম্মের একজন কৃষ্ণকায় প্রতিনিধি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতকায়দিগকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিলেন—আপনার করিয়া হৃদয়ের নিকটে লইলেন! তাই বক্তৃতার প্রারম্ভেই সভাগৃহ জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল!

স্বামীজি বলিতে আরম্ভ করিলেন—সে যেন অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের গলিত ধাতবস্রাব! বিশ্ব সেদিন সেই সভামণ্ডপে স্তম্ভিত হইয়া শুনিল যে, হিন্দুধর্ম্মের মত উদার ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আর নাই—বিশ্বপ্রেম যদি কোথাও থাকে তবে তাহা হিন্দুধর্ম্মেই আছে; সে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের জনক। উহা ঘোষণা করে—মত ধর্ম্ম নহে, মত ঈশ্বর নহে,—ঈশ্বরলাভ করিবার জন্য মত পথ মাত্র। ঈশ্বর অনাদি ও এক এবং তিনি সকলের। যিনি যে মতই কেন গ্রহণ না করুন, নিজে খাঁটি হইলে তিনি নিশ্চিতই শ্রীভগবান্‌কে পাইবেন। সকলেই সেই এক অমৃতের পুত্র-কন্যা—তাই তাহারা এক বৃহৎ-পরিবার-ভুক্ত ভ্রাতা-ভগ্নী। দেশ, কাল, সমাজ, মন্দির, মস্‌জিদ্, গির্জ্জা কোনও কিছুই তাহাদিগকে খণ্ডিত করিতে পারে না।

মার্কিণের সেই বিরাট ধর্ম্ম-সম্মেলনে দিনের পর দিন স্বামীজি অপূর্ব্ব ত্যাগের কথা শুনাইলেন—বিশ্বপ্রেমের কথা শুনাইলেন। কহিলেন—সত্যকার ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব বা কোনও বিরোধ নাই—উহা অনির্ব্বচনীয় শান্তির আধার। বেদান্ত-প্রতিপাদিত হিন্দুধর্ম্ম যে, শুধু সেই শান্তি ও প্রেমের বার্ত্তাই বহন করিয়া আনিতেছে, স্বামীজি বজ্রনির্ঘোষে তাহা প্রচার করিলেন। দিনের পর দিন শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া তাঁহার বাণী শুনিতে লাগিল এবং শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল যে, যে হিন্দুধর্ম্মকে তাহারা চূড়ান্ত গোঁড়ামীর গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ অনুদার ধর্ম্ম বলিয়া শুনিয়াছিল তাহা মোটেই গণ্ডীবদ্ধ নহে—সে ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় উদার—উহা বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করে। হিন্দুর ধর্ম্ম

তাহার উৎসবের পোষাক মাত্র নহে—উহা মানব মাত্রেই প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্ম ও চিন্তার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত—উহা জীবন-পথের আলোক, মৃত্যু-পথের সম্বল। মার্কিণীরা স্বামীজির মুখে সেই প্রথম বার শুনিল যে, জীবমাত্রেই শিব—সকলেই সেই মহান্ বিরাট্ অখণ্ড পরমাত্মার মন্দির—সকলের মধ্যেই সেই পরম দেবতা বিরাজ করিতেছেন—তাহারা শুনিল যে, এই সৃষ্টি আদি অন্তহীন—যে মহীয়সী শক্তি পলকে পলকে বিশ্ব প্রসব করিতেছেন তাঁহার না আছে হ্রাস, না আছে বৃদ্ধি। তিনি আদি-অন্তহীনা প্রকৃতি বা মায়া। আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বের আলোকে সমুজ্জ্বল অভিভাষণগুলিতে স্বামীজি দেখাইয়া দিলেন —সকল ধর্ম্মের বিজয়কেতনশিরে অনলের অক্ষরে সেই এক মন্ত্রই লিখিত আছে—"সমর নহে—সাহচর্য্য, বিনাশ নহে—বরণ, দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি।" কোনও 'একটা ধর্ম্মমতকে 'বিশ্বাস করি' বলিলেই ধর্ম্ম হয় না—ধর্ম্ম আছে অনুভূতিতে। বিশ্বাসকে বরণ করিয়া অগ্রসর হও—অভ্যাসের দ্বারায় মনে প্রাণে বোধ করিতে থাক—ক্রমে অনুভূতি আসুক্। যাহার অনুভূতি হইয়াছে, সে নিশ্চিতই ভগবান্‌কে পাইয়াছে, দর্শন করিয়াছে—তাঁহাকে আস্বাদন করিয়াছে—তিনি যে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার।"

মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় স্বামীজি বুঝাইয়া দিলেন যে, পরপদদলিত অবজ্ঞাত দীন-দরিদ্র ভারতের হিন্দু পারমার্থিক সম্পদে সম্রাট্—আচার্য্য হইবার যোগ্যতা যদি কোনও দেশের থাকে, তবে তাহা আছে শুধু ভারতের। ভারতের হিন্দুধর্ম্ম নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে বটে—দেখিলে মনে হইতে পারে যে, তাহারা পরস্পর বিরোধী—কিন্তু আসলে তাহা নহে—ইহাদের গোড়ার কথাটি এক। হিন্দুধর্ম্মের আরম্ভ বেদে—পরিণতি বেদান্তে। ইহা শুধু হিন্দুর ধর্ম্ম নহে—ইহা

মানবধর্ম—ইহা অখণ্ড ও সনাতন এবং সেইজন্য মানবমাত্রেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। যখনই ভাবি একজন নিঃসহায় বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীকে অবলম্বন করিয়াই প্রতীচ্যে বৈদিকধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক লুণ্ঠিত হইতে থাকে—কারণ তিনিই যে স্বামী বিবেকানন্দ। হর্ষে ও গর্ব্বে যখনই উচ্চারণ করি—'জয় বিবেকানন্দ'—মন তখনই শাসন করিয়া কহে, বল—'জয় বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—জয় জয় শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ!'

কয়েক দিন বক্তৃতা দেওয়ার ফলে স্বামীজি অনায়াসে আমেরিকার হৃদয় জয় করিলেন। চিকাগো নগরের নানা রাজপথে তাঁহার পূর্ণায়তন প্রতিকৃতি বিলম্বিত হইয়া গেল। চিত্রের পদতলে লিখিত হইল—'ভারতের হিন্দু-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।' মুগ্ধ নর-নারী পথ চলিতে চলিতে সেই চিত্রকে প্রণাম করিতে লাগিল! (১) বাঙ্গালার বিবেকানন্দ "ধর্ম্ম-জগতের মহাবীর" রূপে সম্পূজিত হইলেন—তাঁহার অভিভাষণগুলি "সুখশ্রাব্য সঙ্গীত"রূপে পরিগৃহীত হইল—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, এই সন্ন্যাসীর আকর্ষণী-শক্তি চুম্বকের ন্যায়—প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর নূতন আলোকদানের ও প্রতি কথায় জীবনী-সঞ্চারের ক্ষমতা অলোকসামান্য; বোষ্টন্ নগরের সংবাদপত্র (The Boston Evening Transcript) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"Vivekananda is really a great man, noble, simple, sincere and learned beyond comparison with most of our Scholars—আমাদের দেশের কম পাণ্ডিতই পাণ্ডিত্যে তাঁহার সহিত তুলিত হইতে পারেন।"

(১) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples.

অপরিচিত মার্কিনে শ্বেতাঙ্গ নহেন বলিয়া অনাদৃত, তথায় মাধুকরী করিতে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রত্যাখ্যাত ও কোথাও বা লাঞ্ছিত বিবেকানন্দ কয়েক দিনের বক্তৃতার পরই এমন সুপরিচিত ও সমাদৃত হইলেন যে, অতুল ধনের অধিকারিণী পরমা সুন্দরী একটি মার্কিণ-মহিলা একদিন আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি স্বামীজির চরণে তাঁহার জীবন, যৌবন ও ধন-রত্ন সবই লুটাইয়া দিতে আসিয়াছেন! স্বামীজি বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন—"ভদ্রে, আমি সন্ন্যাসী, জগতের নারী মাত্রেই আমার মা।"

ভারতের ও আমেরিকার ঈর্ষ্যান্বিত কোন-কোনো ব্যক্তি, বিশেষতঃ কতকগুলি ক্ষুদ্রচেতা পাদ্রী এবং বাঙ্গালার ব্রাহ্ম-সমাজেব নেতৃস্থানীয় কোনও প্রচারক স্বামীজির পথে যে সকল মিথ্যা বাধা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ইহার পর তাঁহাদিগকে অন্ধকারে মুখ লুকাইতে হইল। সত্যের আলোকস্পর্শে মিথ্যার অন্তর্দ্ধান ঘটিল। আমেরিকায় বেদান্তের বাণী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

মার্কিণের সুধীসমাজ স্বামীজির বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন দেখিয়া সে দেশের একটি লেক্‌চার-বুরোর আয়োজনে স্বামীজিকে আমেরিকার পূর্ব্ব ও মধ্য-পশ্চিম প্রদেশসমূহের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বহু বক্তৃতা দিতে হইল। মার্কিণীগণ বেদান্তের আশার বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং ভারতের "অরেঞ্জ মঙ্কের" কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল—শত শত পত্র-পত্রিকায় তাঁহার চিত্র প্রকাশিত হইল, তাঁহার কাহিনী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিলেন—বিবেকানন্দ একজন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ—নতুবা মানুষ এমন শক্তিধর হইতে পারে না। মার্কিণেব আকাশে-বাতাসে তখন স্বামীজির বাণী বাজিতে লাগিল—"হে জড়বাদি! সাবধান হও—সাবধান হও—নির্গুণ ব্রহ্মবস্তু লাভই মানবজীবনের

[illegible]। সেজন্য ত্যাগকে বরণ কর—ভোগকে বিসর্জ্জন দাও।” স্বামীজির একজন চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন—“এইরূপে এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি (স্বামীজি) আট্লাণ্টিকের উপকূল হইতে মিসিসিপি নদীর তীর পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশের প্রত্যেক প্রধান শহরে ঘুরিয়াছিলেন এবং অসংখ্য সাধারণ সভা ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য আহূত ক্ষুদ্র বৈঠকে বক্তৃতা ও লোকশিক্ষা দিয়াছিলেন।” (১)

স্বামীজি লিখিত-অভিভাষণ পাঠ করিতেন না—বক্তৃতা দিতে উঠিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য গুড্‌উইন্ সাহেব সাঙ্কেতিক-লিপির সাহায্যে স্বামীজির যে কয়েকটিমাত্র ভাষণ লিখিয়া লইয়াছিলেন, ধর্ম্মপিপাসু মানবের নিকট সেগুলি অমৃতের ভাণ্ডার রূপে বর্ত্তমান আছে। স্বামীজি যে শুধু একজন অসাধারণ বাগ্মীই ছিলেন তাহা নহে—মার্কিণীদের বুঝিতে বাকি রহিল না। যে, তিনি যেমন বাগ্মী, তেমনি জ্ঞানী ও তেমনি একজন সাধক ছিলেন। লোকে বিস্মিত হইয়া দেখিত যে, কোন একটি গভীর তত্ত্বালোচনা করিতে করিতেই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া যাইতেন। কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের পৃথিবীর সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্কই থাকিত না। ক্রমে অনেকে তাঁহার অনুগত হইয়া উঠিল—অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং যৌগিক নিয়ম পালন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ধ্যান ধারণা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার ‘কর্ম্মযোগ’, ‘রাজযোগ’ ও ‘ভক্তিযোগ’ বহু ভক্ত ও শিষ্যের নিত্য সাধনার সামগ্রী হইয়া উঠিল।

মার্কিণে বেদান্ত-ধর্ম্ম-প্রচারের অমানুষিক চেষ্টা সেখানে কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা তৎকালে লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

হইতেই অনায়াসে অনুমান করা চলে। স্বামীজির ইউরোপীয় ভক্ত স্বামী কৃপানন্দ ১৮৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখের "ব্রহ্মবাদিন্"-পত্রে লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মভাবের প্রবল স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জনসাধারণের মন হইতে আজন্মপোষিত ভ্রান্তি ও কুসংস্কাররাশি দূর হইয়া সত্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপে তাঁহার উপদেশ সমূহ শনৈঃ শনৈঃ সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার ও তাহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ-বিধান করিতেছে। বেদান্ত দর্শনের পাঠার্থিসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং যাহাদের মুখে কেহ কখনও সংস্কৃত শব্দ বা বাক্য শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই, সেই আমেরিকাবাসিগণ যখন-তখন ঐ সকল শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছে।······এবং হাক্সলি ও স্পেন্সারের ন্যায় রামানুজ ও শঙ্করাচার্য্যের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরিতেছে।" (১) "যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার অনুরাগী ভক্ত মাত্র ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এক্ষণে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" এই সময়ে স্বামীজিও কোন ভারতীয় বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—আমি আমেরিকান্ সভ্যতার মর্ম্মস্থলকে উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছি। বলাই বাহুল্য, যে মার্কিণে স্বামীজির সাফল্যের সংবাদ ভারতবর্ষে আসিবামাত্র কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত তাঁহার জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালাদেশে তখন যে জয়োল্লাসের উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন—যাঁহারা সে সময় কলিকাতার টাউনহলে বিরাট সভায় উপস্থিত ছিলেন—নিশ্চয়ই এখনও তাঁহারা সে কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেই মহতী সভায় সেকালের

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু

সুবিখ্যাত ভারতনেতা ও বাগ্মী নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন— "……আমরা কি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি? নতুবা চিকাগো নগরের ধর্ম্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অত্যদ্ভুত কৃতকার্য্যতা ও তৎপরে সমগ্র মার্কিণ দেশে তাঁহার কার্য্যাবলী কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহার সফলতায় হিন্দুজাতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহাকে তাহাদের বর্ত্তমান অন্ধকারময় ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল রেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কারণ উহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইয়াছে।……" (১)

১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ভারতের পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় কাল, কারণ এই সময়ই স্বামীজি নিউইয়র্ক নগরে স্থায়ীভাবে বেদান্ত সভা বা বেদান্ত সমিতি স্থাপিত করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই যাহাতে বেদান্তের উদারভাব মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করিতে পারা যায়, নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতিতে সেই বিষয়ের উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বামীজি ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে তখন তাঁহার লৌহ-কঠিন দেহও ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মার্কিণে নবজীবন আনয়ন করিবার জন্য স্বামীজি যে প্রাণপণ সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে— তাহা দেব-মানবেরই যোগ্য সাধনা। কিন্তু সেই তীব্র কর্ম্মব্যাকুলতার মধ্যেও তিনি ভারতকে ভুলিলেন না। তাঁহার যে সকল ভারতীয় ভক্ত ও শিষ্যবর্গ আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে অশক্ত হইয়া বারংবার তাঁহাকে লিখিতেছিলেন—'স্বামীজি দেশে আসুন, আর মার্কিণে থাকিয়া কাজ

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

নাই—', স্বামীজি জয়গর্ব্বিত বলদৃপ্ত দূরদর্শী সেনাপতির মত তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন—"আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর।···কিছুতে ভয় পাইও না—কোনও-কিছুর অপেক্ষা রাখিও না—সিংহের মত কাজ করিয়া যাও। We must rouse India and the whole World—ভারতকে জাগাইতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে জাগাইতে হইবে সমগ্র বিশ্বকে।"

তিনি মাদ্রাজের যুবকদিগকে লিখিলেন—"ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান্; আমি জানি তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন।······যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধাবতারে রাজপুরুষদিগের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বার-নারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাও—তাঁহার নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি,—তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন—সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

"······বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে—সম্মুখে! এইরূপেই আমরা অগ্রসর হইব,—একজন পড়িব,—আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।"

"আমাদের কার্য্য—কাজ করিয়া মরা—'কেন' প্রশ্ন করিবার অধিকার

আমাদের নাই। সাহস অবলম্বন কর। আমার দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখো।”

“ভয় ত্যাগ কর। প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন।”

“মনে করিও না আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে,—সাধুতাই-পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কি না।” (১)

এইভাবে দিনের পর দিন ভারতের যুবকবৃন্দের শিরায় শিরায় কর্ম্মের তড়িৎপ্রবাহ ছুটাইয়া এবং দিনের পর দিন মার্কিণকে বেদান্তের অভয়বাণী শুনাইয়া স্বামীজি ইংলণ্ডে আসিলেন এবং অচিরে কর্ম্মক্ষেত্র গঠন করিয়া লইলেন। কিরূপে সেই কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিল—কিরূপে তিনি ইংরাজ-জাতির মধ্যে একটি নবপ্রেরণা জাগ্রত করিলেন—কি ভাবে তাঁহার ভাবধারায় ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যন্ত গলিয়া গেলেন, সাধারণ নরনারীর ত কথাই ছিল না—স্বামীজির মার্কিণ-বিজয়ের কাহিনীর ন্যায় এ কাহিনীও একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। এই সময়েই মিস্ মূলার, মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল (ভগ্নী নিবেদিতা), মিঃ ষ্টার্ডি এবং মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার স্বামীজির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালের আরম্ভ হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্বামীজি প্রাণপাত করিয়া আমেরিকায় বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন এবং শত সহস্র অনুরাগী ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী লাভ করিলেন। বেদান্তসূত্র, গীতা, নারদ-ভক্তি-সূত্র, যোগদর্শন, কঠ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, অবধূত-গীতা প্রভৃতি নানা

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

বিষয়ের আলোচনা ও অধ্যাপনা করিতে করিতে স্বামীজি ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু নানা যোগজ শক্তির বিকাশ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে লাগিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমেরিকায় থাকিতে থাকিতেই তিনি একদিন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন।

আগষ্ট মাসে (১৮৯৫) প্রথম বার ইংলণ্ডে আসিয়া স্বামীজি দেখিলেন "আমেরিকার লোকে খুব আগ্রহের সহিত নূতন ভাব গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে ভাব তাহাদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের লোক যদিও সহজে নূতন মত গ্রহণ করিতে বা নূতন লোককে আমল দিতে চাহে না, তথাপি যদি একবার তাহা-দিগের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, কোন ভাব বা মত উত্তম, তবে তাহারা চিরদিনের জন্য সেটিকে গ্রহণ করিবে ও কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না।" (১)

যাহা হউক, লণ্ডনে পৌঁছিবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই স্বামীজি অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ভাস্কর যশোদীপ্তি দিকে দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা ও কথোপকথন লণ্ডনে এক নব চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিয়া দিল। গণ্যমান্য পরিবারের অনেক মহিলা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া বসিবার জন্য চেয়ার না পাইয়া ভূ-তলেই বসিয়া একমনে বক্তৃতা শুনিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। ক্রমে "ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ, বাছা-বাছা ক্লাব, সোসাইটি, সাধারণ নর-নারী, অভিজাতবর্গ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়—এমন কি ধর্ম্ম-যাজকেরা পর্য্যন্ত সাদরে" স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন ও

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 'হিন্দু যোগীকে' দেখিবার জন্য তখন চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিন মাস এইভাবে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বামীজি নিউইয়র্কে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় একটি স্থায়ী বেদান্ত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। আমেরিকার ধনৈশ্বর্য্য এবং বিদ্যাবৈভবের কেন্দ্র-স্থল নিউইয়র্ক। দেখিতে দেখিতে তথাকার ধনী ও পণ্ডিত-সমাজে স্বামীজির নাম "যাদুমন্ত্রের" মত কার্য্য করিতে লাগিল।

কয়েক মাস আমেরিকায় থাকিয়া স্বামীজি যখন দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসিলেন তখন দেখিলেন, তাঁহারই পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত শ্রীমৎ স্বামী সারদা-নন্দ মহারাজ কলিকাতা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছেন (১লা এপ্রিল, ১৮৯৬)। অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকার ন্যায় লণ্ডনেও 'ক্লাশ' খুলিয়া স্বামীজি 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শুধু ইহাই নহে—ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, বাহিরের মানুষ ও ভিতরের মানুষ, ভক্তি-যোগ, পরমাত্মা, ত্যাগধর্ম্ম, অপরোক্ষানুভূতি প্রভৃতি নানা জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অতিশয় প্রাঞ্জলভাষায় বক্তৃতা করিয়া তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিলেন।

লণ্ডনের কার্য্য যখন এইরূপে সুন্দরভাবে চলিতেছিল তখন স্বামীজি একদিন সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে নিউইয়র্কে আরব্ধ কার্য্য কতকটা শিথিল হইয়াছে। তিনি তখন এতই ক্লান্ত হইয়াছেন যে, আমেরিকায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তিনি স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে তথায় প্রেরণ করিয়া কিছুদিনের জন্য সকল কার্য্য হইতে অবসর লইলেন এবং ইউরোপের নানা স্থান দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুত জার্ম্মান্ পণ্ডিত পল্ ডয়সনের সহিত এই সময়ে স্বামীজির সাক্ষাৎ হয়।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে জগৎবরেণ্য আচার্য্য মোক্ষমূলরের আমন্ত্রণে শ্বামীজি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আজকাল শত সহস্র লোক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা করিতেছে।" আচার্য্য উত্তরে বলিয়াছিলেন—'ইহার মত লোককে যদি পূজা না করিবে, ত কাহাকে আর করিবে।'

ইউরোপ-ভ্রমণের পর লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া শ্বামীজি কিছুদিন আবার পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম সহকারে বেদান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। মায়া ও ভ্রান্তি, মায়া ও ঈশ্বরবাদের ক্রমবিকাশ, মায়া ও মুক্তি, ব্রহ্ম ও জগৎ, ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপীত্ব, বহুত্বের মধ্যে একত্ব, পরমাত্মার শ্বাধীনতা, বেদান্তের কার্য্যকারিতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে অতিশয় সারগর্ভ এবং মনোহর বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডের নর-নারীর হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিলেন—বলিলেন, ইউরোপ যদি অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করে তবেই তাহার মুক্তি সম্ভব। "মায়াবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে এক দিন এমনি হইয়াছিল যে, তাঁহার শ্রোতাদিগের সকলেরই দেহবোধ চলিয়া গিয়াছিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহারা যেন আত্মভাবে অবস্থান করিতেছেন মনে করিয়াছিলেন।" (১) এই সময়ে ইংলণ্ডের অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তিদিগের সহিত শ্বামীজির আলাপ-পরিচয় ঘটিল এবং "ইংলণ্ডের রাজকীয় ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যেও অনেকে শ্বামীজির ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ উপদেশাদিতে তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।"

(১) শ্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

শ্বামীজি তাঁহার শিষ্য শ্রীশরচ্চন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখ্, আমেরিকায় অবস্থান কালে আমার মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভিতর দেখে, তার মনের ভিতরটা সব বুঝতে পারতুম।...কে কি ভাবছে—না ভাবছে, করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হ'য়ে যেত।......যখন চিকাগো প্রভৃতি সহরে বক্তৃতা শুরু করলুম তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা বা তারও বেশী লেকচার দিতে

যে সময় স্বামীজি লণ্ডনে দ্বিতীয়বার আসিয়াছিলেন তাহার কিছুকাল পর স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তথায় ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে ভারতের Indian Mirror পত্রে লিখিয়াছিলেন (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮)—“……আমি একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি (স্বামীজি) এখানকার বহু ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন ও হৃদয়ের সম্প্রসারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবেই এখানকার অনেক লোক এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রনিহিত অদ্ভুত অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়াছে।…বিবেকানন্দের ধর্ম্মমতের বিস্তৃতি বশতঃ শত শত ব্যক্তি এখানে খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।……” (১)

হত ;……ভাব্‌তুম্—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা বল্‌ব ? নূতন ভাব আর যেন জুট্‌ত না। একদিন বক্তৃতার পরে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি, তাই ত এখন কি উপায় করা হয় ?……একটু তন্দ্রার মত এলো। সেই অবস্থায় শুন্‌তে পেলুম্, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কচ্ছে ; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে সব যেন ইহ জন্মে শুনিনি, ভাবিওনি। ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ ক'রে রাখ্‌লুম্ আর বক্তৃতায় তাই বল্লুম। এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নাই।”—স্বামি-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

[illegible]—“রামপ্রসাদের গান শুনিস্ নি ? তিনি বল্‌তেন, ‘এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।’ এইরূপ ‘অভি[illegible]র্বদা মনে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। তা' হলে আর হীনবুদ্ধি—হীন সাহস নিকটে আস্‌বে না। কখনও মনে দুর্ব্বলতা আস্‌তে দিবিনি।……ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজি নীচে (বেলুড়-মঠের নীচতলা) আসিলেন।……উপবিষ্ট হইয়াই তিনি শিষ্যকে উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—“এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। একে উপেক্ষা ক'রে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক্ তাদের। করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখ্‌তে পাচ্ছিস্-নে ?—এই—এই—!” এমন হৃদয়স্পর্শী-ভাবে স্বামীজি কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে ‘চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে !’—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই!……এই রূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইল……ক্রমে সকলের মনই আবার ‘আমি আমার’ রাজ্যে নামিয়া আসিল। (সেদিন) মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি সকলের মনগুলি সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।”……কিছুক্ষণ পরে……যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন—‘দেখ্‌লি, আজ কেমন হ'ল ? সবাইকে ধ্যানস্থ হ'তে হ'ল।……তুই বুঝি মনে করিস্—একটি জীবের বন্ধন থাক্‌তে তোর মুক্তি আছে ? যতকালে—যত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে—তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ।’—স্বামি-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(১) স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু। মূল পত্র—The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples.—Vol III.

বিদেশে লোকমান্য যতই বাড়িতে লাগিল, স্বামীজিও ততই আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে কহিতে লাগিলেন—'মা লোকমান্য হইতে আমাকে রক্ষা কর্—আমার বড় দুঃখী ভারত! তাহারই সেবায় আমাকে নিযুক্ত কর্—মানবের হিতসাধনের জন্য আমাকে সকলের কিঙ্কর করিয়া দে—!'

স্বামীজির তখন আর ইংলণ্ড ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহার প্রাণ তখন ভারতের দিকে ছুটিয়া চলিল। মন বলিতে লাগিল—'বিবেকানন্দ' ভারতে ফিরিয়া যাও—ভারতে ফিরিয়া যাও। ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। ভারতের মোহ দূর কর, ভারতের হিন্দুকে যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহাকে এই বেদান্তেরই আশ্রয় লইয়া ভয়শূন্য হইতে হইবে—ধর্ম্মই যে ভারতের জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড। "ভারতের জাতীয়-জীবনের কেন্দ্র রাজনীতি চর্চ্চায়, যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা শিল্পসমৃদ্ধিতে নহে—কিন্তু কেবল ধর্ম্মে।"

স্বামীজি আর অধিকদিন লণ্ডনে থাকিতে পারিলেন না। নবাগত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের উপর সকল কার্য্যভার অর্পণ করিয়া ভারত-মাতার হৃদয়-রত্ন মাতৃ-সেবার জন্য স্বদেশের দিকে ছুটিলেন। (১৮৯৬-নভেম্বর)।

স্বামীজি ভারতে আসিলেন—দিগ্বিজয়ী নৃপতি যেন বিজয়গৌরবে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রথমে সিংহলে (জানুয়ারি, ১৮৯৭) এবং তাহার পর দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানে এবং শেষে কলিকাতায় যে ভাবে তিনি অভ্যর্থিত হইলেন, সর্ব্বত্যাগের প্রভায় ভাস্বর গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর পক্ষেই সেরূপ সম্বর্দ্ধনা পাইবার সম্ভাবনা—রাজমুকুটধারীর পক্ষে তাহা একান্তই দুষ্প্রাপ্য, কারণ মানুষ মানুষকে সেরূপে আবাহন করিতে পারে না—দেবতাকে বা দেবমানবকেই শুধু পারে। রামনাদের

নৃপতি তাই সেদিন শত শত সঙ্গীসহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বামীজির শকট টানিয়া লইয়া চলিলেন—লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু যেমন আজিও শ্রীশ্রীজগবন্ধুর রথ টানিয়া জীবন সফল করে, ঠিক সেইরূপ। শত-কণ্ঠের বিপুল জয়নিনাদ সেদিন আকাশে ছুটিয়া পবনে ভাসিয়া ভারত-সাগরের জলভঙ্গরবের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। রামেশ্বরের সুপ্রাচীন ও অতি বৃহৎ শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া সকলের চলিষ্ণু-দেবতা বিবেকানন্দ বজ্রকণ্ঠে কহিলেন—মন্দিরের পাষাণ-কারায় যে শিব আবদ্ধ আছেন, তাঁহার অর্চ্চনা শুধু সেই একটিমাত্র বিগ্রহের অর্চ্চনা নহে—শত শত দীন দরিদ্র আতুরের মধ্যে জীবরূপী যে শিব বিরাজ করিতেছেন—উহা তাঁহাদেরই অর্চ্চনা! আত্মবিস্মৃত ভারতের হিন্দুর কর্ণে সেই শুভ মুহূর্ত্তে মঙ্গলবিধায়ক শিবপূজার এই প্রাচীন মন্ত্র আবার এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল—শ্রীশ্রীরামেশ্বর যেন সেদিন বহু-বহু-বহুরূপ ধারণ করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্ম্মকেন্দ্র কুম্ভকোনমে বেদান্তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি মনোমুগ্ধকর অভিভাষণ দান কালে স্বামীজি কহিলেন—"হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু জাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে, হয়ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারত-মাতার সকল সন্তানেরই প্রাণপণে এই সকল ছিদ্র বন্ধ ও পোতের জীর্ণ সংস্কার করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

স্বামীজি এই জীর্ণ-সংস্কারেরই পক্ষপাতী ছিলেন—ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া আবার নূতন করিয়া যাহারা গঠন করিতে চাহে—স্বামীজি তাহাদিগের সেই মতের বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্রোহ করিতেন। ভারতের

হিন্দুসমাজ তাহার সনাতন গৌরব হারাইয়া নানা বিষয়ে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বামীজি সেই মলিনতাকে দূর করিবার প্রয়াসী ছিলেন—সমাজের চিরাচরিত বিশুদ্ধ রীতি-নীতিগুলিকে রক্ষা করিয়া আবর্জ্জনা দূর করাকেই তিনি প্রধান সংস্কাররূপে গণ্য করিতেন। পূজা এবং অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়েও তাঁহার মত অনেকটা এইরূপই ছিল। কিন্তু শাস্ত্রমর্য্যাদা যাহাতে তিলমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় তেমন কার্য্য তিনি নিজেও করেন নাই এবং অপরকেও করিতে নিষেধ করিতেন। কালী·ঘাটে গিয়া গঙ্গাস্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জগজ্জননীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আদেশ ছিল যে, মঠে ঠাকুর-পূজা করিতে গিয়া বেশী তাড়াতাড়ি করিয়া সংক্ষেপে কেহ পূজা সারিতে পারিবেন না; আবার অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ বিধি-নিয়ম পালন করিতে যাইয়া পূজায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি বলিতেন —হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দাও এবং সরল প্রাণে ভগবান্‌কে স্মরণ-মনন কর—তাঁহার শ্রীচরণে নিজেকে একান্তে বিলাইয়া দাও—তাঁহার শরণ লও। ইহাই সত্যকার পূজা। এইভাবে পূজা করিতে পারিলেই ভগবানের কৃপা লাভ হয়। "দ্বিধাশূন্য হ'য়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা"—স্বামীজি বলিতেন—"এই হচ্ছে secret of success, নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।···খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ-ঝম্প ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল।···কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে! দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখ্‌বি খোল করতালই বাজ্‌ছে। ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তূরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলে-বেলা থেকে মেয়ে-মানুষি বাজনা

শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে?...ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভি-নাদ তুল্‌তে হবে, মহাবীর মহাবীর ধ্বনিতে এবং হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করতে হ'বে।"—ইহাই হইতেছে স্বামীজির সংস্কারের একটি দৃষ্টান্ত।

তিনি ছিলেন ঋষিবাক্যে ও শাস্ত্রে একান্ত আস্থাবান্। তাই বলিতেন—"আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাসনের ঠিক্ ঠিক্ প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার আর স্ত্রী-আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্র-ফাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না, প'ড়ে সেই মত সমাজকে চালাতে চায়?...... সর্ব্বত্রই শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে। লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার,—এই এখন সর্ব্বত্র স্মৃতি শাস্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কে কা'র কথা শুন্‌ছে?..... সেজন্যই আমি চাই—বেদের প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চ্চা করাতে ও সর্ব্বত্র বেদের শাসন চালাতে।......তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মত শাস্ত্রপথ ধ'রে চল্।......নিজেরা শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে দেশে শ্রদ্ধা আনয়ন কর্।...ভয়ইত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে।......ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ রূপ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে দধীচি মুনির মত পরার্থে হাড় মাস্ দান কর্।" (১)

আচার-বিচার সম্বন্ধে এক সময়ে স্বামীজিকে বলিতে শুনি—"আচার-বিচার কেবল মানুষের ভিতরের মহাশক্তি স্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভিতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পারে, তাই হচ্ছে সর্ব্ব শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধি-নিষেধাত্মক।

(১) স্বামি-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হ'বে? যে দেশে যাই, দেখি—উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নাই। ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। অনুভূতিই হচ্ছে সার কথা।......যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধি নিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি রিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?" অতএব মূল কথা হচ্ছে অনুভূতি।......কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির Test —কষ্টিপাথর!" (১)

স্বামীজি দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করিতেন যে, বেদান্ত-প্রচারের দ্বারাই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধিত হইবে। কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটার-গৃহে "Vedanta in all its phases" (সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত) সম্বন্ধে তিনি যে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারও সার কথা উহাই। ঠাকুরের কথা তুলিয়া তিনি বলিতেন—"ভাবের ঘরে যেন চুরি থাকে না—কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সেই ভাবকে সর্ব্বদা প্রকাশ করা চাই—নতুবা শুধু Theoryতে Theoryতে (মতবাদে মতবাদে) দেশটা উচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-ধারা প্রচার করিবার জন্য বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ সংস্থাপিত করিয়া স্বামীজি জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত এই মন্ত্রই ঘোষণা করিয়া গেলেন—"ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।" [illegible]কে বার বার কহিলেন—'আত্মনো মোক্ষার্থায় জগদ্ধিতায় চ" এই হচ্চে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাসী না হ'লে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে না—একথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ

(১) স্বামি-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হবো—তাদের কথা আদতে নিবিনে। ও-সব প্রচ্ছন্ন-ভোগীদের স্তোক বাক্য।······ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়।······সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কাহারও মুক্তি হয় না।" (১)

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন্ যে দিন ভক্ত বলরামবাবুর বাটীতে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় (১লা মে, ১৮৯৭) সেদিন প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে আহূত সভার অন্তে স্বামী যোগানন্দ মহারাজ স্বামীজিকে বলিলেন—"সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, লোকের উপকার কবিব এরূপ অভিমান করা এ সব বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উদ্দেশ্য কি এরূপ ছিল ?" শুধু একা স্বামী যোগানন্দ নহেন, সে সময়ে মিশনেব আবও কতিপয় সন্ন্যাসিবৃন্দেরও এইরূপ ধাবণা ছিল যে, শুধু পূজা-পাঠ, ধ্যান-জপ ইহাই ঠাকুরের একমাত্র উপদেশ। এই সকল কার্য্যের বাহিরে গেলেই তাঁহার উপদেশ পালন কবা হইল না। যোগানন্দ স্বামীর কথা শুনিয়া স্বামীজি কহিলেন—"তুই কি ক'রে জান্লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয় ? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডীতে বদ্ধ ক'রে রাখ্তে চাস্। তা' হ'বে না। আমি এ গণ্ডি-ফণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পূজা প্রচার কর্তে বলেননি! ধ্যান ধারণা আর ধর্ম্মের যে সব উঁচু উঁচু কথা আমাদের তিনি শিখিয়ে গেছেন, সেইগুলি উপলব্ধি ক'রে জগৎকে শিক্ষা দি'তে হ'বে। মনে করিস্নি আমি আর একটা নূতন দল কর্তে বসেছি।"

কিছুকাল পর সন্ন্যাসিদিগের ভ্রম দূর হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিলেন ঠাকুরই বলিয়া গিয়াছেন, 'যত্র জীব তত্র শিব'—'জীবভাবে শিব সেবা'—'যত মত তত পথ' ইত্যাদি। সুতরাং খুব প্রয়োজনীয় হইলেও ধ্যান

(১) স্বামী-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জপই ভগবৎ আরাধনার একমাত্র পথ নহে। স্বামীজি বলিতেন—"তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কষ্ট করিলেই তপস্যা করা হয়। কর্ম্মযোগীরা কর্ম্মকেই তপস্যার অঙ্গ বলে।······পরের জন্য কাজ কর্‌তে কর্‌তে পরা-তপস্যার ফল—চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শন হয়।"

স্বামীজিকে প্রশ্ন করিয়া শিষ্য বলিলেন—"কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে কয়জন পারে?

স্বামীজি বলিলেন—"তপস্যাতেই বা কয়জনের মন যায়? ·····যেমন সাধন-ভজন অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে তাতে একটা রোক্ জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ কর্‌তে কর্‌তে হৃদয় ক্রমে তাইতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝ্‌লি?"

শিষ্য কহিলেন—"কিন্তু মহাশয় পরহিতের প্রয়োজন কি?"

উত্তর হইল—"নিজ হিতের জন্য। এই দেহটা, যাতে 'আমি' অভিমান ক'রে বসে আছিস্, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাব্‌তে গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাব্‌বি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এইরূপ কর্ম্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে আস্‌বে, তখন তোরই আত্মা সর্ব্ব-জীবে, সর্ব্বঘটে বিরাজমান, এ তত্ত্ব দেখ্‌তে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এ-ও জান্‌বি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। ··[illegible]পরার্থে সেবাপর হ'তে হ'তে সাধকের জীবন্মুক্তি অবস্থা ঘটে।"

স্বামীজি যে দুই তিন মাস কলিকাতায় রহিলেন, দণ্ডেকের জন্যও তাঁহার বিশ্রাম করা ঘটিল না—লোকে বিশ্রাম করিতে দিল না! ক্রমেই তাঁহার দেহের বল কমিতেছে দেখিয়া চিকিৎসকদিগের উপদেশ মত তিনি আল্‌মোড়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ যেই

প্রচারিত হইয়া পড়িল অমনি সেই বিপুল সম্বর্দ্ধনার আয়োজন, লোকের সেই ভিড়—সেই সভা—সেই বক্তৃতা সকলই আবার সমানভাবে চলিতে লাগিল! সার্দ্ধ দুই মাস কাল আল্‌মোড়ায় কাটাইয়া স্বামীজি উত্তর-ভারত ভ্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন। উত্তর ভারতে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই ছিল হিন্দিতে। হিন্দি যাঁহাদিগের মাতৃভাষা তাঁহারা পর্য্যন্ত সেই সকল বক্তৃতা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন! তাঁহারা সেই প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, হিন্দিতেও গুরুতর বিষয় লইয়া বক্তৃতা দেওয়া চলে! এতদিন সকলেই জানিতেন যে, স্বামীজির বাগ্মিতা ইংরাজি ভাষাতেই নিবদ্ধ—কিন্তু এখন তাঁহারা দেখিলেন যে, হিন্দি ভাষাও তাঁহার কণ্ঠাগ্রে সপ্তস্বরা বীণার মত ঝঙ্কার দিয়া উঠে! (১) উত্তর-ভারতের নানা স্থানে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া স্বামীজি পূর্ব্ববৎ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ধ্যান, ধারণা, ব্রহ্মচারীদিগকে শিক্ষাদান—অধ্যয়ন ও সঙ্কীর্ত্তনাদির ভিতর দিয়া নিজের এবং ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। সে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণমঠও আলমবাজার হইতে বেলুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় উঠিয়া আসিল। ক্রমে বেলুড়ে ৪৫ বিঘা ভূমি ক্রয় করা হইল। ভূমি ক্রয় করিতে যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন হইয়াছিল স্বামীজির ভক্ত মিস্ হেন্‌রিয়েটা এফ্ মুলার তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (২)

(১) The power and life that he put into the Hindi language was so unique that the Maharaja of Kashmir requested him to write several papers in that language, which he did and presented them to him.—The Life of Swami Vivekananda by his Eastern & Western Disciples, Vol III.

(২) The Life of Swami Vivekananda by his Eastern & Western Disciples—Vol III.

জমী ক্রয় করিবার প্রায় এক বৎসর পর বেলুড়ে গৃহাদি নির্ম্মিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির-নির্ম্মাণ এবং মঠের সন্ন্যাসিদিগের বাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বামীজির ভক্ত শিষ্যা মিসেস্ ওলিবুল্ বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মঠে কিছুদিন বাস করিয়া স্বামীজি শিষ্যগণ সহ পুনরায় উত্তরভারত ভ্রমণে যাত্রা করিলেন এবং নানা নগর ও তীর্থাদি দর্শন করিয়া তুষারাবৃত হিমালয়ের কুক্ষি মধ্যে অবস্থিত অমরনাথ দর্শনে অগ্রসর হইলেন। তীর্থে গেলেই তীর্থকর্ত্তব্য যথারীতি পালন করিয়া তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্র-নির্দ্দেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। পূর্ব্বাহ্ণে গঙ্গাস্নান করিয়া ফল-ফুল লইয়া অভুক্ত অবস্থায় পূজাদি সম্পন্ন করা এবং পূজা শেষ হইলে বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম, মালা জপ, শ্রীমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি তীর্থকৃত্য যথা-নিয়মে পালন করিয়া তিনি সঙ্গীদিগের সম্মুখে ভক্তির একটি জীবন্ত আদর্শ সংস্থাপন করিতেন। "তিনি গড়া জিনিষ ভাঙ্গিতে ভালবাসিতেন না। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে ভাবে, যে সকল আচরণ বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোটি কোটি হিন্দুর ধর্ম্ম-জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তিনি অত্যাবশ্যক মনে করিতেন।......(তিনি জানিতেন) যাঁহারা চরম অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বাহ্য পূজাদি বিশেষ উপযোগী।"

হিমালয়ের অত্যুচ্চ তুষারধবল একটি শৃঙ্গে শ্রীশ্রীঅমরনাথের গুহা-মন্দির। এত শীত সেখানে যে, দেহের শোণিত জমাট বাঁধিতে চাহে। সেই দারুণ শীতে তুষার অপেক্ষাও শীতল গিরিনদীর জলে অবগাহন স্নান করিয়া স্বামীজি ভস্মলিপ্ত নগ্নদেহে কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। আহা মরি মরি! বিগ্রহের কি সুন্দর

অমল ধবল পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় তুষার-লিঙ্গ রূপ ! সে রূপ দেখিয়া স্বামীজি আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। শত শত ভক্তের কণ্ঠ হইতে তখন নাদ উত্থিত হইতেছিল—হর হর বম্ বম্—! স্বামীজি সেই নাদতরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন। (১) পরে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন—"স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন।" (২)

অমরনাথ হইতে শ্রীনগরে অবতরণ করিয়া স্বামীজি অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন অন্তর্লীন অবস্থায় নির্জ্জনে থাকিতেন এবং কখনও বা শিষ্যদিগকে উপদেশচ্ছলে বলিতেন—"হিন্দু ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় না হইয়া সক্রিয় হউক এবং ছুঁৎমার্গকে পরিহার করুক্।......ভারতের এখন চাই কর্ম্মতৎপরতা, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতন চিন্তাশীলতাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। চাই উভয়ের সম্মিলন" এবং সমন্বয়। তিনি বলিতেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সমন্বয় সাধন করিয়া যে অপূর্ব্ব আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহাই "সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং অকাশের ন্যায় উদার" হওয়ার আদর্শ। (৩)

কাশ্মীরে কিছুদিন শিব-ভাবের মধ্যে দিবস রজনী লীন থাকিতে

(১) The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern & Western Disciples—Vol III.

(২) ঐ

(৩)......As usual, he instructed his disciples with reference to India...... dilating in particular upon 'the inclusiveness of his conception of the country and its religions, of his own longing to make Hinduism active and aggressive, a missionary faith, having the gigantic strength of true orthodoxy; but barring its degeneracy into don't-touchism'......'To be as deep as the ocean and as broad as the sky', he said quoting Sri Ramkrishna, 'was the ideal.'—The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples—Vol III.

থাকিতেই স্বামীজির অন্তর শক্তিভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন—"ভীমার উপাসনা দ্বারাই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর: লোলরসনা করালিনীকে ধ্যান কর। মা-ই স্বয়-ব্রহ্ম। তাঁর অভিশাপও আশীর্ব্বাদ। হৃদয়টাকে শ্মশান করিয়া ফেল—তবে মার দেখা পাইবে।" বলিতেন—"তিনিই ইন্দ্রিয়, তিনিই দুঃখ (Pain), আবার তিনিই দুঃখ দিচ্ছেন। কালী—কালী—কালী। ভয় ত্যাগ কর। কিসের ভয়? ভিক্ষা নয়—জোর ক'রে নিতে হ'বে। যারা প্রকৃত মার ভক্ত, তারা পাথরের মত শক্ত—সিংহের মত নির্ভীক। বিশ্ব-সংসার যদি সহসা রেণু রেণু হ'য়ে পায়ের তলায় চূর্ণ হয়ে পড়ে, তবুও ভক্ত টলে না। মাকে তোমার কথা শুন্‌তে বাধ্য কর। মার কাছে আবার খোসামোদ কি? জোর! জেনো, তিনি অমিত-শক্তিশালিনী—তিনি সব কর্‌তে পারেন। নোড়া-নুড়ীর ভেতর থেকেও মহাবীর্য্যবানের সৃষ্টি কর্‌তে পারেন। যে হৃদয়ে ভয় নেই, সেইখানেই তিনি আছেন। যেখানে ত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—সেইখানেই মা।" (১) অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত মাতৃভাবের সাধনায় স্বামীজি একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি যে দিকে চাহিতেন সেই দিকেই দেখিতেন মা—মা—শুধু মা—কালী করালবদনী শিবহৃদি-বিহারিণী মা! তিনি যেন একটি অতি বৃহৎ ছায়ারূপিনী—নগ্নিকা—কারণ জীবন-মৃত্যুর শত প্রহেলিকাকে নয়নের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছেন। আর ঐ দেখ মার চরণতলে নিত্যকালের শিব—মঙ্গল ও পবিত্রতার আধার—শ্বেতবর্ণ—কালোর দাগটি শূন্য! ভীমার অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ—মুখে ডাকিতেছেন

(১) ঐ এবং স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

মা—মা—মা! পরমাত্মার সঙ্গে শ্রীভগবানের একান্ত মিলনে তখন হৃদয়ে মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া মাতৃ-ভাবের অমৃতহ্রদে নিরন্তর বিচরণ করিতে করিতে স্বামীজি একদিন তাঁহার 'হাউস্-বোট্' ত্যাগ করিয়া ক্ষীরভবানীর বিধ্বস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে কয়েকদিন সেখানে ছিলেন প্রত্যহই হোম করিতেন এবং এক মণ দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তণ্ডুল, বাদাম প্রভৃতি দিয়া সেই পায়সের ভোগ দিতেন। নিরন্তর মালা জপ ও ধ্যানে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। একটি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যাকে তিনি প্রত্যহই 'উমা-কুমারী' জ্ঞানে ভক্তিভরে পূজাও করিতেন। যেদিন শ্রীনগরে ফিরিলেন সেদিন সঙ্গিগণ দেখিলেন, অপার্থিব জ্যোতিঃতে তাঁহার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়াছে। সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি কোমলকণ্ঠে কহিলেন—'আর হরি ওম্ নয়—আর হরি ওম্ নয়। এখন শুধু মা-মা-মা। আমাতে আর এখন অন্য কিছু নাই। আমি ক্ষীরভবানীর মন্দিরে ব'সে ভাব্‌ছিলুম্—হায় হায়, বিধর্ম্মীরা এমন ক'রে এই মন্দির ধ্বংস ক'রে দিয়ে গেছে, আমি যদি থাক্‌তুম্ কিছুতেই এমনটা হ'তে পার্‌তো না। আমি মন্দির বাঁচাতে প্রাণ দিতুম্। তখনই দৈববাণী হ'লো—'বৎস! ওকি বল্‌ছ? তুমি আমাকে রক্ষা কর্‌বে, না আমিই তোমাকে রক্ষা কর্‌বো? বিধর্ম্মীরা আমার মন্দির ধ্বংস করুক্ না—তাতে কি আসে যায়! আমি যদি মনে করি এখনই এখানে সপ্ততল স্বর্ণমন্দির শির উত্তোলন কর্‌বে! (১) আমি বুঝলুম্—মা-ই সব। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

(১) শুনিতে পাওয়া যায়, ক্ষীরভবানীর মন্দিরে তপস্যাকালে স্বামীজি অনেক গুহ্য কথা দৈব-বাণী-রূপে শুনিয়াছিলেন। সে সকল কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে।—The Life of the Swami Vivekananda—By his Eastern and Western Disciples.—Vol III.

কাশ্মীর হইতে বাঙ্গালায় ফিবিয়া আসিয়া স্বামীজি বেলুড়ে মঠ স্থাপিত করিলেন (১৮৯৮, ৯ই ডিসেম্বব)। আবার পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রাধ্যাপন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি চলিতে লাগিল। হাঁপানী রোগে শরীর যে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে সেজন্য অপব সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেও স্বামীজির কোন উদ্বেগ ছিল না! তাঁহার মন সর্ব্বদা অন্তর্মুখী হইয়াই থাকিত এবং উচ্চভাবভূমিতে বিচরণ করিত। এক দিন জপ-ধ্যান প্রভৃতি প্রসঙ্গে বলিলেন—"ফেলে দে তোর সে ভক্তি-শাস্ত্র যে বলে—বেশী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না! বৈবাগ্য! বিষয়ে বিতৃষ্ণা না হ'লে, কাক-বিষ্ঠাব ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না কবলে, 'ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি",—ব্রহ্মাব কোটীকল্পেও জীবের মুক্তি নাই! জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল তীব্র বৈবাগ্য আন্‌বাব জন্য। তা' যার হয় নি, তাব জান্‌বি নোঙ্গর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানার মত হচ্ছে!"

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চন ত্যাগ হলেই কি সব হোলো?"

স্বামীজি বলিলেন—"ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক ল্যাঠা আছেন! এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা যে-সে লোক সাম্‌লাতে পারে না! লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে।...এই যে মঠ-ফট কর্‌ছি, নানা রকমের পরার্থে কাজ ক'রে সুখ্যাতি হচ্ছে—কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আস্‌তে হয়!"

শিষ্য ভীতকণ্ঠে কহিলেন—"তবে আমরা আর যাই কোথায়!" সিংহবিক্রমে স্বামীজি উত্তর দিলেন—"সংসারে রয়েছিস্‌, তাতে ভয় কি? "অভীরভীরভী"—ভয় ত্যাগ কর্‌, নাগ মশায়কে দেখেছিস্‌ ত? সংসারে

থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়া।...নাগ মশায়কে ঠাকুর বল্‌তেন—'জলন্ত আগুন।"

ভারতে সাম্প্রদায়িক ভাব এত প্রবল কেন একদিন তাহা লইয়া কথা উঠিতেই স্বামীজি কহিলেন—"End (উদ্দেশ্য) বড়, কি Means (উপায়) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য হ'তে উপায় কখনও বড় হ'তে পারে না। কেন না, অধিকারি-ভেদে একই উদ্দেশ্য লাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখ্‌ছিস্ জপ, ধ্যান—পূজা, হোম ইত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ—এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য।...একজন হয়ত হরিনাম জপ ক'রে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈরী হ'ল—'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" কেউ আবার 'আল্লা' ব'লে সিদ্ধ হলেন, তখনি আর একমত চল্‌তে লাগ্‌ল।... এইরূপে সব দল বেঁধেছে। আমাদের এখন দেখ্‌তে হ'বে, এই সকল জপ, পূজাদির খেঁই (আরম্ভ) কোথায়? সে খেঁই হচ্ছে শ্রদ্ধা।... নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে-কোন তত্ত্ব হোক্ না, ভাব্‌তে থাকলেই দেখ্‌তে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অনুভূতির দিকে যাচ্ছে। (ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে —সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব; চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান; আর আনন্দ বা প্রেম।...যাহা চিৎ তাহাই আনন্দ)। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আন্‌বার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। যুগ-পরম্পরায় বিকৃতভাব ধারণ ক'রে সেই সকল মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে।...পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হয়েছে। আর বিচারহীন সাধারণ জীব ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ ক'রে মরছে। খেঁই হারিয়ে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।"

শিষ্য কহিলেন—"মহাশয় তবে এখন উপায় কি ?" উত্তর হইল—"পূর্ব্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আন্‌তে হ'বে। আগাছাগুলো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হ'বে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জ্জনা প'ড়ে গেছে। সেগুলি সাফ্ ক'রে ঠিক্ ঠিক্ তত্ত্বগুলি লোকের সাম্‌নে ধর্‌তে হ'বে; তবেই···ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গল হ'বে।"

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে!"

স্বামীজি বলিলেন—"কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাঁদেব লোকের কাছে Ideal (আদর্শ বা ইষ্ট) রূপে খাড়া কর্‌তে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি? বৃন্দাবন-লীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তি পূজা চালা।"

শিষ্য।—"কেন? বৃন্দাবন-লীলা মন্দ কি?"

স্বামীজি।—"এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হ'বে না। বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য্য এবং স্বার্থ-গন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ ক'রে সকল বিষয় ঠিক্ ঠিক্ জান্‌বার জন্য উঠে প'ড়ে লাগা।······"

শিষ্য।—"কিন্তু মহাশয়,······ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ত সকলকে লইয়া সংকীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ করতেন?"

স্বামীজি।—"তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে কি জীবের তুলনা হয়? তিনি ত সব মত সাধন ক'রে দেখিয়েছেন, সকলগুলিই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়।······"

শিষ্য—"আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁকে অবতার ব'লে মানেন কি ?"

স্বামীজি—"তোর অবতার কথার মানেটা কি ?"

শিষ্য—"কেন ? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের ন্যায় পুরুষ।"

স্বামীজি—"তুই যাঁদের নাম কর্‌লি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা ত ছোট কথা—জানি…… সময় ও সমাজ-উপযোগী এক এক মহাপুরুষ আসেন—ধর্ম্ম উদ্ধার কর্‌তে ;……তাঁরা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন কর্‌বার Ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান্‌। যিনি যখন আসেন, তখন তাঁর ছাঁচে গঠন চল্‌তে থাকে, মানুষ তৈরী হয় ও সম্প্রদায় চল্‌তে থাকে। কালে ঐ সকল সম্প্রদায় বিকৃত হ'লে আবার অন্য সংস্কারক আসেন ; এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আস্‌ছে।"

শিষ্য—"তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেন না কেন ?"

স্বামীজি—"তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে, আমার ভয় হয়, পাছে সত্যের অপলাপ হয়। পাছে আমার এই অল্প শক্তিতে না কুলোয় ; বড় কর্‌তে গিয়ে, তাঁর ছবি আমার চক্ষে এঁকে, তাঁকে পাছে ছোট ক'রে ফেলি !" (১)

ভক্তির প্রবল ফল্গুধারা স্বামীজির অন্তরকে সর্ব্বদা পরিপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু মোহগ্রস্ত ভারতবর্ষকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি ভক্তির বাঁশরী নীরব রাখিয়া নিরন্তর কর্ম্মের বিষাণ নিনাদ করিতেন।

(১) স্বামি-শিষ্য সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বলিতেন—"আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে—বুদ্ধিমান্ লোক এ দেখে কি স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারে? কান্না পায় না?"

সাধু নাগ মহাশয়কে তিনি বলিয়াছিলেন—"এখন আমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে জাগান, সমস্ত দেশটা বৃহৎ অজগরের মত আপনার শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন মরেই গেছে। যদি একবার কোনরূপে তাকে জাগিয়ে তার সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবে বুঝ্‌বো ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয়নি! শুধু এই একটি মাত্র ইচ্ছে আছে—মুক্তি-ফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ! আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হই!"

নাগ মহাশয়েব সহিত সাক্ষাতের অল্পদিন পরই স্বামীজি আবাব সমুদ্রযাত্রা করিলেন। চিকিৎসকগণ কহিলেন উহাতেই শরীর সবল ও রোগমুক্ত হইবে। যাইবার সময় মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে বলিয়া গেলেন—"সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভয় করিবে না। পবের জন্য নিজ জীবন তুচ্ছ করিবে। সংসারী লোক ভালবাসে বাঁচিতে, সন্ন্যাসীকে ভালবাসিতে হইবে মৃত্যু। ......উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই?

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

...মরিতেই যখন হইবে তখন কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত [illegible]ই কি শ্রেয়ঃ নহে?"

মুখে মুখে এই উপদেশ দিয়াই যে স্বামীজি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—নিজ জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিনও পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া কার্য্যে দেখাইয়াছিলেন—মৃত্যুর মধ্যেই অমরত্ব নিহিত আছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজকে সঙ্গে করিয়া রুগ্ন দেহে ইউরোপ যাত্রা কবিয়া

তিনি জাহাজের উপরও একটি দিন বিশ্রাম করিলেন না—ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের দর্শন, ভারতের সাহিত্য, ভারতের ইতিহাস এবং মানব-সভ্যতায় ভারতের অবদান প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। যাত্রার প্রারম্ভে একদিন ভগ্নী নিবেদিতাকে বলিলেন—"দেখ বয়স যতই বাড়িতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি, মনুষ্যত্বের বিকাশই এ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্ত্তাই আমি জগৎকে শুনাইতে আসিয়াছি। যদি অসৎ কর্ম্মই কর তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হইতে হয় তবে একটা বড়-গোছের দুষ্ট হও।"

জাহাজ ৩১শে জুলাই (১৮৯৯ খৃঃ) লণ্ডনের টিল্‌বেরি ডকে উপস্থিত হইল। ইহার এক পক্ষ মধ্যেই স্বামীজি আমেরিকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নিউইয়র্কে আসিবামাত্র আবার পূর্ব্বের ন্যায় বক্তৃতা দিবার জন্য চারিদিক হইতে আহ্বান আসিতে লাগিল। দুই সপ্তাহ তথায় থাকিয়া তিনি কালিফোর্ণিয়ায় গমন করিলেন। সেখানে নানা বিষয়ে বক্তৃতার ঝড় বহিতে লাগিল—রাজযোগ, প্রাণায়াম,—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের কাহিনী—কিছুই বাদ গেল না। কালিফোর্ণিয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে ঘোর নাদে বেদান্তের ভেরী বাজিয়া উঠিল। ভেরী বাজিতে লাগিল—নিদ্রিত মানব একে একে জাগ্রত হইতে লাগিল—নানা স্থানে প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিতও হইতে লাগিল, কিন্তু যে সিংহ তখন কালিফোর্ণিয়া-অঞ্চলে গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছিলেন তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার কণ্ঠ নীরব হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই।

আলামেডা হইতে ১৯০০ সালের ১৮ই এপ্রিল তিনি মিস্ ম্যাক্‌লয়ড্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি

বিদায়ের দূর বংশী-ধ্বনি যেন শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি ভাল আছি—মানসিক খুব ভালই আছি; শরীরের চাইতে মনের শান্তিটাই দেখ্‌তে পাচ্ছি বেশী। লড়াইয়ে হার-জিত সব-ই হলো—এখন তল্পি-তাল্পা গুটিয়ে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ব'সে আছি। 'অব শিব পার করো মেরো নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।······আমি যে জন্মেছিলুম তাতে আমি খুসী আছি—এত যে দুঃখভোগ করেছি, তাতেও খুসী—এত যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুসী—আবার এখন যে শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম কর্‌তে চলেছি তাতেও খুসী।······দেহটা ভেঙ্গে গিয়েই আমায় মুক্তি দিক্, অথবা সশরীরেই মুক্ত হই,—সেই পুরাণো মানুষটা কিন্তু চ'লে গেছে, চিরদিনের জন্য গেছে—বিবেকানন্দ আর ফির্‌বে না। সেই পথ-প্রদর্শক—সেই নেতা, সেই আচার্য্য—সেই গুরু—সেই বালক, সেই শিষ্য, সেই দাস এখন আছে।······যাই মা, যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্চ সেই অশব্দ, অস্পর্শ,—অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—আর আমি অভিনেতা নই—আমি এখন দ্রষ্টা মাত্র।···ওঁ তৎসৎ।" (১)

এই পত্রাংশ পাঠ করিয়া কে বলিবে যে, ইনি সেই বিবেকানন্দ যিনি একদিন গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—"যেখানে Struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার) যেখানে Rebellion (সংগ্রাম), সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ"—ইনি কি সেই অগ্নিগর্ভ শৈলরাজ—যিনি মানবকে আপন চরণে ভর করিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান

(১) The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples—Vol III.

করিয়াছিলেন—যিনি প্রবহমান অগ্নিস্রোত ঢালিয়া দিয়া মানবের জড়ত্ব দূর করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—"ইহ জীবনে যারা সর্ব্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হ'তে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ কর্‌তে কর্‌তে আসে ও যায়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, এ কথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্ব্বদা বল্—অভীঃ অভীঃ। সকলকে শোনা মাভৈঃ মাভৈঃ।—ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই পাপ—ভয়ই নরক —ভয়ই অধর্ম্ম—ভয়ই ব্যভিচার!" মনে হইবে সত্য সত্যই সে বিবেকানন্দ আর নাই—কর্ম্মযোগী এখন কর্ম্মক্লান্ত হইয়া শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন—যেন দেখিতেছেন তাঁহার শিব—তাঁহার পারের কাণ্ডারী—জীবন-সমুদ্রের চলোর্ম্মিগুলি মথিত করিয়া ভক্তের জন্য তরণী আনিতেছেন—ওই ওই তাঁহার পিঙ্গল জটা এক একবার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে—ওই তাঁহার বজ্রমুষ্টি এক একবার তরঙ্গাহত হালের শিরটি চাপিয়া ধরিতেছে—ওই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত ফেণপুঞ্জে তাঁহার বিশাল দেহ সিক্ত হইয়া উঠিতেছে—আর তিনি সস্মিত বদনে করুণাপূর্ণ সুদৃঢ় কণ্ঠে এক একবার কহিতেছেন—ভয় নাই বৎস, ভয় নাই— এই আমি আসিতেছি—!

* * * *

কালিফোর্ণয়ায় যথাশক্তি বেদান্ত প্রচার করিয়া স্বামীজি আমেরিকা পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার নিউইয়র্কে গিয়া দেখিলেন, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের চেষ্টায় বেদান্ত-সমিতির কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতেছে। স্বামীজি প্রসন্নচিত্তে আমেয়িকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আমেরিকা হইতে পারী নগরীতে আসিয়া দেখিলেন, একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। তথাকার সুবিখ্যাত ধর্ম্মেতিহাস-সভায়

স্বামীজি ফরাসী ভাষায় এমন মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিলেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন যে, সেই বক্তৃতাটি দিবার জন্যই স্বামীজি মাত্র দুই মাস মধ্যে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন, তখন কাহারও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

পূর্ব্বে যেমন আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে তাঁহার সহিত কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ধুরন্ধর ব্যক্তিবর্গের আলাপ-পরিচয় এবং ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল, পারী নগরীতেও সেই-রূপই হইল।

পারীর পর ভিয়েনা এবং অন্যান্য কতকগুলি নগর দর্শন করিয়া স্বামীজি ভারতে ফিরিলেন এবং কাহারও নিষেধ না মানিয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কবিলেন। মায়াবতী, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রভৃতি প্রদেশে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে করিতে স্বামীজি যখন ক্লান্ত দেহে বেলুড়ে ফিরিলেন তখন একদিন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বামীজি, কেমন আছেন?"

স্বামীজি কহিলেন—"আর বাবা থাকা থাকি কি? দেহ ত দিন দিন অচল হচ্ছে।...তবে যে ক'টা দিন দেহ আছে তোদের জন্য খাট্‌ব। খাট্‌তে খাট্‌তে মর্‌বো।"

"খাট্‌তে খাট্‌তে মর্‌বো"—ইহাই ছিল স্বামীজির জীবনের পণ। "নিজের জন্য, আপন শরীর মনের সুখের জন্য কর্ম্ম না করাই হচ্ছে কর্ম্মফল ত্যাগ"—স্বামীজি জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াই কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন,—"এখন চাই গীতায় ভগবান্ যা বলেছেন—প্রবল কর্ম্মযোগ—হৃদয়ে অসীম সাহস। অমিত বল পোষণ করা। তবে ত দেশের লোকগুলা জেগে উঠ্‌বে।" হে ভারত! স্বামীজির দেহরক্ষার পর ত অনেক দিন চলিয়া গেল। এখন

কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি—বুকে হাত দিয়া বল, এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ কি?

যতই দিন যাইতে লাগিল স্বামীজির দেহ ততই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শেষে তিনি শয্যাগত হইলেন—কোন চিকিৎসাতেই কোন ফল হইল না। কিন্তু তখনও ধ্যান ও বেদমন্ত্রের আবৃত্তির নিবৃত্তি রহিল না। তখনও বলিতেন "নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ দশ বারটি যুবক পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা ক'রে দিতে পারি। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী এমন একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে চাই—এরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার স্থল।"

আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। লোকে দেখিল, স্বামীজি ক্রমেই মঠ ও মিশনের কার্য্য হইতে অবসর লইতেছেন এবং বেশী সময় ধ্যানে মগ্ন থাকিতেছেন। তাহার পর সেই দিন আসিল (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) যেদিন সায়াহ্নে মঠের সকলকে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া সন্ধ্যারতির বাদ্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে তিনি গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মালা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শেষে ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কেহ তখন জানিতেও পারিল না—বুঝিতেও পারিল না যে, সেই ধ্যান মহাসমাধিতে পরিণত হইতেছে! (১)

(১) ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মধ্য রাত্রিতে স্বামীজি সকলের অজ্ঞাতে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিলেন—ভারত-মাতার কণ্ঠহারের মধ্যমণি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল! কেহ বলেন সন্ন্যাসরোগে, কেহ বলেন হৃদ্‌রোগে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীদিগের অভিমত এই যে, স্বামীজি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি বলিতেন—"আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না।" "যাক্ মৃত্যুই যদি হয় তাহাতেই বা কি আসে যায়? যা' দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বছরের খোরাক্!" দেহত্যাগ হইলে বেলুড়মঠের ঠিক কোন্ স্থানে তাঁহার দেহের সৎকার করা হইবে দেহত্যাগের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী দেহবক্ষা করিলে শোক করিতে নাই—কিন্তু সে শাস্ত্র-শাসন কি সকল সময় মানা সম্ভব? যাঁহাকে হাবাইলে মনে হয় সব হারাইলাম—অস্থি পঞ্জব চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি দেহ বাখিলে কে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে? তাই বেলুড়ে কাঁদিলেন সন্ন্যাসিগণ, ভাবতে কাঁদিল ভারতের নর-নারী—নিউইয়র্কে কাঁদিলেন গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এবং শত শত ভক্ত নব-নাবী—বোদনের বোলে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গেল কারণ স্বামী বিবেকানন্দকে অঙ্কে ধাবণ কবিবার সৌভাগ্য সহস্র বর্ষে বসুন্ধবার একটিবাব হয় কি না সন্দেহ! সেই বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বৎসব ৫ মাস ২০ দিন বয়সে মাতৃভূমিকে শ্মশান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রস্থান কবিলেন!

স্বামীজি-মহারাজ যুগেব অগ্রদূতরূপে আসিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকালেব মধ্যে তাঁহার এত বেশী ভাব-ধারা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল যে, লোকে হাবু-ডুবু খাইতে লাগিল! এ যে কিসেব বন্যা হঠাৎ আসিয়া পড়িল, তাহা তাহাবা বুঝিতে পারিল না! এখন সকলে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ঠাকুর-স্বামীজির ভাব গ্রহণ না করিলে ভারতের অন্য গতি নাই! ভগবান্ শ্রীবামকৃষ্ণও বোধ

স্বামীজির দেহত্যাগের সংবাদ আমেরিকায় যাইয়া পৌঁছিলে নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটীর আয়োজনে কার্নেজি লিসিয়ামে যে বিরাট সভা হয় (৮ই মার্চ্চ, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ), স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেই সভায় "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার কর্ম্ম" ইতি শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অভিভাষণের শেষভাগে সান্ ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির সভাপতি ডক্টর এম্, এইচ., লোগান, এম্, ডি, মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত যে শোকনিবেদনটী পাঠ করিয়াছিলেন তাহার একস্থানে ছিল:—To me he is 'the Christ' than whom a greater one has never come; his great and liberal soul outshines all other things .....No being lived so mean or low, be it a man or a beast, that he would not salute......Vivekananda shook the world of thought on all its higher lines. Great teacher bowed reverently at his feet, the humble followed reverently to kiss the hem of his garments; no other single human being was reverenced more during his life than was Vivekanand."—Swami Vivekananda and his Work by Swami Abhedanada Maharaj.

হয় এই কারণেই বলিয়াছিলেন যে, একদিন তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি ঘরে ঘরে পূজিত হইবে। ভগবানের সেই বাক্য সফল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার দেহরক্ষার পর এখন মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইয়াছে! তাঁহার দেহান্তের মাত্র দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ভাব ভারতে ও ভারতের বাহিরে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠা ছিল প্রথমে বাঙ্গালার এবং তারপর ভারতের! সেই প্রতিষ্ঠার মন্দির রচনায় প্রথম কর্ম্মী ছিলেন একেশ্বর স্বামী বিবেকানন্দ—তখন বাঙ্গালা তাঁহার পশ্চাতে ধায় নাই—ভারত তাঁহার সন্ধান লয় নাই—রাজপতাকা তাঁহার অগ্রদূত হয় নাই!

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন Absolute সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, আর স্বামীজি ছিলেন সেই সত্যকে প্রচার ও প্রকাশ করিবার বৈদ্যুতিক-শক্তি! ইঁহারা এই ভাবেই বার বার ধরাধামে আসিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ইহাই তাঁহাদিগের রূপ। যুগে যুগে ভারত সেই রূপের দর্শন পাইতেছে বলিয়া বাঁচিয়া আছে এবং নর-সমাজকে বাঁচাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে শান্তিবারি বর্ষণ করিতেছে।

বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু ২য় খণ্ড

শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী

মহাতাপস শ্রীশ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী

নামরূপী মিছরির টুকরা মুখে রাখিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া যাও হাতে কাম, মুখে রাম ভক্তজনাকি মন বিশ্রাম।

—বালানন্দ ব্রহ্মচারী

বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবিখ্যাত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরেব কোনও ব্রাহ্মণবংশে তেজঃপুঞ্জকান্তি বালক পিতাম্বরের জন্ম হয়। ভগবান্-লাভের কামনা বালকের হৃদয়কে তখনই এমন আকুল করিয়াছিল যে, নবম বর্ষ বয়সেই গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সৎ-গুরুর সন্ধানে ভ্রমণ কবিতে করিতে নর্ম্মদাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং ঋষিকল্প মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমহারাজ ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীজিব কৃপা প্রাপ্ত হইলেন। দীক্ষান্তে তাঁহার নাম হইয়াছিল বালানন্দ ব্রহ্মচারী। কথিত হয় যে সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী পর ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীজি দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার একমাত্র পথ--ক্ষুদ্র আমিত্বের চির-বিসর্জ্জন। সকল সময়ে সকল দেশের মহাপুরুষগণ নানা ভাবে এই এক উপদেশই দিয়া গিয়াছেন—'আমি'-কে হত্যা কর, আমির স্থানে তুমি-কে আনিয়া বসাও—"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" ব্রহ্মচারী-মহারাজ বালানন্দও এই কথাই বলিতেন—'আমি-টাকে ভগবৎ কার্য্যে বলিদান দাও।" একবার একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হরিনাম করিতে ভাল লাগে না কেন বাবা?" উত্তরে মহারাজ বলিলেন—"পরিচয় নাই বলিয়া।"

সেই নিকটতম অপরিচিতের পরিচয় লাভ করিবার একমাত্র উপায়

গুরু-কৃপা এবং সেই অপরিচিতের নিজের কৃপা। পরিচয় পাইবামাত্র ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হয় এবং মানব যুক্তকরে বলিয়া উঠে—

দয়া ক'রে ইচ্ছা ক'রে আপনি ছোটো হ'য়ে
এসো তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য্য-সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও হে ধরা কতো আকার লয়ে,
বন্ধু হ'য়ে পিতা হ'য়ে জননী হ'য়ে,
আপনি তুমি ছোটো হ'য়ে এসো হৃদয়ে।

—গীতাঞ্জলী।

পরিচয়লাভে বিমুগ্ধ কৃতার্থ মানব তখন আর সেই অপরিচিত-বান্ধবের নিকট বর ভিক্ষা করিতে পারেন না—দর্শনেই হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়—মুখ মূক হয়। তিনি আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হইয়া ভক্তি-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিয়া উঠেন—"স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং না যাচে—" হে প্রভু, তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াই সকল চাওয়া-পাওয়ার শেষ হইয়াছে, তুমি আর আমাকে কোনও বর দিও না প্রভু—কৃতকৃতার্থ এই দাস—বরং না যাচে—বরং না যাচে।

সুদীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী তপস্যার বলে ব্রহ্মচারী বালানন্দ যেদিন সেই অপরিচিতের দর্শন পাইলেন সেদিন তিনিও এমনি করিয়া কাঁদিয়াছিলেন—স্বামিন্! বরং ন যাচে—বরং ন যাচে।

তুষারশুভ্র হিমালয়ের স্তব্ধ গুহা হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরতরঙ্গ-বিধৌত কন্যাকুমারীর পূজা-পীঠ পর্য্যন্ত ভারতের নানা পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ এবং দুশ্চর তপস্যা করিয়া বালানন্দ মহারাজ শেষ-জীবনে বৈদ্যনাথ ধামের নিকট 'তপোবন' পর্ব্বতে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং

সীতা-গুহায় একজন সিদ্ধ সাধকের আসনে বসিয়া তপস্যা করিতে করিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এইখানে এবং পরে করণিবাগ আশ্রমে শত শত বাঙ্গালী নর-নারী তাঁহার অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই দীন লেখকও কয়েকবার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আজিও সেই মহাতাপসের হাস্যপ্রফুল্ল প্রশান্ত বদন জীবন্ত চিত্রের মত নয়নে ভাসিতেছে। এই মহাপুরুষের মুখখানি দেখিলে ইহাই মনে হইত যে, ইনি যেন আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না—"আনন্দ" লাভ করিয়া ইনি নিজেও যেন আনন্দই হইয়া গিয়াছেন।

মন্‌ভরণ নামক মহারাজের একটি ভক্ত সেবক বলিতেন—"মহারাজ পূর্ব্বে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, কষ্টের মধ্যে পড়িয়া তিনি কখন কাতর হয়েন নাই। একদা নর্ম্মদা-পরিক্রমাকালে মান্ডালা সহরে গুরু-মহারাজের প্রতি কমিশনার সাহেবের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। গুরু-দেবকে তিনি ছদ্মবেশী তস্কর বলিয়া সন্দেহ করিলেন।...সাহেব গুরু-দেবের ঝোলা দেখিতে চাহিলেন। তাঁহার ঝোলায় দুই একখানি গৈরিক বস্ত্র ও কিছু শঙ্খিয়া বিষ ছিল। ঐ বিষ অতি উগ্র। সে সময় গুরুদেব ঐ বিষ কিছু কিছু প্রত্যহ সেবন করিতেন। তাঁহার হস্তে একখানি চিম্‌টা এবং কন্দমূল আহরণ নিমিত্ত একখানি খোন্তা ছিল।"

সাহেবের বিশ্বাস হইল যে, শঙ্খিয়া-বিষ সেবন করাইয়া অপরের প্রাণনাশ পূর্ব্বক ধনরত্ন অপহরণ করাই এই ছদ্মবেশী সাধুর কার্য্য! সাহেব কহিলেন—'এই বিষ যে তুমি নিজে খাও বলিতেছ—আমার সাক্ষাতে খাইয়া পরীক্ষা দাও, নতুবা তোমাকে জেলে দিব।'

ঝোলার ভিতর অনেকখানি বিষ ছিল—শুধু একজন কেন, উহা

খাইলে বহু লোকের প্রাণহানি হইতে পারিত! ব্রহ্মচারী মহারাজ সবটুকু বিষই তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিলেন! কিছুক্ষণ পর বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। পরে একজন সাহেব-ডাক্তারেব চিকিৎসায় তিনি আবোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বনের দুরন্ত শার্দ্দূল সম্মুখে উপস্থিত হইলে মহারাজ তাহাকে সস্নেহে লাড্ডূ খাওয়াইতেন এবং সময়ে সময়ে বিষধর সর্প পর্য্যন্ত ধরিতেন! হিংস্র প্রাণী তাঁহাকে হিংসা কবিত না, কাবণ তিনি কখনও পরোপকার ভিন্ন পরপীড়ন করেন নাই। সময়ে সময়ে তিনি শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে বলিতেন—'নানা ধর্ম্মের নানা পথ। কিন্তু সকল ধর্ম্ম একটি নীতি সম্বন্ধে একমত। সকল ধর্ম্মই বলে—পরোপকার ধর্ম্ম, পরপীড়ন অধর্ম্ম।' তিনি বলিতেন—"সম্বলবিহীন হইলে মনে বল পাওয়া যায় না। এখন হইতে যদি সম্বল উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না কর তবে কি করিয়া শেষ-সময়ে সাহস পূর্ব্বক যাত্রা করিবে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি দুই ঘণ্টাও তাঁহার জন্য নিয়োজিত না কর, তাহা হইলে যে নিঃসম্বল অবস্থায় এ ধাম ত্যাগ করিতে হইবে! পুরুষার্থ ব্যতীত কিছুই হয় না—হইতে পারে না। তিনি সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব জীবে বর্ত্তমান, এটুকুও যদি স্মরণ কর, তাহা হইলেও অনেক কাজ হইবে।"

একদিন একজন সরলা স্ত্রীভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা আপনার কি বিবাহ হইয়াছে।' উত্তর হইল—'হঁা' হইয়াছে।' প্রশ্ন হইল—'মা-[illegible]রুণ কোথায় থাকেন, বাবা?' মহারাজ কহিলেন—'গুরু-মহারাজ আমার বিবাহ দিয়াছেন, চার জনের সঙ্গে। তাদের নাম—করুণা, মৈত্রী, মুদিতা, এবং উপেক্ষা। এই চারিজন সকল সময় আমার সঙ্গে থাকেন। তাঁহাদের চারিটি সন্তানও জন্মেছে। তাহাদের নাম—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।"

মহারাজের বিবাহ ও সন্তানাদির কথা শুনিয়া শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"করুণা, মৈত্রী, মুদিতা, উপেক্ষা—এই চারিটি সঙ্গে লইয়া চলা সকলের কর্ত্তব্য। করুণা অর্থে দয়া—পর দুঃখে দুঃখ বোধ করা। মৈত্রী অর্থে মিত্রতা ও প্রীতি—সম বা উচ্চতর ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করা। এতদ্দ্বারা উন্নতি সম্ভব। মুদিতা অর্থে চিত্তের প্রসন্নতা ও সন্তোষ—অপরের সুখ-সৌভাগ্য দৃষ্টে ঈর্ষ্যা না করা, সন্তোষ লাভ করা। উপেক্ষা অর্থে উদাসীনতা; দুষ্ট লোকের প্রতি বা তাহাদের বাক্যে উদাসীন ভাব, ভোগাতৃষ্ণায় উদাসীনতা।"

"তোমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিবে—প্রভো আমি তোমার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি। অন্তরে দাস ভাব অর্থাৎ নিজেকে তাঁহার দাস মনে করিয়া, সংসারের সব কাজ তাঁহারই মনে করিয়া করিবে। রাত্রিকালে শয়নের সময় সমস্ত দিবসের কার্য্যগুলি চিন্তা করিয়া দেখিবে। যদি দেখ, তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তবে তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে এবং ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইবে—তোমার দ্বারা এরূপ কর্ম্ম যেন আর সম্পন্ন না হয়! সকল কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে নির্ব্বাহ করিলে, উহার পাপ পুণ্য কর্ম্মকর্ত্তাকে একেবারেই-স্পর্শ করে না।"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন উপদেশ প্রদান কালে নানা মনোমুগ্ধকর আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া উপদেশবাক্যগুলি ভক্তদিগের হৃদয়ে চিরতরে গ্রথিত করিয়া দিতেন, ব্রহ্মচারী বালানন্দ মহারাজের উপদেশ-প্রণালীও তাহাই ছিল। (১) ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় ইঁহার জীবনও ছিল গীতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ।

---

(১) ব্রহ্মচারী মহারাজের মুখের কথাগুলি তুলিয়া তাঁহার শিষ্যা শ্রীযুক্তা সরলা বালা মিত্র "কথ-প্রসঙ্গ" নামে একখানি পুস্তক দুইখণ্ডে সঙ্কলিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তক ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেই পড়িলে পরিতৃপ্ত হইবেন। উহাতে দেখা যায় জটিল ধর্ম্ম ও নীতি তত্ত্ব মহারাজ বাঙ্গালা-মিশ্রিত অতিশয় সহজ হিন্দিতে

কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নদীয়ায় গোরাচাঁদ, বঙ্গে ও উড়িষ্যায় ব্রহ্ম-হরিদাস, দক্ষিণেশ্বরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ—সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন ভগবান্ লাভের একমাত্র পথ অনুরাগের সহিত নাম জপ ব্রহ্মচারী বালানন্দজিও পুনঃ পুনঃ সেই উপদেশই দিয়াছেন

সরব রোগ্‌কা ঔষধ নাম।

কলিয়াণ (কল্যাণ) রূপ মঙ্গল গুণগাম ॥

কিন্তু নিরন্তর জপ করিব বলিলেই ত জপ করা যায় না—'আপি জপায়, নানক জপে'—শ্রীভগবান্ যদি জপ করান তবেই নিরন্তর জপ করা সম্ভব হয়। জপ করিবার মত মন ও সামর্থ্যের জন্য তাই শ্রীভগবানের কৃপা ভিক্ষা করা প্রয়োজন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন কৃপা-বাতাস ত সর্ব্বক্ষণ বহিতেছে, তুমি ত্বরা করিয়া পাল তুলিয়া দাও।

বালানন্দজি মহাত্মা কবীরের মতই কহিতেন—"জপ করিতে হইবে তদ্‌গত চিত্তে—ওষ্ঠ নাড়িলে বা মালা ঘুরাইলেই জপ হয় না। তবে প্রথম প্রথম মালা ঘুরাইতে হইবে; মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মন বন্ধনের ভিতর আসিতে থাকে।" মালায় মন না বসিলে মালা ঘুরানো বৃথা।

করণীবাগে প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে 'সৎসঙ্গ' হইত। নানা-স্থানের নানা পর্য্যায়ের নর-নারী উপস্থিত হইয়া মহারাজের নিকট আত্ম-নিবেদন করিতেন এবং তাঁহার অমৃততুল্য উপদেশবাণী লাভ করিয়া [illegible]বন লইয়া ফিরিয়া যাইতেন। উপদেশ দিয়া মহারাজ বলিতেন—"আব তুম্ উপদেশ-বাক্য শ্রবণ কিয়া, ফিন্ উস্‌কো মনন করনা।

বলিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের কোন কোন স্থান পড়িলে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের' কথা মনে পড়ে। দুই একটি স্থানে এমনও মনে হয় যেন কথামৃতে ধৃত ঠাকুরের বাণী ও বর্ণিত আধ্যাত্মিকা সহজ ও সরল হিন্দি ভাষায় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দেখা দিতেছে। মহাপুরুষদিগের চিন্তায় ও ভাবপ্রকাশের ধারা যে অনেকটা একরূপ ইহা বোধ হয় তাহারই একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

মনন্ করণেসে কেয়া হোগা? নিদিধ্যাসন হোগা, অর্থাৎ, ওহি বাক্য ধেয়ান্‌মে বৈঠ্ যায়গা।......শ্রবণ কর্‌নেসে কুছ্ নেহি হোগা, যব্ তক্ মনন্ নেহি হোগা; শ্রবণ্ হুয়া, বাস্ ছুটি হো গিয়া, উস্ শ্রবণসে কুছ্ কার্য্য হোগা নেহি। যব্ গুরুজনকে পাশ্ সৎ উপদেশ শ্রবণ কিয়া, ফিন্ উস্‌কা একান্ত চিত্তমে মনন্ কর্‌না। মনন্ কর্‌নেসে ধেয়ান্‌মে বৈঠ্ যায়গা।......মনন্ কেয়া? তুমি যো যো বাক্য শুনা, ওহি বাক্যকো তুম্ পশ্চাৎ আপ্‌না মন্‌মে আলোচনা কর্‌না।"(১) ধর্ম্মজগতের মহাপুরুষগণ সকলেই কথার-ব্যাপারী। তাঁহারা অন্তর্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু কথা বা বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। সেই বাণীই মানবের সম্বল—উহাই তাহার পারে যাইবার পাথেয়। বাণীগুলি সুখশ্রাব্য সঙ্গীতের মতই মধুর—একবার দুইবার বহুবার পাঠ করিয়াও পুনরায় পাঠ করিতে অরুচি হয় না—কিন্তু এমনই মোহগ্রস্ত আমরা যে, কানের ভিতর লইয়া সেই সঙ্গীতধারাকে কানের ভিতর দিয়াই বাহির করিয়া দি—প্রাণের নিকটে লইয়া যাই না! জীবন-প্রবাহ ত একতানে এক-টানে চলে না—আজ জোয়ার, কাল ভাঁটা! যখন ভাঁটায় টানে তখন দেখি আর ফিরিবার সামর্থ্য নাই—সময়ও নাই। তখন মনে হয়—জীবনে দেখিলাম অনেক, শুনিলামও অনেক—পড়িলামও অনেক! কিন্তু আজ দেখিতেছি দেখিবার মত করিয়া দেখি নাই, শুনিবার মত করিয়া শুনি নাই—পড়িবার মত করিয়া কিছু পড়ি নাই! কবির গান তখন কানের কাছে বাজিতে থাকে—

আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা
মনেরে শুধু শিখাই নে।
আমি, সকল কাজের পাই হে সময়
তোমারে ডাকিতে পাই নে।—রজনীকান্ত।

(১) কথা-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্তা সরলা বালা মিত্র।

একদিন তপোবন পর্ব্বতে সৎসঙ্গকালে প্রশ্ন উঠিল—ঈশ্বর আছেন, কি নাই। মহারাজ কহিলেন—শাস্ত্র ত ভগবানের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল ঋষিবাক্য মানিয়া লও। আর চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে দেখ—ঈশ্বরের রাজত্ব কেমন সুচারুরূপে চলিতেছে। ইহাতেও কি তোমার বিশ্বাস হয় না যে, ঈশ্বর আছেন ?

প্রশ্নকারী কহিলেন—মহারাজ, ঈশ্বরকে ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না, তাই বিশ্বাস হয় না।

মহারাজ—বৎস, সব বস্তুই কি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় ? এমন অনেক বস্তু আছে যাহা অনুভব-সিদ্ধ। চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না এমন যদি পণ কর তবে বড় ভুল করিবে। এই কমণ্ডলুর জলে কেহ যদি তোমার অগোচরে মিছরি ফেলে—মিছরি না দেখিয়াও শুধু ঐ মিষ্ট জল পান করিয়াই তুমি বলিতে পারিবে যে, উহাতে মিছরি আছে। এই যে ঘড়াটা রহিয়াছে, উহা দেখিলেই অনুমান হয় যে, কুম্ভকার আছে, নতুবা কে উহা প্রস্তুত করিল। এই সংসার-রচনা দেখিয়া তুমি হয় ত বলিবে উহা প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিয়াছে। বেশ তাহাই হউক—সেই প্রকৃতিকেই তবে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লও। দেখ ভাই, তুমি ত জন্মদাতাকে দেখ নাই—তোমার মা বলিয়া দিয়াছেন—ইনিই তোমার পিতা, তুমি তাহাই মানিয়াছ। কাজেই "মাতাকো বিশ্বাসকা উপর পিতাকো পিতা বোলনেই হোগা।"

"জগৎ-পিতা ঈশ্বরকো ভি এহি প্রকার হ্যায়।...হিঁয়া মে গুরু মাতা। গুরু বাতায়া এহি রাম-মূর্ত্তি, অথবা কৃষ্ণ-মূর্ত্তি—তুমারা জগৎ-পিতা ঈশ্বর হ্যায়—তুম্‌কো ওহি বাত্ মান্‌নে হোগা।" তোমার এই দু'টি চক্ষু আগে বন্ধ কর—জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হোক্ তবে তুমি ঈশ্বরের দর্শন পাবে। ভগবান্ এই জন্যই অর্জ্জুনকে জ্ঞানচক্ষু দিয়া বলিয়াছিলেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥
—গীতা ১১।৮

ঈশ্বর যে কি বস্তু বর্ণনা দ্বারা তাহা বুঝান যায় না—"তোম্ আপ্না .উস্কো উপলব্ধি কর্না—তব্ তোম্কো মালুম্ হো যায় গা।' ভাবই লাভ। ঈশ্বর কল্পবৃক্ষ। সেই বৃক্ষনিম্নে বসিয়া তুমি যাহা সঙ্কল্প করিবে তাহাই পাইবে—তুমি ভূতের ভাবনা কর, ভূত পাইবে—ভগবানের ভাবনা কর ভগবান্কে পাইবে। "ভাব্কা শুদ্ধ কর্না. ঈশ্বর হ্যায়, এহি ভাব যিস্কো হৃদয়মে হ্যায়, উস্কোওয়াস্তে ঈশ্বর হ্যায়। ঈশ্বর নেহি হ্যায় এহি ভাব যিস্কো হৃদয় মে হ্যায়—উস্কো ওয়াস্তে ঈশ্বর নেহি হ্যায়।...সিদ্ধান্ত হুয়া—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতু তাদৃশী।" তুমি যদি ভক্ত হও—তোমার ঈশ্বরকে রূপ দাও—তিনি ত নিরাকার, কিন্তু ভক্ত তাঁহাকে যেমন রূপ দেয় তিনি তাহাই লন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর কর্ম্মরূপী—"যেত্তা বাদ্ বিসম্বাদ্ রাস্তামেই হ্যায়—গন্তব্যস্থানমে পৌঁছানাসে আউর কুছ্ দ্বন্দ্ব্ নেহি রহ্তা হ্যায়।.. গন্তব্য স্থান সবকো এক হ্যায়...রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন হোতা হ্যায়।" আর দেখ, ঈশ্বরের তিনটি গুণ—অস্তি, ভাতি, প্রিয়। অস্তি অর্থাৎ আছেন, ভাতি অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া আছেন এবং প্রিয় অর্থাৎ ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপে সর্ব্ব প্রাণীতে বিরাজিত আছেন। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ মায়ার খেলা, সেই জন্যই বহু হইয়াছে, কিন্তু উহার মূল সেই এক ঈশ্বর।

একদিন এক ধনাঢ্যা ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা মুক্তির উপায় কি?

মহারাজ বলিলেন—'মা এই কথাটি মনে রাখিবেন, আপনি দাসী মাত্র। পরমাত্মাদেব আপনার মুনীব। পরমাত্মারই ধন দৌলত, আপনি

কর্ম্মচারী মাত্র। যদি এই ভাব মনে দৃঢ় হয় তবে আর বন্ধন হইবে না। মনে রাখিতে হইবে—'আমি দাসী, হে প্রভু, আমি যাহা কিছু কাজ করিতেছি সে সবই তোমার উপাসনা—'যদ্ যদ্ কর্ম্মং করোমি, তদ্ তদ্ অখিলম্ শম্ভো তব আরাধনম্।' অজ্ঞানী যে, সে-ই শুধু "আমার আমার" করে—আর জ্ঞানী বলে—"তোমার—তোমার—আমার কিছুই নয়।" 'আমার আমার' করে বলিয়াই অজ্ঞানীর কর্ম্ম তাহার বন্ধনের কারণ হয়। মাগো, মুক্তি গাছের ফল নয় যে, গুরু আপনাকে হাতে তুলিয়া দিবেন—দুগ্ধ নয় যে শিষ্যকে পান করাইবেন—"মুক্তি হ্যায় নিজকা অনুভূতিকা চিজ।" সর্ব্বদা বিচার করিবেন—বিচারই সার জানিবেন। কোন জিনিষই আপনার নয়—সবই তাঁহার, সেই প্রভুর। জানেন ত কথায় বলে—'যা দেবে হাতে ওহি যাবে সাথে'—নিজ হাতে যাহা কিছু দান পুণ্য শুভকার্য্য করিবেন, শুধু তাহাই আপনার সঙ্গে যাইবে। "মায়ী, হরবখৎ শুভ কাম্ কর্‌না—শুভ চিন্তনা—দান কর্‌না—'কলির্দানৈব কেবলম্ কলির্দানৈব কেবলম্।"

শ্বাস শ্বাস্‌মে হরি রটো
বৃথা শ্বাস্ মৎ খোও।
না জানে কিস্ শ্বাস্‌মে
আওন হোয় কি না হোয়॥

প্রতিশ্বাসে হরির (ভগবানের) নাম রটনা করিতে হয়। যে শ্বাস এই এখনই বাহির হইয়া গেল, কে জানে উহা আর ফিরিয়া আসিবে কি না। "ঘড়িকা কাঁটা য্যায়সে টুক্-টুক্ কর্ রহা হ্যায়, ওয়সাই নাম্‌কো কাঁটা টুক্-টুক্ কর্‌তে রহ। চল্‌তে ফির্‌তে কোই বখৎ উস্‌কো বন্ধ মৎ করো।" ভগবানের নাম জপ করিলেই অন্তর শুদ্ধ হয়। তদ্ জপম্ তদর্থ ভাবনম্—যাঁহার নাম জপ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপ চিন্তা করিবেন।

ভাবনা করিলেই ভাবোন্মাদ হয়। "নতুবা তুম্ হরি হরি রটন্ করতা হ্যায়, আঁখি তোমারা ধেয়ান্‌কে ওয়াস্তে বন্ধ্ হ্যায়; আউর তোমারা মণিরাম (মন) যো হ্যায় ও ভাগ্‌কে চলা গিয়া, বাজারমে সওদা খরিদ কর্‌নে লাগা। ওহি নাম্‌সে কাম্ নেহি হোগা। তুম্ মুখ্‌মে নামরস পী রহো, আউর হাত্-পায়েব মে বাহারকা কাম্ কর্ যাও—কুছ্ ভি বাধা নেহি হোগা। তব্ চাহিয়ে কুছ্ অভ্যাস্—অভ্যাস্ পড়্ যানেসে সহজ হো যায়গা।"

একজন কহিলেন—"বাবা, আমরা সংসারী—আমরা কেমন করিয়া সৎসঙ্গ লাভ করিব? তাহার ত কোন উপায় দেখিতেছি না।

মহাবাজ বলিলেন—কেন? ঘবে বসিয়াই সৎসঙ্গ করিবে। তোমবা ত বিদ্বান্—শাস্ত্র-গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিবে তাহা হইলেই ত ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি ঋষিদিগের সঙ্গে সঙ্গ হইবে। "বাবু, উপায় নেহি হ্যায় সো তো নেহি—যো কই করেগা উস্‌কোওয়াস্তে সব্ কোই উপায় হ্যায়।"(১)

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক একদিন রোদন করিতে করিতে কহিলেন— "মহারাজ, আমার অন্তিমকাল প্রায় সমাগত। আমার পথ যাহাতে মুক্ত হয় সে উপদেশ দিতেই হইবে।

মহারাজ ছুইটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিলেন। কহিলেন—ভাই, শুধু শরীর দিয়া জপ-তপ করিলে কিছু ফল হয় না—মনও লাগাইতে হয়। শরীর মন দুইই চাই—তবে উর্দ্ধগতি হইতে পারে। ঈশ্বরবাচক শব্দ জপ এবং সেই সঙ্গে "তদর্থ ভাবনম্"—ধ্যেয় দেবতার মূর্ত্তি চিন্তা—ইহাতেই জপের ফল হয়। নতুবা হয় না।

(১) কথা-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্তা সরলা বালা মিত্র

অন্তিমকালে সকলকেই খুব "হুসিয়ার" হইতে হয়। সমস্ত জীবন ধরিয়া সাধন-ভজন করিবার ফল এই নিদানকালেই পাওয়া যায়। অন্যের ত কথাই নাই, অনেক "ভজনশীল অভ্যাসি" ব্যক্তিরও মৃত্যু-যন্ত্রণার কালে ভগবৎস্মরণ "মুস্কিল" হইয়া পড়ে। আসল কথা—মনের ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। যে ভাবেব মধ্যে দেহ ত্যাগ হয় দেহান্তে গতিও সেই রকমই ঘটে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মবন্মুক্ত্বা কলেববম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
যং যং বাপি স্মবণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেববম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥—গীতা ৮।৫।৬

যিনি মৃত্যুকালে আমাকেই (ভগবানকে) স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাব ভাব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন—ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

জীব দেহত্যাগ কালে যে-যে ভাব স্মবণ করে, দেহান্তে সর্ব্বদা সেই সেই বিষয়েই চিন্তারত থাকে বলিয়া সেই সকল ভাব বা বাসনাসিদ্ধিব উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রাজা ভবত অন্তিমকালে তাঁহার প্রিয় হরিণের চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার হরিণ-জন্ম হইয়াছিল। মায়ার এমনিই শক্তি ও গতি—'ও তো জীবকো ভুলায়কে রাখেগা, পরমাত্মাকো তরফ যানে নেহি দেগা' পরমাত্মার নিকট যাইবার জন্য তাই সমস্ত জীবন রোদন করিতে হয়। তাঁহার জন্য রোদন না করিলে তিনি তোমাকে বুকে তুলিয়া লইবেন কেন? যে শিশু মাতৃস্তন্যের জন্য রোদন করে না, মা কি তাহাকে স্তন্য দান করে? পরমাত্মাকে পাইবার জন্য তাই নিরন্তর রোদন করিতে হইবে—ভজন করিতে হইবে।

জীবন-সায়াহ্নে আজ দেখিতেছি প্রভু, আমি নিঃসম্বল—কোনও আয়োজনই ত করা হয় নাই—এরূপ শ্রবণমঙ্গল উপদেশ বাক্য ত কতই শুনিলাম, কতই পাঠ করিলাম কিন্তু জীবন-প্রবাহের গতি ত ফিরিল না। বুঝিলাম শুধু শ্রবণই হইয়াছে—মনন হয় নাই বলিয়া "নিদিধ্যাসন"ও হয় নাই।

কুটিল কুপথ ধরিয়া, দূরে সরিয়া
আছি পড়িয়া হে,—
বুধ-মঙ্গল কেতু—আর দেখিনে,—
কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
(এই) দীর্ঘ প্রবাস-যামিনী আমারে
ডুবায়ে রাখিল তিমিরে,
(আর) প্রভাত হ'ল না, আঁধার গেল না,
আলোক দিল না মিহিরে হে,—

* * *

(আমার) কণ্টকবনে কে লইল টানি'
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে,
যদি, জাগিতেছ, প্রভু দেখিতেছ,—
তবে, ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া।—রজনীকান্ত।

প্রভু, স্বামী—নিঃসম্বলের সম্বল, অনাথের শরণ, অগতির গতি!—

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই
পায়ে থুতে।

পূজার ডালি সাজাইয়া যখনই শ্রীমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হই, তখনই দেখি অন্তরের কালী কত কালো, কত ঘন—দেখি ভাগীরথীর সমুদয় সলিল এক করিলেও ত সে কালী ধুইয়া যায় না—সে যে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে—দম্ভে, আত্মাভিমানে তাহাকে সঞ্চয় করিয়াছি—বিষ্ঠার কীট যেমন বিষ্ঠাকেই পরমানন্দে ভোগ করে, তেমনি তাহাকে ভোগ করিয়াই আসিতেছি—জয়-তিলকজ্ঞানে তাহাকে কপালে ধরিয়াছি—কিন্তু এখন? জীবনের মধুযামিনী যে শেষ হইয়া আসিল—সম্মুখেতে উষার আলোক দেখি না! দেখিতেছি মেঘের উপর মেঘ জমিয়াছে, আঁধারের উপর আঁধার নামিতেছে, আর ঐ দূরে গর্জ্জন করিতেছে এক অপার অসীম জলোচ্ছ্বাসময় ঝটিকাক্ষুব্ধ তুস্তর সাগর। নিকটে—নিকটে—সে সাগরের বিপুল জলভঙ্গরব ঐ যে ক্রমেই কাছে আসিতেছে! আর ত পলায়ন করিবার পথ নাই, উপায় নাই, স্থান নাই, শক্তি নাই। এখন? হে প্রভু, আমি তোমার শরণাগত হইলাম—রক্ষা কর—রক্ষা কর। এই শরণাগতিকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিতে-ছেন—"পরমাত্মদেব রাজরাজেশ্বর হ্যায়। মনুষ্যকা পাপরূপ ঋণ হ্যায়। যব্ কোই চতুর হোগা—ও তো রাজরাজেশ্বরকা শরণাপন্ন হো যায়গা। নিষ্কাম ভাব্‌সে উনিকো সেবা করে গা—উনিসে কুছ্ মাঙ্গনা নেহি। তব্ পরমাত্মাদেব যব্ সন্তুষ্ট হোগা, তুমারা যেত্তা পাপরূপী করজদার খাড়া হোগা—কুছ্ ডর্ নেহি হ্যায়, পরমাত্মদেব বিল্‌কুল্ মিটায় দেনে সে[illegible]তা।" মিথ্যা জপ—তপ—মিথ্যা সাধনা—মিথ্যা ধূপ দীপ আরতি—সাধারণ মানবের পক্ষে এ সকলই মিথ্যা। সত্য শুধু সেই একটি কথা—দয়াময় তোমার শ্রীচরণে শরণ লইলাম, রাখিতে হয় রাখো—মারিতে হয় মারো—দাসোঽহং—দাসস্য দাসোঽহং—"অব্ তারণ-ভার তুহারা।"

শরণাগতির কথা মুখে বলা খুবই সহজ, কিন্তু সত্য সত্য শরণাগত হওয়া বড়ই দুরূহ। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড, হ'তে কি দেয়? যার তিন কুলে কেউ নাই, তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে! সে-ও বিড়ালের মাছ দুধ যোগাড় কর্‌বে,—আর বল্‌বে মাছ দুধ না হ'লে বিড়ালটা খায় না, কি করি!"

মহাপুরুষগণ এই বিষয়ে এক মত যে, 'আমি-আমার' এই ভাব ত্যাগ করিতে না পারিলে ভক্তি আসে না এবং ভক্তি না আসিলে শরণাগতিও লাভ হয় না। আমার বলিতে জগতে যাহার কিছুই নাই—ভগবান্ তাঁহারই নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বদা বলিতেন—"আলস্য ত্যাগ কর, আর 'আমার কি হবে' এরূপ ভাবনা একেবারে ভেব না।...ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হইবার নহে।"

(২)

একদিন একজন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের অন্তরে ত জীবাত্মা আছেন, পরমাত্মাও থাকেন কি?"

মহারাজ কহিলেন—"জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন। প্রথমটি ঊষা ও দ্বিতীয়টি সূর্য্য।"

"অন্তঃকরণের ময়লা তোমরা কিরূপে পরিষ্কার করিবে?......কেহ বলিবেন যাগ-যজ্ঞ কর—কেহ বলিবেন বেদ-বেদান্ত পাঠ কর, কেহ বলিবেন দান-ধ্যান কর। কিন্তু ইহার কোনটাই সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য নহে।......আছে এক হরিনাম বা শ্রীভগবানের নাম। নামে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, নামজপ কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য নয়,

কঠোরও নয়। এই নাম জপ করিতে করিতে মনের ময়লা ধুইয়া পরিষ্কার হইবে এবং অন্তরস্থিত পরমাত্মা প্রকাশিত হইবেন।"

ভিতর কঁহু তো জগময় লাজে—
বাহার কঁহু তো ঝুটা লো।
বাহার ভিতর সকল নিরন্তর
চিৎ অচিৎ দো পীঠা লো।—কবীর।

—যদি বলি তিনি (ভগবান্) শুধু অন্তরের ভিতরেই আছেন, আর কোথাও নাই, তবে জগৎ লজ্জায় মরিয়া যাইবে—কারণ তিনি ত সর্ব্ব স্থানেই আছেন। আর যদি বলি তিনি শুধু বাহিরেই আছেন—ইহাও "ঝুটা"—কারণ তিনি ত যেমন বাহিরে, তেমনি ভিতরেও আছেন—'বাহার্ ভিতর্ সকল নিরন্তর'। অন্তরের চৈতন্য ও বাহিরের জগৎ (অ-চিৎ) এই দুই পীঠই তাঁহার পাদপীঠ।

কিন্তু শুধু নাম জপ করিলেই ত মনের ময়লা কাটে না ; ব্রহ্মচারী মহারাজ তাই বলিতেছেন—আগে নাম জপ কর, তারপর অহঙ্কারকে নাশ কর—তবে এই দুষ্ট 'আমিটার' মৃত্যু হইবে। 'আমি ও আমার' ত্যাগই সর্ব্বত্যাগ। তাহার একমাত্র উপায় সকল ভুলিয়া ভগবানের শরণাগত হওয়া—'মামেকং শরণং ব্রজ'।

একজন ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে কি করিলে মুক্ত হইব ?'

উত্তরে সস্মিতবদনে মহারাজ বলিলেন—"ভাই, বিচারবুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়-দাসত্ব মোচন হয়। 'তৃষ্ণাপি তরুণায়তে'—সেই তৃষ্ণার ক্ষয় করিতে হইবে। বিষয়-তৃষ্ণা প্রতিদিন তরুণ হইয়া উঠে—তাহাকে ইন্ধন দিও না—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিও না—"স্থির হোকে খাড়া রহো।" জ্ঞান-সূর্য্যের আরাধনা কর—জ্ঞান হইলেই তৃষ্ণা পলায়ন করিবে।

ভোগের দ্বারা কখনও ভোগ-তৃষ্ণা নিবারিত হয় না—ইন্ধন না পাইলে অগ্নি নিজেই নির্ব্বাপিত হয়। যাঁহারা বিবেকী-পুরুষ তাঁহাদেব কথা স্বতন্ত্র—তাঁহারা ভোগের পথে ত্যাগে আসিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ভোগ-বাসনাকে দমন করিয়া রাখাই প্রকৃষ্ট পন্থা। উহাকে দাবাইতে দাবাইতে, উহা দাবিয়াই যাইবে—আর মনে উদিত হইবে না। ভোগের কি শেষ আছে? 'তৃষ্ণাপি তরুণায়তে।'

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র—তাঁহার ভোগ বাসনা পূর্ণ হওয়াও মুস্কিল। "ভোগ্‌সে ভোগ পূরণ নেহি হোতা—ত্যাগসেই পূরণ হোতা।" কিন্তু তোমরা গৃহী। ভোগের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবার উপায় তোমাদের নাই। তোমাদিগকে যখন ভোগের মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হইবে তখন—"অন্তরে নিবৃত্তি", "বাহিরে প্রবৃত্তি" হইয়া সংসারে থাক। কিন্তু অন্তরে যাহার প্রবৃত্তি এবং বাহিরে নিবৃত্তি—"এ-তো হুয়া মর্কট বৈরাগ্য—বড়া খারাপ্ চিজ্"—"মিথ্যাচার স উচ্যতে।"

আমার উপদেশ এই যে, শুভ কর্ম্ম যখনই তোমার সম্মুখে আসিবে তৎক্ষণাৎ উহা সুসম্পন্ন করিবে—কিন্তু উহার ফল ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিবে।

ক্ষণং চিত্তং ক্ষণং বিত্তম্
ক্ষণং মানবজীবনম্।
যমস্য করুণা নাস্তি
ধর্ম্মস্য ত্বরিতা গতি।

চিত্তবৃত্তি প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, তাই "শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্।"

কি বলিতেছ—'ঈশ্বর বহুৎ দূরমে হ্যায়!'—না ভাই, ঈশ্বর ত তোমার খুব নিকটে—"বহুত নগিচ্"— হস্তামলকবৎ।

জল্‌মে বৈঠে কমলিনী, সূর্য্য বৈঠে আকাশ,—
যো যিস্‌কো হৃদয়মে বৈঠে ; ওহি উসিকো পাশ।

সত্যিকার প্রেম যেখানে সেখানে দূরত্ব বা ব্যবধান নাই। প্রীতির বস্তু যতই দূরে থাকুক, এক টান—এক ভালবাসা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তুমি যদি ঈশ্বরকে ভালবাস তবে ঈশ্বর চাহেন—তিনি যতই দূরে থাকুন তাঁহার নামস্মরণ মাত্রেই তোমার হৃৎকমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

আসল প্রেমের মৃত্যু নাই—তাহার দূর-নিকট নাই। এই দেখ না, পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে—আর তাহাকে পাইবার উপায় নাই—কিন্তু পুত্রশোকাতুরা মাতার হৃদয়ে পুত্র-প্রেম মরে নাই—জীবন্ত ও জাগ্রত রহিয়াছে! প্রেম যদি একবার হইল, তবে আর টুটিবে না। যদি কোন মতে ঈশ্বরকে একটিবার ভালবাসিতে পার তবে দেখিবে, সে প্রেম অজর অমর হইয়া তোমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে আসন হইতে তাহাকে তখন হটায় কে?—"অজর-অমর হোকে হৃদয়মে বৈঠ্‌ যায়ে গা, আউর উঠে গা নেহি।"

কিন্তু সাধক দুইপ্রকারের—সকামী ও নিষ্কামী। সকামী সাধকের প্রেম স্থায়িত্বহীন—"যব্‌ তক্‌ উস্‌কা কামনা পূরণ নেহি হোতা, তব্‌ তক্‌ উস্‌কা প্রেম।" কামনা পূর্ণ হইলেই বাস্‌—ছুটি—আর সে ভগবান্‌কে ডাকিবে না। ভগবান্‌ নিষ্কামী ভক্তকে কোন বিভূতি দেন না বটে—সকামীকেই দেন। কিন্তু—"নিষ্কামী কো ভগবান্‌ নিজ কো দে দেতা হ্যায়।"

পরমাত্মারূপী সেই রাজার নিকট অন্য কোন-কিছু যাচ্ঞা করিও না, তুমি তাঁহাকেই চাও। যদি রাজাকে পাওয়া যায় তবে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অষ্টসিদ্ধিরূপী সম্পদ্‌ ও বিভূতিও আপনা হইতেই আসিবে—

'নিষ্কামী-সাধক কুছ্ মাংতা নেহি, পরন্তু উস্‌কা সর্ব্বকামনা আপ সে আপ্ পূরণ হো যাতা।"

ভগবৎপ্রেমের বিশেষত্ব এই যে, আগে তুমি যদি তাঁহার হও—তবেই তিনি তোমার হইবেন—নতুবা নহে। দুই চারিবার ভগবানের নাম করিয়াই তাঁহাকে চাহিতেছ? ইহা দুরাশা—"এতো ভাই হোগা নেহি।" যতক্ষণ হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বভাব না আসিবে ততক্ষণ ঈশ্বরের সন্ধান মিলিবে না। আগে সাত্ত্বিক বস্তু ব্যবহার, সাত্ত্বিক আহার ইত্যাদি দ্বারা সত্ত্বগুণকে বৃদ্ধি কর। উহা বৃদ্ধি হইলেই ঈশ্বর নিকট হইবেন। তাঁহার নিকটে যাইবার আর একটি সুগম প্রশস্ত পথ হইতেছে—'সর্ব্বদা সৎসঙ্গ' (সদালোচনা) ও 'সাধুসঙ্গ'।

দেশপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে একদিন ব্রহ্মচারী-মহারাজের 'জাতি' সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু বলিলেন—"আমি ঈশ্বরকৃত জাতি মানি—মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি মানি না।" ইহার পর এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা হইল। মহারাজ কহিলেন—"আপনি আপনার স্ত্রীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, সেইরূপ ব্যবহার কি আপনার মাতা, ভগ্নী, কন্যার উপর করেন?"

রাজনারায়ণ বাবু কহিলেন—'না বাবা, তাহা করি না।' উত্তরে মহারাজ বলিলেন—"বাবুজি মানুষ এই মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি জাতি সৃষ্টি করিয়াছে—ঈশ্বর উহা করেন নাই। ঈশ্বর ত এক স্ত্রীজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে আপনি কি নিমিত্ত সকলের সহিত একরূপ ব্যবহার করেন না?"

রাজনারায়ণ বাবুকে নিরুত্তর দেখিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"যতক্ষণ না পূর্ণজ্ঞান জন্মিবে ততক্ষণ আপনাকে জাতি মানিয়া চলিতে

হইবে। আপনি ত এক স্ত্রীজাতির মধ্যেই কত জাতি বাহির করিলেন। এইরূপ সর্ব্বত্র করিতে হইবে, না করিয়া উপায় নাই। যদি আপনি স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতির সহিত একরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার জাতি-বিচারের আবশ্যকতা থাকিবে না। যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ আপনাকে জাতি-বিচার করিয়া চলিতে হইবে।"

ব্রহ্মচারী-মহারাজ বলিয়াছেন যে, এই কথা রাজনারায়ণ বাবুর মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল এবং তিনি গৃহে ফিরিয়া তাঁহার বাবুর্চিকে তাড়াইয়া এক ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৩)

একদিন একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে 'মন্ত্রশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি' সম্বন্ধে কথা উঠিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—'দ্রব্যশক্তি যে আছে তাহা বিশ্বাস করি, কারণ ঔষধ দিলে রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু মন্ত্রের কোন শক্তি থাকা আমি বিশ্বাস করি না।'

মহারাজ বলিলেন—"মন্ত্র-শক্তি বলিলে শব্দ-শক্তি বুঝায়। এই শব্দ দুই প্রকার—ধন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। বজ্রের শব্দ শুনিয়াছেন ত? এই শব্দ শুনিবামাত্র আপনার দেহ ও মন ভয়ে সঙ্কুচিত হয় নাই কি? নিশ্চয়ই এই শব্দে ভয়ে বিহ্বল ও চকিত হইয়াছেন। আবার মধুর সঙ্গীত-ধ্বনিও শুনিয়া থাকিবেন। শুনিয়া কি আপনার অন্তরে একটা স্নিগ্ধ ভাব আসে নাই? এই যে বজ্রনিনাদ ও সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিয়া আপনার মনে ভয় ও শান্তির সঞ্চার হইল, ইহা ধন্যাত্মক শব্দের (ক্রিয়া) প্রভাবে। তারপর বর্ণাত্মক শক্তি। তাহার ক্রিয়া কিরূপ? দূর হইতে আপনাকে যদি কেহ বিপিন বাবু বলিয়া ডাকে, তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন। এইরূপ ঈশ্বরের নাম লইয়া কেহ

যদি বর্ণাত্মক ধ্বনি করে, তাহা হইলে তাহা ঈশ্বরের নিকট গিয়া পৌঁছায়। অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রশক্তির মধ্যে বর্ণাত্মক ও ধন্যাত্মক উভয় ক্রিয়াই বর্ত্তমান। ক্রিয়াটা কি তাহা এখন বুঝিলেন। তখন মন্ত্র-শক্তিকে আর অবিশ্বাস করিতে পাবেন না। এই দেখুন, আপনার প্রতি যতক্ষণ আমি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিব, ততক্ষণ আপনি মুগ্ধ হইয়া শুনিবেন ; আর রূঢ় বাক্য বলিলে আপনি এখনি এ স্থান ত্যাগ করিবেন। এই যে বাক্য, ইহা অর্থযুক্ত শব্দ,—এই জন্য ইহাব শক্তি আরও অধিক। এই যে বাক্য-প্রয়োগ ইহা মন্ত্র-শক্তি ছাড়া আব কিছু নহে। আপনাকে নাম ধরিয়া ডাকিলে আপনি সাড়া দেন, ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি কেন সাড়া দিবেন না ? প্রভেদ এই—আপানাকে পাইতে হইলে চাই মুখেব ডাক, আর একবার ডাকিলেই আপনি সাড়া দিবেন—ঈশ্বরকে পাইতে হইলে চাই প্রাণের ডাক। এই যে ডাক, এই যে আহ্বান—ইহাই মন্ত্রশক্তি।

একজন জিজ্ঞাসু একদিন কহিলেন—মহারাজ আপনার উপদেশ শুনিব বলিয়াই ত বসিয়া আছি, কিন্তু আমার মন যে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ইহার কি উপায় করিব ?

মহারাজ বলিলেন—'মনকে ছুটিতে দাও। ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইয়া সে আর দৌড়াইতে পারিবে না, আপনিই স্থির হইয়া যাইবে। হঠযোগে মন স্থির করিবার অনেক প্রক্রিয়া আছে। সে সকল ক্রিয়া করিলে চঞ্চল মনকে বলপূর্ব্বক স্থির করিতে পারা যায়। কিন্তু সে পথ তোমাদের (গৃহীদের) জন্য নয়। তোমাদের জন্য 'রাজযোগ'ই ঠিক পথ। রাজ-যোগ বলে—মনের উপর 'জবরদস্তি' (জোর) করিবে না—উহাকে পিঠে হাত বুলাইয়া স্থির করিবে অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা বিচাব করিবে। গঙ্গার দুইটি তীর—দুই তীরই বালুকাপূর্ণ। যদি একটি

দুষ্ট অশ্বকে সেই বালির উপর ছাড়িয়া দিয়া দুই চাবুক লাগাইয়া দাও, অশ্ব তখন কি করিবে ? খুব দৌড়াইবে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে শেষে নিজেই থামিয়া যাইবে—কারণ বালির মধ্যে সে আর কতই ছুটিতে পারে! জ্ঞানরূপী গঙ্গার বিচাররূপী দুইটি তট। মনরূপী দুষ্ট অশ্বকে সেই তটে ছাড়িয়া দাও—তখন মন আর কতই দৌড়াইবে।

"যত্র যত্র মনোযাতি
তত্র তত্র সমাধয়।"

মন যেখানে যাইবে উহাকে সেইখানেই সমাধিমগ্ন করিয়া দাও। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী বিভু। চৈতন্য-সত্বাই উহার রাজত্ব। সেই রাজত্ব ছাড়িয়া মন আর কোথায় যাইতে পারে ? উহার ত পলায়ন করিবার আর অন্য স্থান নাই; যে বস্তুতে মন যাইতেছে—বিচার কর—বিচার করিয়া মনকে বুঝাইয়া দাও যে, সেখানেও সেই ঈশ্বরসত্বাই বর্ত্তমান—এবং সেইখানেই উহাকে সমাধিস্থ করিয়া দাও।

জিজ্ঞাসু কহিলেন—মহারাজ এই মধুর 'সৎসঙ্গ' শুনিতেছি বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে মন ছুটিয়া আমার কর্ম্মস্থানে যাইতেছে। আমার পুত্রেরা আমার অনুপস্থিতিতে সেখানে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে কি না, এক একবার তাহাই দেখিয়া আসিতেছে!

মহারাজ বলিলেন—ভাই তুকি কি অর্থ উপার্জ্জন কর? তুমি কে? তোমার ভাগ্য ভাল তাই পরমাত্মা আপনা হইতেই প্রচুর অর্থ তোমাকে দিতেছেন। 'আমি উপার্জ্জন করি' এই ভাবটি ত্যাগ কর। যাঁহাকে ঈশ্বর দেন তিনিই শুধু ধন দৌলৎ পান—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচীন্।

বলিবে ঈশ্বরই যদি দেন—তবে তিনি একজনকে দেন, আর, আর একজনকে দেন না কেন? শাস্ত্র বলেন, যাহার যেমন ধর্ম্ম তাহার

তেমনিই ফল মিলে। গত জন্মের পুরুষার্থ এ জন্মের ফল-দাতা। এই জন্যই ত দান-পুণ্য করিবার এত ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। তুমি এ জন্মে যাহা দান করিবে আগামী জন্মের জন্য তাহাই তোমার পুঁজি হইয়া থাকিবে। এক টাকা যদি উপার্জ্জন কর, তবে আট আনা ভরণ-পোষণাদির জন্য ব্যয় করিবে, চারি আনা অসময়ের জন্য সঞ্চয় এবং বাকি চারি আনা দান করিবে। এই দান তোমার 'বড় ব্যাঙ্কে' জমা থাকিবে জানিবে। পর জন্মে উহা পাইবে। গত জন্মের দানের ফল এ জন্মে পাইতেছ। এ জন্মেও দান করিতে থাক, নহিলে আগামী জন্মে অনাহারে থাকিবে!

প্রশ্ন হইল—মহারাজ, ভগবানের দিকে ত মন টানে না। কি করিলে তাঁহাতে রুচি হইবে?

মহারাজ উত্তর দিলেন—ঈশ্বরের দিকে যে মন যায় না ইহার কারণ—ঈশ্বরবিষয়ক কথায় তোমার "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বেমারি" হইয়াছে তোমাকে পাঁচন খাইতে হইবে। তাহা হইলেই অরুচি যাইবে। সৎসঙ্গ বা সদালোচনাই সেই পাঁচন। অল্প সৎসঙ্গেরও বৃহৎ ফল। গুরু ধর্ম্মপিতা। শিষ্য তাঁহার পুত্র। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরু সর্ব্বদা তাহার কানের কাছে বলেন—তুমি জীব নও, তুমি শিব—তুমি আত্মা—"জীবোহম্—ভ্রান্তিকো ছোড়্ দেও, তোম্‌কা মোক্ষ হো যায়েগা।" তুমি বলিবে, আমার ভিতরেই যদি আত্মধন আছেন—তবে আমি তাঁহার দর্শন পাই না কেন? দেখনি কি, লোকে কানে কলম গুঁজিয়া রাখিয়া 'কলম কৈ, কলম কৈ' করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়? চোখের কোণে কাজল দেওয়া হইয়াছে, কাজল ত চোখেই আছে—কিন্তু চক্ষু উহা দেখিতে পায় না। আত্মাও তেমনি আমাদের অতি নিকটে আছেন। স্বচ্ছ দর্পণের নিকট দাঁড়াইলে যেমন চোখের কাজল চোখে দেখিতে পাওয়া

যায়, তেমনি চিত্ত-দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলেই আত্মধনের দর্শন হয়। দর্পণ স্বচ্ছ হওয়া চাই—উহাতে ময়লা থাকিলে দর্শন হয় না। সেইজন্য "সাধন রূপ মাজন্‌সে চিত্ত-দর্পণকো নির্ম্মল কর্‌না।" হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সকলেই একথা মানে। মুসলমান বলে—দিল্‌কো সাফ্‌ কর্‌না'—হিন্দুরা বলে—'চিত্তমল ক্ষালন্‌ কর্‌না।' চঞ্চলতাই চিত্তমল, চঞ্চলতা দূর হইলেই স্বরূপ দর্শন হয়। ভক্তেরা সেই স্বরূপকে বলে—ভগবান্‌, মদনমোহন,—জ্ঞানী বলে ব্রহ্ম, যোগী বলেন—আত্মা, শক্তি-উপাসক উহাকেই বলে প্রকৃতি। 'চিত্ত স্থির কর' এই উপদেশটুকু মাত্রই গুরু দিতে পারেন—চিত্তকে তিনি স্থির করিয়া দিতে পাবেন না। সাধনা দ্বারা শিষ্যকেই উহা করিয়া লইতে হয়।

ব্রহ্মচারী-মহারাজ একদিন কহিলেন—

মর্‌না মর্‌না সব কোই কহে,
মর্‌ ভিনা জানে কোই।
এ্যায়সি মর্‌না যো মরে,
ফের্‌ না আবন্‌ হোই॥

জীব ত দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যুর মুখে যাইতেছে, কিন্তু সেরূপ মৃত্যুতে লাভ কি? এমন মৃত্যু চাই যে, আর পুনরাবৃত্তি না হয়—ন স পুনরাবর্ত্ততে। জগৎ-সংসারে সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে, আবার এমনও কেহ কেহ আছেন, মৃত্যু যাঁহার আনন্দের কারণ। ইহার হেতু কি? আমার মনে হয়, যাহার পুণ্যাংশ কিছু বেশী, কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে যে, সে মৃত্যুকে ভয় কবে না। যাহার পাপ বেশী, পুণ্য কম এবং অজ্ঞানতাও যাহার বেশী—মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহারই ভয় বেশী হয়। পাপের দ্বারা পুণ্যের খণ্ডন হয় না, আবার পুণ্যও পাপের ভারকে লঘু করিতে

পারে না। তবে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপের কিছু খণ্ডন হইতে পারে বলিয়াই শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি আছে।

দেখ, রোগ দুই প্রকার—এক "প্রারব্ধিক," আর এক 'আগন্তুক'। প্রারব্ধের কারণে যে রোগ হয় হাজার বৈদ্যের ঔষধে তাহা দূর হয় না। ঔষধে শুধু 'আগন্তুক'-ব্যাধিই দূরীভূত হইয়া থাকে। রোগ হইলে—উহা প্রারব্ধিক কি আগন্তুক তাহা যখন বুঝিতে পারা যায় না, তখন উপশমের জন্য ঔষধ খাওয়া চাই, আবার রোগ-শান্তির জন্য শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্তাদিও চাই।

রোগ দেহেও হয়, মনেও হয়। শারীরিক রোগের নাম ব্যাধি, আর মানসিক রোগের নাম আধি,—উহা শোক দুঃখ ইত্যাদি। ব্যাধি দূর করিবার ত অনেক উপায় আছে, কিন্তু 'আধি' বিদূরিত হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে,—"মন্‌কো বিভাগ কর্ দেও, মন্‌কা যো দুঃখকারী-বৃত্তি উস্‌কো ঘুমায় দেও"—শোক-দুঃখের সময় উপস্থিত হইলে "মন্‌কো আপ্‌না ইষ্ট-চিন্তামে লাগায় দেও"—পরমাত্মার সহিত মনের সংযোগ করিতে পারিলেই 'আধি' হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। কিন্তু ইহা সাধকদিগের পক্ষেই সম্ভব। তবে সাধারণ লোকে কি করিবে?—"মন্‌কো কোই রীতিসে ভুলাও।"

বিচার করিতে পারিলেই 'আধি' দূর হয়। শোক-দুঃখ উপস্থিত হইলে বিচার কর—পরমাত্মাই আমার মহাজন—আমি পাপরূপী ঋণ-জালে বদ্ধ। সুতরাং মহাজনের ঋণ ত শোধ করিতেই হইবে। দুঃখ বা শোক ভোগের দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধিত হয়।

আবার দেখ—পরমাত্মা নিষ্ঠুর মহাজন নহেন, পরম দয়ালু—"একদম্ সমুচা ঋণ শোধ কর্‌নে নেহি চাহ্‌তা—কিস্তিবন্দি কর্‌কে ঋণ উশুল্ কর্ লেতা।" যদি তিনি এক বারেই পুরাপুরি ঋণ "উশুল্" করিয়া লন

তবে ত তোমাকে দুঃসহ দুঃখ ও শোকের ভিতর পড়িতে হইবে! তিনি সেরূপ করেন না—কিস্তিবন্দি—করেন। সে কেমন জান? মনে কর তোমার চারিটি পুত্র আছে। এক পুত্রের মৃত্যুতে তুমি শোকে কাতব হইলে, আবার কিছুকাল পর অন্য পুত্রের বিবাহ দিয়া উৎসবে মাতিলে, শোক ভুলিলে—কখনও বা শবীরে রোগ হইল, কখনও আবার সুন্দব সুস্থ সবল দেহে বিচরণ করিতে লাগিলে—বোগ-যাতনা ভুলিয়া গেলে।

প্রশ্নকারী ভক্ত কহিলেন—মহারাজ, পরমাত্মদেব যদি এতই করুণাময় তাহা হইলে তিনি সমুদয় ঋণ মাফ্ দিলেই ত পারেন—আদায় করিয়া লন কেন?

মৃদুহাস্য করিয়া মহারাজ বলিলেন—তিনি ত ভাই কিছু কিছু সর্ব্বদাই ছাড়িয়া দেন। আসল ঋণের মাফ্ হয় না—"সুদ" মাফ্ হয়। যে ব্যক্তি পরমাত্মদেবের ভজনা করে তাহাকে সুদটা দিতে হয় না,—তবে আসলটি দিতেই হইবে।

প্রশ্নকারী কহিলেন—মহারাজ, আসলই যদি না ছাড়িলেন, তবে শুধু সুদ ছাড়িলে আর কি হইল?

মহারাজ বলিলেন—"আরে কোভি কোভি মূল সে সুদ যাস্তি হো যাতা—সুদ্‌সেই ত করজ্‌দার কাবু হো যাতা হ্যায়। সুদ নেহি লেগা—আউর, মূল ভি কিস্তিবন্দি কর্‌কে লেগা,—ইস্ মাফিক্ মহাজন্‌কো দয়াময় বোল্‌নেই হোগা।"

তবে এখন প্রশ্ন এই যে, মূলই বা কোন্‌টি, আর সুদই বা কোনটি। তোমার পাপের ফলে ব্যাধি হইল, অনেক যন্ত্রণাও পাইলে—ইহাকেই বলি মূল। আর ব্যাধির ফলে যন্ত্রণা পাইলে কিন্তু "হায়রে বাপ্‌রে কর্‌কে বহুৎ কাতর নেহি হুয়া—আপ্‌না ইষ্ট চিন্তামে মন্‌কো নিযুক্ত কর্ রাখা—ইস্‌কো সুদ্ নেহি লাগ্‌তা।" ব্যাধিই মূল আর ব্যাধিজনিত যে

'আধি' উহাই সুদ। রোগ আসে আসুক্, শোক আসে আসুক্, দুঃখ আসে আসুক্—যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে ভজনা করে সে আনন্দচিত্তে সে সকলই গ্রহণ করে—আনন্দচিত্তে সে সকলই ভোগ করে। তাই কথায় বলে—

"দুঃখ পাইয়ে তো সুখ লাগাইয়ে।"

মনে সন্তাপ আনিয়া লাভ কি? উহাতে দুঃখই আরও তীব্রতর হইয়া উঠে—"আপত্তি পড়্‌নেসে বিষণ্ণ নেহি হোন', সন্তাপ নেহি লে আনা।" সন্তাপ দেহকে পর্য্যন্ত বিশুষ্ক করিয়া দেয়—দেহে ব্যাধি আনে—এক গুণ দুঃখ দশ গুণ হইয়া উঠে। কাজেই—"আপত্তি কাল্‌মে আনন্দ লে আও, আপত্তি হট্ যায়েগা। আলো লে আনেসে অন্ধকার আপ্-সেই চলা যায়গা—সুখ আনেসে দুঃখ আপ্‌সেই হট্ যায়েগা।" তাই ভগবান্ বলিতেছেন—"গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ"—মৃত বা জীবিতের জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। পিতামহ ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দানকালে বলিয়াছিলেন—বিপৎকালে সন্তাপ করিও না, বিষণ্ণ হইও না। বিচারপূর্ব্বক উহাকে সরাইয়া দাও—তবেই "লঘু হো যায়েগা।"

"ঈশ্বর মঙ্গলময় এহি মহাবাক্য ধারণা কর্‌না চাহিয়ে—ইস্‌মে মনুষ্যকা এক পরম বিশ্রান্তি মিলে গা। রোগ, শোক, দুঃখ যো পড়ে, পরন্তু উস্‌মে চিত্ত-চাঞ্চল্য নাহি আবেগা।" তোমার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, এখন যদি তোমাকে বলি—"ইস্‌মে তোমারা মঙ্গল্ হুয়া"—তাহা হইলে অত্যন্ত রূঢ় শুনাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার মঙ্গল হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখ—আজ তোমার মনে যে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে,—এ ভাব ত আগে কখনো তোমার হয় নাই। স্ত্রীবিয়োগ-দুঃখ তোমার মনে এই বৈরাগ্য আনিয়া দিয়াছে। দুঃখের মধ্যে না পড়িলে

—"আদ্‌মিকা ঈশ্বরকো স্মরণ নেহি হোতা—বৈরাগ্য নেহি আতা—ঈশ্বরকো স্মরণ কর্‌নেকা মত্‌লব নেহি আতা।"

পুরাণেও দেখ, কুন্তীদেবী তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বলিয়াছিলেন—'হে ভগবান্, যদি বর দিবে তবে এই বর দাও যেন আমার দুঃখই আসে। যদি আমাকে সুখ দাও তাহা হইলে ত আমি তোমার কথা ভুলিয়া যাইব। দুঃখ দিলেই আমি তোমাকে নিয়ত ডাকিব।' এই দেখ, স্ত্রী-বিয়োগ রূপ দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়াছ বলিয়াই আজ তুমি আমার নিকটে শান্তিকামী হইয়া আসিয়াছ—সৎসঙ্গ চাহিতেছ—ঈশ্বরের কথা শুনিবার জন্য তোমার মন অগ্রসর হইয়াছে। তুমি এখন "শুক্ল সন্ন্যাসী" হইয়া যাও—"সাদা কাপ্‌ড়া পিন্‌কে সাদা স্বভাব লাভ কর্ যাও।"

নাম, রূপ, ক্রিয়া—ইহারাই মায়ায় তিনটি গুণ। এ গুলি নাশশীল। কিন্তু ঈশ্বরের তিনটি গুণ—অস্তি, ভাতি, প্রিয়—চিরস্থায়ী এবং এ গুলি ছাড়া জগৎ-সংসারে অন্য আর কিছুই নাই। মূলে শুধু ঈশ্বর, আর সবই মায়ার খেলা। "সোনেকা ডেলা ঈশ্বর; যেত্‌না অলঙ্কার সাজায়া হুয়া—ও হুয়া মায়া—ঈশ্বর সোনেকা ডেলা রূপ্‌সে, অলঙ্কার রূপ্‌মে সাজায়া হুয়া। ঈশ্বর-সোনা ছোড়কে ভূষণ্‌কো কোই অস্তিত্ব নেহি রহ্‌তা—এ্যায়সাই ঈশ্বর ছোড়কে এহি জগৎ-সংসারকো কুছ্ অস্তিত্ব নেহি রহ্‌তা।" এই পরিদৃশ্যমান জগতে কত কি দেখিতেছ—এই ঘর, বাড়ী, মনুষ্য যাহা কিছু আছে সবই মায়ার খেলা—উহাদের মূলে আছেন এক-মাত্র ঈশ্বর—তিনি চিরদিন আছেন (অস্তি)—তিনি প্রকাশিত অবস্থায় আছেন (ভাতি)—তিনি আনন্দ রূপে সর্ব্ব প্রাণীতে নিত্য বিরাজ করিতেছেন (প্রিয়)।

আমার কাছে কত লোক আসে। কেহ কেহ বলে—মহারাজ, ঈশ্বর নাই। আমি শুনি এবং হাস্য করি। তাহাদের অন্তরের মধ্যে সাক্ষী

স্বরূপ যিনি দাঁড়াইয়া আছেন এবং বলিতেছেন ঈশ্বর নাই—আমি সেই সাক্ষীকেই বলি ঈশ্বর—তাঁকেই বলি পরমাত্মা। তাহাদের বলি—বাবা, তোমরা কেমন নাস্তিক? নাস্তিক ত পৃথিবীতে কেহ নাই। 'নেতি নেতি' করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছ—অর্থাৎ যে অন্তরতম বস্তুটি বলিতেছে ঈশ্বর নাই, সেই অন্তরতম বস্তুটকেই ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লও। তিনিই ত সাক্ষী। এক পক্ষ বলিতেছে ঈশ্বর নাই—অপর পক্ষ বলিতেছে ঈশ্বর আছে—"পরন্তু দোনো মতাবলম্বীই এক ঈশ্বর-সত্ত্বাকোই প্রতিপাদন্ কর্ দেতা হ্যায়।"

(৪)

বহুদিন পূর্ব্বে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের রেল-ষ্টেশন আড়ংঘাটায় ট্রেন-সংঘর্ষে বহুলোক প্রাণ হারাইয়াছিল। সেই বিষয়ের তদন্তের ভার ছিল তদানীন্তন রানাঘাট মহকুমার হাকিম স্বর্গীয় রামচরণ বাবুর উপর। এই তদন্তকার্য্যে লিপ্ত হইয়া রামচরণ বাবুকে বিষম বিপদ-গ্রস্ত হইতে হয়। সেই সময়ে তাঁহার জননী দিবানিশি আকুল চিত্তে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন এবং একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন, স্বয়ং ভগবান্ একজন যোগীর মূর্ত্তিতে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং অভয় দিতেছেন।

প্রভাতে গৃহের দ্বার মোচন করিবামাত্র তিনি দেখিলেন—দ্বারে একটি সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীর দেহ হইতে তখন তপস্যালব্ধ তেজ নির্গত হইতে-ছিল এবং তাঁহার জটাজূটসমন্বিত বরবপু যেন পরমযোগী মহাদেবেরই বপু বলিয়া মনে হইতেছিল! রামচরণ-জননীর অন্তর এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে তোমার ভগবান্ সম্মুখে। সে সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে রামচরণ বাবু সাধু-সন্ন্যাসীদিগের উপর আস্থা ও শ্রদ্ধা-

শূন্য ছিলেন। কিন্তু দ্বারে উপস্থিত সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রভাবে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইল এবং সাধুর কৃপায় সকল বিপদ আকাশে মেঘের মত সরিয়া গেল! তিনি তখন সেই সন্ন্যাসীর চরণে আত্ম-বিক্রয় করিলেন। সেই সন্ন্যাসীই মহাতাপস বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। ইহার পর দশ বৎসর চলিয়া গেল। অবিশ্বাসী রামচরণ তখন পরম ভক্ত রামচরণ হইয়াছেন এবং তাঁহার শ্রীগুরুর জন্য তপোবনের শিখর-দেশে বাসোপযোগী গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই সামান্য সেবা করিয়াই তুষ্ট হইতে পারিলেন না, পরে করণীবাগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত করিয়া সেই আশ্রমে গুরুদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই আশ্রমের নাম রামনিবাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রহ্মচারী-মহারাজ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই আশ্রমেই বাস করিতেন। একদিন যাহা ক্ষুদ্র একটি আশ্রম ছিল, কালক্রমে সেখানে দেবমন্দির রচিত হইল, বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া গেল।

সেই শান্ত শুদ্ধ তপোনিকুঞ্জে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নানা শ্রেণীর নানা রকমের স্ত্রীলোক ও পুরুষ সমবেত হইয়া সদানন্দ মহাতাপসের উপদেশ লাভ করিয়া আপন আপন সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, আপন আপন গন্তব্য পথ চিনিয়া লইয়াছেন এবং চিত্তের শান্তি ও ধৈর্য্য লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

এই সুপ্রসিদ্ধ আশ্রম সম্পর্কে ব্রহ্মচারী মহারাজ একদিন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কথাপ্রসঙ্গে তিনি কহিলেন:—"অনেকেই চায় এই আশ্রমে বিদ্যুতের বাতি হয়, কেহ মার্ব্বেল পাথর দিয়া এই আশ্রম বাঁধাইতে চান, আমি রাজি নই। এই সব ভোগ-বিলাসের ব্যাপার যদি আশ্রমে হয়, তবে তাহার

অন্য ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হওয়া ঠিক নয়, সংযোগ হইলেই আসক্তি জন্মায়। সাধুদের ভোগ্যবস্তু হইতে খুব সতর্ক থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মা বিষ্ণুও মায়াধীন। আজন্ম ব্রহ্মচারী মহাতপা সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতনের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়া থাকিবে। তাঁহারা দ্বন্দ্বরহিত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন ইন্দ্র কয়েকটি ফল লইয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মচারীর পক্ষে চিত্তজয় অত্যাবশ্যক।" গৃহীভক্ত যখন সন্ন্যাসী গুরুর নিকট ত্যাগের মাহাত্ম্য শিক্ষা করে তখন যদি সেই আশ্রমে গৃহীর যোগ্য ভোগ বিলাসের বস্তু দেখিতে পায় তখন ত্যাগের মন্ত্র তাহার অন্তরে না আসিয়া দূরে ভাসিয়া যায়!

ব্রহ্মচারী-মহারাজ একদিন সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"মহারাজ আপ্ ম্যানেজার বন্ যাইয়ে।" এই ধন দৌলত্, বিষয় সম্পত্তি যাহা আপনার আছে, তাহা আপনার নহে মনে করিবেন; মনে করিবেন, এই সম্পত্তি অপরের—শ্রীভগবানের। আপনি তাঁহার কর্ম্মচারী মাত্র। তাহা হইলে মনে অভিমান আসিবে না। অভিমানই সর্ব্বনাশ করে। মালিককে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া চলিলে অভিমান আসিতে পারে না।—

মেরা মুঝ্‌কো কুছ্ নহিঁ, যো কুছ্ হৈ সো তোর।
তোরা তুঝ্‌কো সোঁপ্‌তা, ক্যা লাগে হৈ মোর॥

—হে প্রভু এজগতে আমার ত 'কুছ্ নহি—কুছ্ নহি'—কিছুই নাই। যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই ত তোমার। তোমার বস্তু তোমাকে দিব—ইহাতে আর আমার কি?

কতকগুলি যুবক একবার করণীবাগ-আশ্রমে আসিয়া মহারাজকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"গান্ধীজী যে স্বরাজের জন্য চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টা সফল হইবে কি ?"

উপনিষদ্ হইতে টিট্টিভ পক্ষীর কাহিনী বর্ণনা করিয়া মহারাজজী বলিলেন—"বাচ্ছা, সামান্য চেষ্টাতে কিছু হবে না। তোমাদের এই চেষ্টার সহিত যদি দৈবী-শক্তির সংযোগ হয়, তাহা হইলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। পূর্ণ অধ্যবসায় দেখিলে দেবতারা সহায় হইয়া থাকেন।......তোমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় স্বদেশ উদ্ধার হওয়া সম্ভব নয়।...ন চ দৈবাৎ পরং বলং। দৈব সহায় হইলে সকলই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে দুইটি জিনিষের একান্ত অভাব—একটি একতা, অপরটি পুরুষার্থ। এই দুইটি যখন মিলিবে, তখন ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। এখন ভারতবর্ষে আছে দুইটি মেওয়া,—বয়ের (কুল) ও ফুট্ (ফুটী)। প্রথমটি মুখরোচক, নাম লইলেই মুখে জল আসে—উহা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ; আর অপরটি অনৈক্য, ভেদ-বুদ্ধি, হিংসা—এর ফল ঝগড়া।"

যুবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপায়ে দৈব-সাহায্য পাওয়া যায়।"

উত্তর হইল—"আত্মকৃপা দ্বারাই ভগবৎকৃপা লাভ হয় (Heaven helps those who help themselves)। এই উত্তর শুনিয়া "ছাত্রের দল প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।"

শতবর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ সাধনায় সিদ্ধ মহাতাপস শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ আর ইহজগতে নাই—তাঁহার সুধাকণ্ঠনিঃসৃত অমৃতধারা আর করণীবাগ-আশ্রমে নবজীবন সঞ্চার করে না ; কিন্তু এই সকল মহাপুরুষ মৃত্যুহীন।(১) তাঁহাদিগের অশরীরী আত্মা নিয়ত লোককল্যাণ

(১) এই ক্ষুদ্র জীবন-কথা "মহাতাপস" এবং "কথা-প্রসঙ্গ" নামক সুলিখিত গ্রন্থ দুইখানি হইতে সম্পূর্ণরূপে সঙ্কলিত হইল। সেজন্য গ্রন্থ দুইখানির যশস্বিনী লেখিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা রায় ও শ্রীযুক্তা সরলাবালা মিত্রের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাধনে নিযুক্ত আছেন, মানবের পক্ষে ইহাই আশার কথা। তাঁহাদিগের বাণীর মধ্যে তাঁহারা অনন্তকাল ধরিয়া জীবিত আছেন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীগুলি যেমন ভক্ত সাধকের পরম শ্রদ্ধার বস্তু, শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর বাণীও তেমনি—সে গুলি মূল্যবান্ ও হৃদয়স্পর্শী। সেই সকল বাণীর কয়েকটিমাত্র নিম্নে সঙ্কলিত হইল ঃ—

১। হাতে কাম মুখে রাম, ভক্তজনাকি মন বিশ্রাম। নামরূপী মিছরির টুকরা মুখে রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া যাও।

২। ক্ষমা ও সহ্যগুণ লাভ করিতে হইলে ছোট হইয়া যাও। তোমাদের বাঙ্গালা দেশে একটা কথা আছে না—'বড় যদি হ'তে চাও, ছোট হও তবে।' নিজেকে ছোট না মনে করিতে পারিলে এ পথে (ধর্ম্মপথে) অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সব সময় ভাবিবে—দাসোঽহং।

৩। কর্ম্মপথে বিঘ্ন বহু, ভক্তিমার্গে বিঘ্ন কম। চিত্তরূপ চিম্‌নিকে পরিষ্কার করিবার সহজ পন্থা—নাম জপ।...নিয়মপূর্ব্বক নামসাধন আবশ্যক।

৪। আগে চাই ব্যাকুলতা -আত্মকৃপা। ব্যাকুলতা ও আগ্রহ হইতে ভক্তির উদয়।...ধৈর্য্যের সহিত গাছের গোড়ায় জল ঢালিতে ঢালিতে গাছ বড় হয়, তখন ফল পাওয়া যায়। আগে নিয়ম পূর্ব্বক নামজপ প্রয়োজন, তবে মল নষ্ট হইবে। ('নিমখ্ নিমখ্ জপ নামক হরি'—নানক বলিতেছেন,—প্রতি নিমেষে হরিনাম জপ কর)। তজ্জপং তদর্থভাবনম্—অর্থাৎ নামের সঙ্গে তাঁর বিষয় অনুধ্যান করিবে। তবে মন ক্রমে স্থির হইবে। নিরাশ হওয়া ঠিক নয়।

৫। 'বিনা মাঙ্গে মোতি মিলে, মাঙ্গে মিলে না ভিখ্।' ভগবানের নিকট কিছু চাহিতে নাই। জীব যদি কিছু চায়, তাহা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। না চাহিলে তিনি যাহা দেন তাহা অনেক বেশী।

৬। কে কিরূপ ব্যক্তি, তাহা তাহার বাক্য শুনিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও না, তাহার ব্যবহার দেখিয়া বিচার করিবে। যে প্রকৃতই ভাল, তাহার ব্যবহারও উত্তম।

৭। হাঁড়ির মুখ চাপা থাক্‌লে গরম বেশী হয়। মন্ত্রগুপ্তি আবশ্যক। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি এখন কিরূপ ধ্যান কর্‌ছ?'—আমি যদি যথাযথ উত্তর করি, তা'হলে আমাব ধ্যানস্থ দেবতা সরে যান্—আবার অনেক সাধনা ক'বে ফিরিয়ে আন্‌তে হয়।

৮। যন্ত্রণা অনুভব করে মন। মনকে হটিয়ে অন্য দিকে নিয়ে গেলে যন্ত্রণা পেতে হয় না। মন যখন ব্যাধির যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে পড়ে তখন মনকে হটিয়ে এনে ভগবৎমুখী ক'রে দাও, যন্ত্রণার লাঘব হ'বে। ব্যাধির প্রতি মনোযোগ না দিলে, সে-ও আর তোমার প্রতি মনোযোগ দেবে না।

৯। হৃদয়সিংহাসনের ময়লা-মাটী সরাইয়া আসনকে শুদ্ধ করিতে হইবে। আবর্জ্জনা পরিষ্কার হয় নাম-জপের দ্বারা। বাবা নানক বলিয়াছেন—"হরিকা নাম কোটী পাপ ধোবে।"

১০। উপাসনায় বসিয়া যখন দেখিবে, ক্ষণিক দর্শনের পর ধ্যানেব দেবতা সরিয়া গিয়াছেন, তখন বুঝিবে তোমার চিত্ত এখনও শুদ্ধ হয় নাই। চিত্ত যত শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ তত অধিক-কাল তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

১১। জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ বরাননে।—জপ করিয়া যাও, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ করিবে—তবে অন্তর দিয়া ধ্যানের বস্তু হৃদয়ে আনিয়া জপ করিতে হইবে।

১২। যে মুহূর্ত্তে মনে অভিমান উদয় হয়, সেই মুহূর্ত্তে লোক ছোট হ'য়ে যায়। বিনয়, দীনতা, নিরভিমান মানুষকে বড় করে—ছোট করে না।

১৩। বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুবাগী
কা বা বিমুক্তির্ব্বিষয়ে বিবক্তি।
কোবাস্তি ঘোরো নবকঃ স্বদেহঃ
তৃষ্ণা ক্ষয়ং স্বর্গপদং কিমস্তি॥
(মণিরত্নমালা)

১৪। ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে করিতে ভোগপরায়ণ মন ক্রমে ভগবৎ-কর্ম্ম-পরায়ণ হয়, তৎপর ভগবৎভক্তিপরায়ণ হয়; তৎপর ভগবৎভক্তি-পরায়ণ মন ভগবৎধ্যান-পরায়ণ হয়। তৎপর ভগবৎধ্যান-পবায়ণ মন ক্রমে ভগবৎজ্ঞানপরায়ণ হয়। তখন সমস্ত অহঙ্কার শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু হইয়া যায়।

১৫। মন যায় যানে দেও, তুম্ মৎ যাও শরীর।
উৎরী ডোরী কামান্ মে কিস্ বিস্ লাগে তীর॥

মন যদি এদিক্-ওদিক্ যেতে চায়, তাকে যেতে দাও—কিন্তু তার সঙ্গে শরীরকে যেতে দিও না। মন উচ্ছৃঙ্খল হ'লে তার ইঙ্গিত অনুসারে ইন্দ্রিয়াদিকে কাজ কর্‌তে দেবে না। এইরূপ কর্‌তে কর্‌তে মনকেও বাধ্য হ'য়ে ফির্‌তে হ'বে। যেমন ধনুক ও তীর পৃথক্ পৃথক্ প'ড়ে থাকলে তদ্দ্বারা কারও কোন ক্ষতির

সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ডোরিতে বাণ সংযোজন ক'রে টান্‌লে তাতে অনিষ্ট হ'তে পারে।

১৬ মনের বল বৃদ্ধি কর্‌তে হ'লে মনের সঙ্গে কুস্তি লড়। কুস্তি কর্‌লেই মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। মনের পাপেচ্ছা দমন করাব জন্য সর্ব্বদা কুস্তি লড়া প্রয়োজন। এইরূপ দৃঢ় প্রযত্ন দ্বারা মনকে আয়ত্ত করাকেই তপস্যা বলে। মনকে আয়ত্ত কর্‌তেই হবে।

১৭ মায়াকে আশ্রয় কর্‌লে, মায়ার শরণাগত হ'লে তবে উদ্ধার পাওয়া যায়; যেমন মাতা প্রসন্ন হ'লে পিতার আদর পাওয়া যায়, তেমনি মায়ার কৃপা হ'লে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। মায়া ছেড়ে কোথায় যাবে? এই দুস্তরা মায়ার কবল থেকে কারও পরিত্রাণ নাই।

১৮। মনের স্বভাব এই, সে বিনা অবলম্বনে থাকৃতে পারে না। কোন সৎ অবলম্বন না পেলে মন কুপথে যায়, কুচিন্তা বা কুসঙ্গ অবলম্বন করে। মনকে সতত সৎপ্রসঙ্গে নিযুক্ত রাখ্‌তে পার্‌লে, সে আর নিম্ন বা কুপথগামী হতে পারে না। (মনকে সর্ব্বদা উর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম জপে নিযুক্ত রাখ্‌লে তাতেই মন ক্রমে আয়ত্ত হবে।—স্বামী শ্রুতানন্দ)।

১৯। গুরু ঈশ্বরের নিকট পৌঁছে দিবার রাস্তা জানেন। তাঁর শরণ নিলে তোমাদের পথ সুগম হবে।

২০। সাঁচ্ বরাবর তপ্ নহা হৈ, ঝুট্ বরাবর পাপ।
জাকো হির্‌দৈ সাঁচ্ হৈ তাকো হির্‌দৈ আপ্।

সত্যের সমান তপস্যা নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই। সত্য যার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, ভগবানও তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

২১। 'বড় ব্যাঙ্কের' জমা হ'তে আমরা যা' কিছু পাই—ঈশ্বর আপনা হ'তে কিছু দেন না। মানুষ সৎকার্য্যে যে খরচা করে, তা' 'বড় ব্যাঙ্কে' চলে যায়; ভবিষ্যতে তারই আয় হ'তে দিন-গুজরাণ হয়—নতুবা চতুর্দ্দিকে এত বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন? কেহ আমীর—কেহ ফকির! কর্ম্মফল অনুসারেই এই বৈষম্য।

২২। শরীরকে চাষা বানাও মনকে রাজা বানাও; মন যেন রবারের থলি, যত বড় কর্‌বে, ততই সে বাড়বে। শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী এবং মনকে উদার কর।

২৩। দীন কাঙ্গাল হ'য়ে ভগবান্‌কে ডাক্‌লে তবে তাঁর কৃপা লাভ হয়।

২৪। পরনিন্দা ত্যাগ কর্‌বে। নিন্দার দ্বারা নিজের চিত্ত যে শুধু মলিন হয়, তাহা নয়—পরের পাপ আকর্ষণ করাও হয়।

২৫। অভ্যাস, বৈরাগ্য ও অনন্যাভক্তির দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়।

২৬। কম্ খানা গম্ খানা—অল্প আহার কর্‌বে এবং ধৈর্য্য ও সন্তোষের সঙ্গে সব সহ্য কর্‌বে।

২৭। প্রবৃত্তির বিষয় বৃদ্ধি ক'রো না—বৃদ্ধিতে চিত্তের বিক্ষেপ হয় এবং সাধনের বিঘ্ন হয়।

২৮। উলট্ যাও। বিষয়মুখী মনকে ঘুরিয়ে দিয়ে ভগবৎমুখী কর—অন্তর্মুখী কর। নিজ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম না ক'রে ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম কর। তনু, মন, ধন তাঁরই প্রীত্যর্থে অর্পণ কর।

॥ "স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ" ॥

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

(১)

নাম নাম নাম, কেবল নাম। তীব্র কর্ম্ম কর, আর নাম কর।……নাম কর—নাম শোন। নামই ভগবান্। নাম না ক'রে যা' কিছু কর্‌বে, তাতে গোলক-ধাঁধায় ঘু'রে মর্‌বে। যার যে নাম ভাল লাগে সে তাই করুক্'না।

খুব জপ কর বাবা! খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়।…… জপ কর্‌তে কর্‌তেই মন স্থির হ'য়ে ইষ্টেতে লয় হ'য়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট মূর্ত্তি চিন্তা কর্‌তে হয়। তাতে জপ ধ্যান দুই-ই এক সঙ্গে হ'য়ে যায়।

সব কাজই কাজ। সাধন ভজন করাও কাজ, আবার সংসার পালন করাও কাজ। ঠিক ঠিক কর্‌তে পার্‌লেই হ'ল। সবই ভগবানের উপাসনা স্বরূপ—work is worship। যা' কিছু কর্‌বি সবই ঠাকুরের কাজ জান্‌বি। তা' হ'লে কর্ম্মেতে কখনও অপ্রীতি হ'বে না, ফলেতেও আসক্তি আস্‌বে না। কর্ম্ম কর্‌তে গেলে, প্রথমতঃ কর্ম্মেতে খুব প্রীতি থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ ফলের দিকে মোটেই দৃষ্টি থাক্‌বে না। এই হ'ল কর্ম্মযোগের secret (কৌশল)।

সব সময় মানুষের গুণ দেখ্‌তে শেখ্। পরনিন্দা পরচর্চ্চা কখনও কর্‌বিনে।… রাত দিন অপরের কুভাবগুলো আলোচনা ক'রে ক'রে··মনের উপর ঐ সব কুভাবের ছাপ প'ড়ে যায়।

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

সকল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অন্তরে ও বাহিরে গুরু হইয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে, জগদ্ধিতায় তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে তখন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, পাশ্চত্য ভাব ভারতে প্রবেশ করিয়া অনেককে ধর্ম্মহীন করিয়া তুলিতেছে। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই ঘটিতে পারে না এই সুদৃঢ় বিশ্বাসই ছিল সর্ব্ব কর্ম্মে

তাঁহার পথপ্রদর্শক। যখনই কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইত—হউক না সে দক্ষিণেশ্বরে, কি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পারিবারিক উৎসব-সভায়—তিনি সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দিতে বিরত হইতেন না। কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন, অনেকে উপদেশ পাইয়াও পাশ্চাত্য-মনোভাবের গণ্ডী হইতে নিজেকে বাহিরে আনিতে পারিতেছেন না, দয়াল ঠাকুরের হৃদয় সে জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিত। তখন তিনি কাতর হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন—"মা তোর ত্যাগী ভক্তদিগকে আনিয়া দে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোর কথা বলিয়া আনন্দ করিতে পারি।"

মা তাঁহার প্রিয়তম সন্তানের প্রার্থনা শুনিলেন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতেই গৃহী ও গৃহত্যাগী ভক্তগণ একে একে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। প্রথম আসিলেন—ডাক্তার শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুত মনোমোহন মিত্র। ইঁহারা উভয়েই ছিলেন গৃহী। ব্রাহ্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা পাঠ করিয়া এই দুই ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিনা মূল্যে প্রভুর চরণে আত্ম-বিক্রয় করিলেন।

ইহার পর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ডাক্তার রামচন্দ্রের হৃদয়ে ইষ্টদেবের আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়াই তখন ডাক্তারের কলিকাতার বাটীতে নানা উৎসব হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া রামচন্দ্র এবং মনোমোহন তাঁহাদিগের শোক-তাপে জর্জ্জরিত আত্মীয়-স্বজনদিগকে সেই আশ্রয়ে আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ভাবাবেশে এক দিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি বালককে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) কহিলেন—'এইটি তোমার পুত্র।'

ঠাকুর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন—আমি সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী—মা ভিন্ন আর কিছুই জানি না। শেষে কি এই বালকের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সব হারাইব ? তিনি মাকে কহিলেন—"সে কি ?" ঠাকুরের মনের ভাব বুঝিয়া মা একটু হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন—"সাধারণ সংসারী ভাবের ছেলে নহে, ত্যাগী মানস-পুত্র।" ঠাকুর তখন আশ্বস্ত হইলেন। কিছুদিন পরে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মনোমোহনের সহিত তাঁহার অল্পবয়স্ক ভগ্নীপতি রাখাল যখন আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন তখন ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—'এ যে সেই বালক, আমার মানস-পুত্র !'

বসিরহাট ২৪-পরগণার একটি মহকুমা। সেই মহকুমার সিক্‌রা-কুলীন গ্রামের ধনাঢ্য জমীদার আনন্দমোহন দাস-ঘোষের পুত্র রাখালের যখন জন্ম হয় তখন ছিল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস। রাখালের বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার পুণ্যশীলা জননী দেহত্যাগ করেন। বিপত্নীক আনন্দমোহন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিমাতার আদর-যত্নে রাখাল তাঁহার জননীর অভাব বুঝিতে পারিতেন না। গ্রামে বাল্যশিক্ষা লাভ করিয়া রাখাল দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কলিকাতার সুবিখ্যাত 'ট্রেণিং একাডেমীতে' পড়িতে আরম্ভ করিলেন। রাখালের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি-নবিস্ বাঙ্গালী রূপে পিতার মুখ উজ্জ্বল করিবেন। রাখালের বয়স যখন ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র সেই সময় কোন্নগরের ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের এক বৎসর পরই তাঁহার ভগবদ্ভক্ত শ্যালক মনোমোহনের সঙ্গে তিনি ঠাকুরের চরণ দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন।

যে ধর্ম্মাঙ্কুর এতদিন রাখালের হৃদয়ে গুপ্ত ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের

পুণ্যদর্শন লাভ করিবামাত্র তাহার পত্রোদ্গম হইতে লাগিল। রাখাল তখন মধ্যে মধ্যে .দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সেখানে যেন একটা নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—সে জগতে দেখিবার শুনিবার ও উপভোগ করিবার এত সামগ্রীই আছে যাহার কণিকামাত্রও কি সিক্‌রা-কুলীনগ্রামে, কি কলিকাতায় নাই! তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, দক্ষিণেশ্বরের সেই পূজারী ঠাকুর তাঁহাকে যত ভালবাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তাঁহাকে তত ভালবাসেন না—এই ঠাকুরের কাছে আসিলে রাখাল নিজেকে যতটা স্বাধীন মনে করেন, আর কোথাও গেলে তাঁহাব সে ভাব আসে না—মনে হয়, তাহারা যেন একটু দূরের লোক, যেন তাহারা খুব আপন নহে—তাহাদিগের সহিত সঙ্গ করিবার সময় যেন একটা সঙ্কোচ, একটা সমীহের ভাব কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়!

আর দক্ষিণেশ্বরে? সে যেন বানের গঙ্গা—কুলপরিপ্লাবিনী বাধা-বন্ধবিহীনা—আনন্দ, উচ্ছ্বাস, মুক্তি সবই যেন সেখানে উদ্দাম ও উচ্ছল। সেখানকার ভাষা ও ভাব যেন একেবারে ঋজুরেখায় হৃদয়ের অন্তস্তলে যাইয়া পৌঁছে, পথে কোথাও এতটুকু ঘুরপাক্ খায় না। রাখাল তাই অবকাশে এবং অনবকাশেও দক্ষিণেশ্ববে আসেন—কোন্নগরে শ্বশুরালয়ে কয়েকদিন কাটাইবেন এইরূপ বলিয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরেই সে কালটা কাটাইয়া যান। রাখালের পিতা যখন এ সকল কথা শুনিলেন তখন পুত্রের উপর বিরক্ত হইলেন—গৃহী যুবকের আবার সন্ন্যাসীর সঙ্গে এত মেলামেশা কেন?

রাখালের শ্বশ্রূ যখন শুনিলেন তখন বিরক্ত না হইয়া আনন্দিতই হইলেন। কোনও কুটুম্বিনী যেদিন তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া কহিলেন—'এখনও সাবধান হও, নতুবা ছেলে আর জামাই কবে সন্ন্যাসী হ'য়ে

যাবে!'—শ্বশ্রূ কহিলেন—'সে জন্য চিন্তা কি? আমার কি এমন সৌভাগ্য হ'বে যে, তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে!' বাঙ্গালায় নিমাই যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃআজ্ঞা ভিক্ষা করিয়াছিলেন সেদিন শচী দেবীও পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি কি বারণ করতে পারি? আমি কি পুত্রের ধর্ম্ম-পথের বিঘ্ন হ'তে পারি!' বাঙ্গালার মা এইরূপ বলিয়াই বাঙ্গালায় নিমাই আসেন—বাঙ্গালায় ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতির জন্ম হয়! একদিন শ্বশ্রূ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন—সঙ্গে কন্যা ও জামাতা। রাখালের পত্নীকে দেখিয়াই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিলেন—ইনি পতির ধর্ম্মপথের সহায়ই হইবেন, বিঘ্ন হইবেন না। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী (শ্রীশ্রীসারদা দেবী) তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে বাস করিতেন। রাখালের পত্নীকে পরম যত্নে সেখানে পাঠাইয়া দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন--'টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখা হয়!'

রাখালের সম্বন্ধে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন পান করিত! বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না! তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সে জন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাবা জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানা রূপে চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল—এখানে ধনী, বিদ্বান্ লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না! ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন

রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম!"

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর কিরূপ বালক-ভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সে-ই অবাক্ হইয়া যাইত! আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি!—তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না!"

"অন্যায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম।...রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) যাহাদের (অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্ত) এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।" (১)

শ্রীশ্রীঠাকুর মনে করিতেন রাখাল যেন তাঁহার ব্রজের গোপাল। তিনি রাখালের সহিত সেই ভাবেই ব্যবহার করিতেন। কখনও বা 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন যে, রাখাল আর সংসারী হইবে না। কিন্তু তিনি জানিতেন, তাহার তখনও ভোগের একটু বাকি আছে—তাই তিনি জোর করিয়া রাখালকে মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। রাখাল বলিতেন—"সংসার আমার আলুনী লাগে। সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না।"

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে—তখন দক্ষিণেশ্বরে অন্যান্য ভক্তগণের আগমন হইয়াছে—শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন সকলের সঙ্গে পঞ্চবটী মূলে বসিলেন। সেদিন সেখানে যে সকল ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইয়াছিল তাহা শুনিয়া সকলেই তন্ময় হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই দিনের কথাপ্রসঙ্গেই শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী পরে বলিয়া থাকিবেন—"এক দিন ছুপুর বেলা আমি যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান কর্‌ছি, পরমহংসদেব তখন শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার কর্‌ছিলেন। সেই সব বিচার শুন্‌তে শুন্‌তে গাছের পাখীগুলি পর্য্যন্ত বেদে যে সব গান রয়েছে সে সব গান কর্‌ছে শুন্‌লুম।"..."বাইরে কিছুই নেই, সবই ভিতরে। বাইরের গান কিছুই নয়। ভিতরে এমন মধুর গান শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, সব জুড়িয়ে যায়। ঠাকুর পঞ্চবটীতে ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে বীণার ধ্বনি শুন্‌তে পেতেন।" (১)

(২)

ক্রমে ক্রমে রাখালের এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের অন্তরে ভগবান্ লাভের বাসনা জাগ্রত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বর এবং কলিকাতায় বলরাম-বাড়ীতে রাখালের ছুইদিন ভাবসমাধিও হইয়া গেল। সাধারণতঃ সমাধি তিন প্রকার—সবিকল্প, নির্ব্বিকল্প ও আনন্দ সমাধি। শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ বলিতেন—"সবিকল্পে রূপ দর্শন হয়। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণী লোক যে যেভাব আশ্রয় করে, সে সেইরূপ দর্শন করে।...নির্ব্বিকল্পে রূপ-টুপ নেই। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব ভুল হ'য়ে যায়। কাশীপুর-বাগানে স্বামীজির (বিবেকানন্দ) নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়েছিল।... আর এক সমাধি আছে—আনন্দ-সমাধি। তাতে এত প্রেমানন্দ ভোগ হয় যে, এই শরীরে আর সেটা রাখ্‌তে না পারায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায়।

(১) ধর্ম্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ—উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা।

সেই অবস্থায় একুশ দিন মাত্র শরীর থাকে। ঠাকুর বল্‌তেন, দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে—সেটা ফুট্‌লে চারিদিক আনন্দময় দেখায়।" (১)

একদিন রাখালের পিতা আনন্দমোহন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। পুত্রকে দেখাইয়া ঠাকুর কহিলেন—"আহা! দেখ, দেখ, আজ-কাল কি চমৎকার ভাব হয়েছে। ওর মুখ পানে চাও; দেখ্‌তে পাবে, ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম জপ করে কি না! যদি বল, বিষয়ীর ঘরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন ক'রে হয়? তার মানে আছে—ছোলা যদি আবর্জ্জনাতেও পড়ে, তবু সেই ছোলা গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। রাখাল যে এখান্‌কে আসে, তাতে কি আপনার অমত আছে?"

আনন্দমোহন ছিলেন অত্যন্ত বিষয়ী ব্যক্তি। তিনি দেখিলেন, দক্ষিণেশ্বরে অনেক বড় বড় উকীল কৌঁসুলী প্রভৃতি আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা যাতায়াত আছে, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে নানাপ্রকার উপদেশ অনায়াসে ও বিনা ব্যয়ে রাখালের দ্বারা সংগ্রহ করা চলিবে। মনের ভাব গোপন করিয়া অন্তর্দ্দর্শী ঠাকুরের নিকট তিনি কহিলেন—"সে কি মশায়, রাখাল ত আপনারই ছেলে। আপনার কাছেই থাক্‌, তবে মাঝে মাঝে দু' একদিনের জন্য আমার ওখানে পাঠিয়ে দিবেন।"

ঠাকুরও সন্তুষ্ট হইলেন, রাখালও সন্তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দমোহনও সন্তুষ্ট হইলেন। যাঁহার যেমন ভাব, তাঁহার তেমনি লাভ হইল।

(১) ধর্ম্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ—উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা

যাহা হউক, কিছুদিন পর আনন্দমোহন একটি জটিল মোকদ্দমায় পড়িলেন। আইনজ্ঞগণ এক বাক্যে কহিলেন, জয়ের সম্ভাবনা তাঁহার আদৌ নাই! ঠাকুরও ইহা শুনিলেন। শেষে দেখা গেল, অপ্রত্যাশিত ঘটনা-চক্রে আনন্দমোহনের সুনিশ্চিত পরাজয় সুনিশ্চিত জয়ে পরিণত হইল! মোকদ্দমার ফল দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন! আনন্দমোহন মনে মনে বুঝিলেন—ইহা এই পূজারী-ঠাকুরেরই ইন্দ্রজাল! (১) সেই দিন হইতে তিনি রাখালকে গৃহে লইবার জন্য আর বেশী ব্যস্ত হইলেন না।

নিয়ত শ্রীভগবানের সঙ্গ লাভ করিয়া পার্ষদগণ ক্রমেই এক একটি সুশাণিত অস্ত্ররূপে গঠিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুর জানিতেন যে, তাঁহাদিগকে দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার অনেক কার্য্য করাইয়া লইতে হইবে—তাই যাঁহার যেদিকে বিকাশের প্রয়োজন তাঁহাকে তিনি সেই দিকেই বিকশিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন—"নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ। ওদের ভক্তি আজন্ম। ওরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, ওদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। ওরা পাতাল-ফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়।······রাখাল প্রভৃতি এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি,—এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।"

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। হঠাৎ রাখাল-মহারাজ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন—"উহার কিছু পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম—'মা ও (রাখাল) ছেলে মানুষ, বুঝে না তাই কখন কখন অভিমান করে;

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান হইতে কিছু দিনের জন্য সরাইয়া দিস্, তাহা হইলে ভাল যায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্।”

বৃন্দাবনে যাইয়াও রাখাল-মহারাজের অসুখ চলিতে লাগিল। ঠাকুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন কারণ, “ইতিপূর্ব্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল! যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেইজন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয় দানে আশ্বস্ত করেন। ঐ রূপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।”

কিছুকাল পর রাখাল-মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ভোগের যেটুকু বাকি ছিল তাহা শেষ হইয়া গেল। এদিকে ঠাকুর কণ্ঠনালীর অসুখে ক্রমেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়াই মহারাজ ছুটিয়া আসিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রাণপণে গুরুসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেবা ও চিকিৎসা যখন বিফল হইয়া উঠিল তখন রাখাল-মহারাজ একদিন ঠাকুরকে বলিলেন—“আপনি বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে।” উত্তরে ঠাকুর কহিলেন—“সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।”

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রক্ষা করিলেন। তাঁহার নিকট গৈরিক প্রাপ্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বরাহনগরে মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুর নিকট হইতে লব্ধ শিক্ষাকে আপন আপন জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য অত্যন্ত কঠোর সাধনা আরম্ভ

করিলেন এবং কেহ কেহ বা কৌপীন ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

(৩)

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর রাখাল-মহারাজ আকুল হৃদয়ে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। কিছুদিন পর কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। পুত্র, পত্নী, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি যাহা কিছু সংসারে কাম্য ছিল সে সমস্তই ধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার নাম হইল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে স্বামী ব্রহ্মানন্দ রাখাল-মহারাজ নামেই সমধিক পরিচিত। "স্বামীজি" বলিলে এই সঙ্ঘে যেমন কেবল স্বামী বিবেকানন্দকেই বুঝায়, তেমনি "মহারাজ" বলিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই সূচিত করে।

অল্প কিছুদিন মঠে বাস করিবার পরই নির্জ্জন নর্ম্মদাতট মহারাজকে আহ্বান করিতে লাগিল। সে আহ্বানের আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করা যখন আর সম্ভব হইল না তখন তিনি পূর্ব্ববৎ কপর্দ্দকহীন অবস্থায় মঠের বাহির হইলেন এবং নানা স্থানে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। ষড় ঋতু কোন্ পথে আসিয়া কোন্ পথে চলিয়া গেল সে দিকে তাঁহার আর দৃষ্টি রহিল না—রাত্রির পর দিবসের প্রথম আলোক কোন্ গুহা-পথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আসনের নিকট উঁকি মারিতে লাগিল, তাহা তিনি দেখিতেও পাইলেন না। এই ভাবে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস, কোনদিন একাহারে, কোনদিন বা অজগর-বৃত্তি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। কখনও বৃন্দাবনে, কখনও হরিদ্বারে—কখনও বা জ্বালামুখীতে, কখনও আবার আবু পর্ব্বতে এই ভাবে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও তপস্যা করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেলুড়-মঠের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। স্বামীজি কহিলেন—"রাখাল, আজ হ'তে এ সমস্ত তোর, আমি কেউ নই।"

তপঃসিদ্ধ সাধক এইবার কর্ম্মযোগের সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" মহারাজ যে ভাবে নারায়ণসেবার দ্বারা বেলুড়-মঠকে পৃথিবীপূজ্য করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে জগৎ-বরেণ্য করিয়াছেন তাহা ভাবিলে ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ-সঙ্ঘই ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তখন ভারতের রাজছত্র সেই ধর্ম্মের অনুগমন করিত। কিন্তু একালে ভারতের অবস্থা অন্যরূপ। নানা দিক্ হইতেই মধ্যে মধ্যে প্রতিকূল বায়ু বহে। এই দুর্য্যোগের দিনে কোনও সেবা ও ধর্ম্ম সঙ্ঘকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তোলা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব যিনি "একটা রাজ্য চালাইতে পারেন।" মহারাজ ছিলেন একান্ত নীরব কর্ম্মী। কি ভাবে যে সঙ্ঘটি পরিচালিত হইত তাহা বাহিরের লোক ত দূরের কথা—সঙ্ঘের সকল লোকেই সব সময় বুঝিতে পারিত না। ত্যাগকে আদর্শ করিয়া এবং কর্ম্মকেই উপাসনা রূপে গ্রহণ করিয়া মহারাজ এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"রাখালের আধ্যাত্মিক শক্তি আমার চেয়েও বেশী।" কাহার বেশী, কাহার কম সে আলোচনায় কোন ফল নাই—কারণ সমুদ্রে ও হিমালয়ে যেমন তুলনা করা যায় না, স্বামীজি এবং মহারাজেও তেমনি তুলনা হয় না। স্বামীজি ছিলেন চিন্তা, মহারাজ ছিলেন কর্ম্ম—স্বামীজি ছিলেন কল্পনা, মহারাজ ছিলেন তাহার

প্রাণবন্ত ভাষা, স্বামীজি ছিলেন দীপ্তি, আর মহারাজ ছিলেন তাহাই যাহা না থাকিলে দীপ জ্বলে না! স্বামীজি ছিলেন বানের গঙ্গার উচ্ছ্বাস, আর মহারাজ ছিলেন সেই গঙ্গার দুইটি উপকূল, বানের বেগ চলিয়া গেলেও যাহা সেই তীব্র জলধারাকে সুপরিচালিত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মুক্তি-ফৌজের শিক্ষাকেন্দ্রটি গঠন করিয়া গেলেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই শিক্ষা-পীঠে প্রতিদিন মানুষ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আত্মাভিমান বিসর্জ্জিত হইল, আত্ম-কর্ত্তৃত্ব সেখানে লয় পাইল—আধ্যাত্মিক ও তীব্র সাংসারিক জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের বাহু ধরিয়া সেখানে কর্ত্তব্য-পালন করিতে অগ্রসর হইল। তাই আজ বেলুড়-মঠের এত গৌরব—এমন প্রতিষ্ঠা। সেবাকে তিনি যে মূর্ত্তি দিয়াছিলেন, আজ রামকৃষ্ণ-মিশন্ স্বদেশে ও বিদেশে সেই মূর্ত্তিরই পূজা করিতেছেন। তিনি সেই পূজার সহিত আড়ম্বরকে মিলিতে দেন নাই, পূজার উৎসবকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেন নাই—আজিও তাই এই প্রতিষ্ঠান শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বজা সগৌরবে বহন করিতেছে।

(৪)

মহারাজের চরিত্রের একটি দিকের কিছু পরিচয় পাইলাম। এখন অপর একটি দিকের পরিচয় লইতে চেষ্টা করা যাক্। সে দিকটি তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার ও অসামান্য আধ্যাত্মিকতার। তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া ভারতের সনাতন সত্য বিকশিত হইয়াছিল—জড়বাদ কখনও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মহারাজ "তাঁহার সাধনার ইতিহাস......সংগোপনে রাখিতেন——অহমিকা-প্রকাশের আশঙ্কায় তাহা কোন দিন প্রকাশ পাইতে দেন নাই। হিমালয়ের নিভৃত গুহায় তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিমগ্ন

ছিলেন; বৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া দিনান্তে একখানি মাত্র রুটি খাইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুকঠোব তপস্যার ফলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহাজ্ঞান-লাভ-জনিত কোনরূপ অভিমান—কোনরূপ গর্ব্ব তাঁহাব ছিল না। শত প্রযত্নে তিনি সে দিব্যজ্ঞান সংগোপন কবিতেন ....স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড়-মঠে অসংখ্য মুক্তিকামী যুবককে প্রতি বৎসব ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষা দিতেন। ৪।৫ বৎসব তাঁহাদিগকে কঠোর সংযমে নানা সাধনায় অভ্যস্ত কবাইয়া প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে এবং তিথি-পূজার দিনে গুরু ব্রহ্মানন্দ অসংখ্য ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত কবিতেন।......কিন্তু এত বড় বিরাট মানবমঙ্গলকব কর্ম্মের নেতৃত্ব করিয়াও স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিনও তপস্যায় ক্ষান্ত হয়েন নাই। সাধনায় শরীব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বহুমূত্র ও অজীর্ণ-রোগে জীর্ণ হইয়াছেন—সাধনার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, কিন্তু তপস্যার বিরাম নাই।" (১)

এইরূপ ছিলেন সেই তপস্বী ব্রহ্মানন্দ, ভুবনেশ্বর-মঠ যাঁহার শেষ কীর্ত্তিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কত ভক্তিপিপাসুর হৃদয়ে আশা ও শান্তি দান করিতেছে।

নানা দ্বন্দ্ব মহারাজের চরিত্রে একাধারে সম্মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল তাঁহারা বলেন—"স্বামী ব্রহ্মানন্দ সাধারণকে কেবল ধরা না দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। যিনি যে ভাবের ভাবুক—যে রসের সাধক, সেই ভাবেই—সেই রসেই তাঁহাকে সম্মোহিত—বিস্মিত করিতেন। বিলাসী বাবুরা তাঁহার রঙ্গ-রসে অবাক্ হইত—সাহিত্যিক্ সাহিত্যরসে আপ্লুত হইত—রাজনীতিক্

(১) মাসিক বসুমতী—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৯।

রাজনীতি-সমস্যার মীমাংসা পাইত—সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত বিদ্যার মূর্ত্ত বিকাশ দেখিত—হাকিম, ব্যবহারাজীবেরা আইনের খেলা দেখিত—জীবন-সমস্যায় বিপন্ন ব্যক্তি অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইত—সংসার-সুখ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির আহার ও ভ্রমণের ব্যবস্থা হইত। আর ভক্তগণ দেখিতেন, জগতে অতুল সেই রাতুল চরণ—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রফুল্ল-কমল-প্রস্ফুরিত আনন্দহিল্লোলিত প্রশান্ত হৃদয়।" (১)

একদিন মহারাজকে একজন বলিলেন—'মন ত কিছুতেই স্থির হয় না।'

উত্তরে মহারাজ বলিলেন—"প্রত্যহ কিছু কিছু ধ্যান জপ কর্‌বে। কোন দিন বাদ দিবে না।.....(মনকে) পুনঃ পুনঃ টেনে এনে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন কর্‌বে। এইরূপ দুই তিন বৎসর কর্‌লেই দেখ্‌বে যে, প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আস্‌চে, মনও স্থির হচ্ছে। প্রথম প্রথম জপ ধ্যান নীরসই লাগে, কিন্তু ঔষধ সেবনের মত জোর ক'রে মনকে ইষ্টের চিন্তায় নিযুক্ত রাখ্‌তে হয়, তবে ক্রমে আনন্দ আসে।...হেলায় হ'ক, আর খুব ভক্তির সহিতই হ'ক নাম কর্‌লে তার ফল হবেই। (২)......ভক্তি, বিশ্বাস এর একটা থাক্‌লেই ভগবান্ লাভ হয়।......সময় না হ'লে হাঁক্-পাকা-নিতে কোন ফল নাই।"

আর একদিন প্রশ্ন হ'ইল—'মহারাজ, ভগবানে মতি-গতি কিরূপে হয়?'

(১) মাসিক বসুমতী—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৯।

(২) জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে বা ভ্রান্তে—যে কোন ভাবেই হোক্ না কেন, তাঁর নাম কর্‌লেই ফল হবে। কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়—আর যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হ'য়ে যায়—ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

মহারাজ উত্তর দিলেন—"সাধু সঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে ভগবানে মতি-গতি হবে। তাঁদের (সাধুদের) জীবন দেখে, তাঁদের উপদেশ শুনে, তদনুরূপ জীবন গড়তে হয়।......সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকৃতে হ'বে, তাঁর জন্য সব ছাড়তে হবে।'

প্রশ্ন হইল—'মহারাজ, সংসারে কি রকমে থাক্‌তে হবে? নিষ্কাম ভাবে থাকাই ত উচিত?'

উত্তর।—কি জান, নিষ্কাম-টিষ্কাম, ও খুব উঁচু কথা। সংসারে থেকে ওসব হয় না।......বাস্তবিক খতিয়ে দেখা যায় যে, কোন না কোন কামনার তাড়নায় কাজ কর্‌ছি। তা হলেই হ'ল যে, নিষ্কাম-কর্ম্ম হয় না। তবে সংসারের কাজ কর্‌তে কর্‌তে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর্‌তে হয়—'প্রভু, আমার কাজ কমিয়ে দাও।'

প্রশ্ন।—মহারাজ, মন কি ক'রে একাগ্র হয়?

উত্তর।—মন একাগ্র করার উপায় হচ্ছে, সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। প্রাণায়ামও একটি উপায়। তবে সংসারীর পক্ষে safe (নিরাপদ) নয়।......ধ্যান-ধারণার কোন condition (বাঁধা বাঁধি) নেই। নির্জ্জন স্থানে ধ্যান অভ্যাস কর্‌লেই হ'ল।

প্রশ্ন।—মহারাজ, তাঁর শরণাগত হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌লেও কি আমাদের কিছু কর্‌তে হবে?

উত্তর।—আমরা কি হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাক্‌বো? না—তা' নয়। তাঁর কাছে সরল প্রাণে প্রার্থনা কর্‌তে হবে, 'হে প্রভু! আমি ভাল-মন্দ কিছুই জানি না,—আমি তোমার আশ্রিত, আমার যা অভাব—তুমি তা' পূরণ কর, যে রাস্তায় চল্লে আমার কল্যাণ হবে সে রাস্তায় নিয়ে চল, তোমার স্মরণ-মনন কর্‌বার শক্তি দাও।'......তাঁর আশীর্ব্বাদ, কৃপা কি কিছু কম আছে? মানুষ মাথা পেতে নেবে না, চোখ চেয়েও দেখ্‌বে

না।······বড় বড় কথা বলা ও বাজে বকাই মানুষের স্বভাব। এই ক'রেই জীবন কাটায়। ফলও তেমনি পায়। প্রত্যহ মনকে খোঁচাতে হবে। কি কর্‌তে এসেছি, কি ক'রে দিনটা গেল? বাস্তবিকই কি—ভগবান্‌কে আমার চাই? চাই যদি ত কচ্ছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল্‌ দেখি—চাওয়ার মত কাজ কর্‌ছি কি না? সদাই তাঁর স্মরণ-মনন কর্‌বে। স্মরণ-মনন সর্ব্বক্ষণ অভ্যাস হ'লে তখন ধ্যান কর্‌তে পার্‌লেই জমে যায়।······প্রথম······বাইরে থেকে (মনকে) গুটিয়ে এনে, তারপর ধ্যান জপ আরম্ভ কর্‌তে হয়।

প্রশ্ন।—সাধন ভজন কি নিয়ম ক'রে কর্‌তে হয়?

উত্তর।—নিষ্ঠা একটা মস্ত জিনিস। নিষ্ঠা না থাক্‌লে কোনও কাজে successful (কৃতকার্য্য) হওয়া যায় না। নিষ্ঠা এমন চাই যে, যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমাকে আমার নিয়ম পালন কর্‌তেই হ'বে। কর্ম্ম ও উপাসনা এক সঙ্গেই কর্‌তে হবে।······আমরাও ত ৫।৬ বছর ঘুরে ঘুরে তার পর কাজে লাগি। স্বামীজি (বিবেকানন্দ) আমাকে ডেকে বল্লেন—'ওরে, ওতে কিছু নেই—কাজ কর। আমরাও তখন সব রকম কাজ করেছি।······আড্ডার মত শত্রু নেই। ওতে একেবারে Ruin (অধঃপতন) এনে দেয়। সাধন ভজনের পক্ষে বড় বিঘ্নকর। মনকে বড় বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়। ভগবান্‌কে ভুলিয়ে দেয়। সাধন ভজন কর্‌তে গেলে খাওয়া কমিয়ে দিতে হয়। এক পেট খেয়ে ধ্যান জপ হয় না। হজম কর্‌তেই সব Energy (শক্তি) বেরিয়ে যায়।' (১)

মহারাজের বয়স যখন ১৯ বৎসর মাত্র সেই সময় হইতেই তিনি ধর্ম্মচিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর তাঁহার সাধনা

(১) 'ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ'—উদ্বোধন কার্য্যালয়। যাঁহারা মহারাজের অমূল্য উপদেশাবলী বিস্তৃতভাবে জানিয়া উপকৃত হইতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উল্লিখিত পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

তাঁহাকে একদণ্ডের জন্যও ত্যাগ করে নাই। একাদিক্রমে ২৫ বৎসর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন্‌কে গঠিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী-পার্ষদগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চের সূর্য্য বাঙ্গালার আকাশে উদিত হইল। কে জানিত তখন যে, ঐ দিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের—সর্ব্ব-বাঙ্গালার এবং সর্ব্ব ভারতের একটি দুর্দ্দিন। মহারাজ সহসা বিসূচিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। অষ্টাহ কাটিয়া গেল। সকলেই মনে করিল বিপদের মেঘ বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইল না। মহা-কালের একটি শেল ব্যর্থ হইতেই তিনি দ্বিতীয় শেল হানিলেন—তাহা বহুমূত্র রোগ! চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইল না, কিন্তু ৮ই এপ্রিল তারিখে অবস্থা এতই সঙ্কটজনক হইল যে, চিকিৎসকগণ জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। মিশনের সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগকে নিকটে ডাকিয়া মহারাজ কহিলেন—"তোমরা ভয় পাইও না। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" সকলের নিকট প্রসন্নহৃদয়ে বিদায় লইয়া মহারাজ বলিয়া উঠিলেন—"রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই! ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু! কৃষ্ণ এসেছ?—আমাদের এ কৃষ্ণ কষ্টের কৃষ্ণ নয়—এ গোপের কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ!"

যাঁহারা এ কথা শুনিলেন তাঁহাদিগের হৃদয় আকুল হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। তাঁহারা জানিতেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী—"ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনাবসান হ'বে!" এইত—এইত সেই ব্রজের স্বপ্ন!

কিছুক্ষণ পরে মহারাজ আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আমি ব্রজের রাখাল। আমায় নুপূর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধ'রে

নাচ্‌ব⋯এবারের খেলা শেষ হ'ল। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আহা, তোদের চোখ নেই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে—আমার কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্মসমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি! ঠাকুরের পা দু'খানি কি সুন্দর! দেখ্‌ দেখ্‌—একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—বল্‌ছে আয়!"

ইহার পরই সব শেষ হইয়া গেল। ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানসপুত্রকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে বাঙ্গালীর জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম্ম ও ধর্ম্মকে পরিচালিত করিবার জন্য যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের ছায়া মাত্র। মহারাজের পূর্ব্বেই তখন চলিয়া গিয়াছেন—শ্রীযোগানন্দ, শ্রীনিরঞ্জনানন্দ,—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ. শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ—চলিয়া গিয়াছেন শ্রীত্রিগুণাতীত, শ্রীপ্রেমানন্দ এবং শ্রীঅদ্ভুতানন্দ—আর গিয়াছেন সেই বিশ্বজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা!

ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া চিতানলোদ্ভাসিত বেলুড়ের দিকে চাহিয়া তখন শত শত নরনারী মর্ম্মন্তুদ বেদনায় অতিশয় করুণ সুরে বলিয়া উঠিল—

"উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবেছে দেউটি;
নীরব রবাব বীণা, মুরজ মুরলী।"

স্বামী শিবানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়ের সৌজন্যে]   [বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু ২য় খণ্ড

স্বামী শিবানন্দ মহারাজ

(১)

৺গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড।

—স্বামী শিবানন্দ।

"রামকৃষ্ণ-মিশন্ যে প্রভূত শক্তি বিকাশ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও যে অসীম শক্তি বিকাশ কবিবে, সেই শক্তির প্রাণস্বরূপ যে কয়েকটি মহাপুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের তপস্যা ও পুণ্যবলে জগতের ভাবস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, সেই কয়জন মহাপুরুষদিগের মধ্যে মহাপুরুষ শিবানন্দ অন্যতম।...তাঁহার কঠোর তপস্যা অবর্ণনীয়।" (১)

গৃহস্থাশ্রমে স্বামী শিবানন্দের নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। বারাসতের সম্ভ্রান্ত ঘোষাল বংশে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তারকনাথ ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সময়ে সর্ব্বদা কলিকাতার সিমুলিয়ায় ভক্ত রামচন্দ্রের বাটীতে আসিতেন, সেই সময়ে তারকনাথও তথায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের বাণী শুনিতে শুনিতে বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। যদিও তখন তিনি কোন একটি আফিসে কর্ম্ম করিতেন কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল মুমুক্ষুর অন্তর। ধর্ম্মপথে সমুন্নত কোনও মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় তখন সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিত। সে সময়ে তিনি সঙ্গী ছিলেন শ্রীনিত্যগোপালের। পরে এই সাধকপ্রবর নিত্যগোপাল 'অবধূত জ্ঞানানন্দ' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক

---

(১) মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলিকাতা মনোহরপুকুরে মহানির্ব্বাণ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন আজন্ম সাধক। তাঁহার উচ্চ ভাবাবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই প্রশংসা করিতেন এবং কহিতেন—ইহার পর মহংসের অবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়াই হউক বা শ্রীনিত্যগোপালের মহৎ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা চক্ষের উপর থাকিবার জন্যই হউক, তারকনাথের মন আর কিছুতেই আফিসের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিতে চাহিল না। নির্জ্জনে থাকিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করিবার জন্য তিনি একদিন চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছির বাগানে একখানি কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া পড়িয়া রহিলেন। বেলুড়-মঠে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"ওহে! কাঁকুড়গাছিতে যখন প'ড়ে থাক্‌তুম্, বেশ নিরিবিলিতে থাক্‌তুম্। দিনের বেলায় দু'টি ভাত জোগাড় ক'রে খেয়ে নিতুম্, আর রাত্রে ধুনিতে দু'খানা রুটী পুড়িয়ে নিয়ে খেতুম আর একমনে সাধন ভজন কর্‌তুম; তখন ও অঞ্চলে বড় কেউ লোক ছিল না। বাগানে শুধু একটা মালী ছিল; একাটি থেকে সাধন ভজন কর্‌তুম্।" (১)

নির্জ্জনে সাধন-ভজন করিবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তরূপে তারকনাথের সমগ্র জীবন সাধকদিগের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভান্তেও তাঁহার সাধন-ভজনের কখনও বিরাম ছিল না। কর্ম্মের স্রোতে নিজেকে না হারাইয়া তিনি ছিলেন—"নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্ম্মী"—নিজের "হৃদ্‌গত শক্তি দিয়া" তিনি অপরের হৃদয়ে কর্ম্মের ভাব জাগ্রত করিতেন। "তিনি স্থির হইয়াও চঞ্চল ছিলেন; একস্থানে

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন; বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াও চিন্তা করিতেন”—এইভাবে বেলুড়-মঠে তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল। অক্লান্ত তপস্যার প্রভাবে তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা এক প্রেমানন্দময় লোকে বিচরণ করিতেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে-ই অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছে—স্বামী শিবানন্দ মহারাজ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একটি প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই মুকুটহীন অধীশ্বর রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। যাঁহাকে মান দিবার জন্য শত শত ভক্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিত—তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই মান দান করিতেন; লোকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত—তাহারাই গুরু, কি মহারাজ শিবানন্দই গুরু, তখন তাহারা তাহা বুঝিতে পারিত না! স্বামী শিবানন্দ ছিলেন আনন্দময় মহাপুরুষ এবং কথায়, কার্য্যে, ব্যবহারে এমন কি চিন্তায় পর্য্যন্ত তিনি এই জগৎকে সর্ব্বদা আনন্দময় করিয়াই রাখিতেন।

সর্ব্বপ্রকার অনুকরণের বিরোধী ছিলেন তিনি এবং বলিতেন—'নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সাধন ভজন করবে! অপরকে শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব কখনও নাশ কবো না। তা'হলে কিছুই হবে না। যে যে-পরিমাণে ব্যক্তিত্ব রেখে সাধন ভজন করবে, তার সেই পরিমাণে উন্নতি হ'বে।” (১) যে ব্যক্তি নিজেকে কলের পুত্তলিকা করিয়া ফেলে, সে নিজের অপমৃত্যু ঘটায়! আত্মতত্ত্ব লাভ বলহীনের জন্য নয়—সবলের জন্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বিলোপীর ন্যায় দুর্ব্বল ও করুণার পাত্র আর দ্বিতীয় নাই। রুদ্রের দুর্জ্জয় আহ্বান শুনিলে সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়—আশায় দীপ্ত হইতে পারে না। “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত (Impressed) হইয়াছিল।" (১)

(২)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিবার পূর্ব্বে তারকনাথ শ্রীনিত্য-গোপালের সঙ্গে সঙ্গেই বেশী সময় থাকিতেন এবং তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমি দর্শনপূর্ব্বক ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সেদিন পঞ্চবটীতলে দাঁড়াইয়া ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ্ছ কত রকম মত। মত—পথ। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। একটা জোর ক'রে ধর্তে হয়। ছাদে গেলে—পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়—একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়, এক গাছা দড়ি দিয়ে—, একটা বাঁশ দিয়ে উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় ক'রে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ কর্তে হ'লে একটা পথ জোর ক'রে ধ'রে যেতে হয়। সব মতকে এক একটি পথ ব'লে জান্বে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা পথ এরূপ বো[illegible] হয়। বিদ্বেষ ভাব না হয়।" (২)

বেলা তখন বারটা। গঙ্গায় বান ডাকিবার সময় হইয়াছে। বান দেখিবার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী তলে দাঁড়াইলেন। ভক্তদিগকে

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

বলিতে লাগিলেন—"জোয়ার-ভাঁটা, কি আশ্চর্য্য! কিন্তু একটি দেখ—সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার-ভাঁটা খেলে। সমুদ্র থেকে অনেক দূর হ'লে একটানা হ'য়ে যায়। এর মানে কি?—ঐ ভাবটা আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব এই সব হয়; আর দু' একজনের (ঈশ্বর-কোটির) মহাভাব, প্রেম—এ সব হয়।" (১) তারকনাথ সেদিন ঠাকুরের বাণী শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মন বলিতে লাগিল—'তারকনাথ! এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় ক'রে ধর্‌তে হয়—হয়; নিত্য-গোপাল না হয় শ্রীরামকৃষ্ণ—এক জনের আশ্রয় লও।'

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। তারকনাথ মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের জন্য ফুল মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিতেন—সেগুলি তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার দিকে উদাস নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন। ঠাকুরও এক একদিন তারকনাথের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেন এবং তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। তারকনাথ ছিলেন অন্তর্মুখী, স্বল্পভাষী এবং সর্ব্বদা উদাসীন। ঠাকুর যখন ভক্তদিগকে বলিতেন—"এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—রূপার খনি—সোনার খনি—হীরে মাণিক। একটু উদ্দীপন হয়েছে ব'লে মনে করো না যে সব হয়ে গেছে।" (২) তখন ভাবুক তারকনাথের হৃদয়ে যে বিষম আলোড়ন উপস্থিত হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বেদনা দেখা দিল। কয়েক মাসের মধ্যেই বেদনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ভক্তগণ তাঁহাকে কলিকাতা—শ্যামপুকুরে আনিয়া চিকিৎসা করাইতে

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।
(২) ঐ

লাগিলেন। চিকিৎসায় কোন ফল দর্শিল না। চিকিৎসকের পরামর্শ মত তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসস্থান কাশীপুর-বাগানে পরিবর্ত্তিত হইল (১১ই ডিসেম্বর—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে)। এই সময় শ্রীনিত্যগোপাল, তারকনাথ এবং আরও অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। ভক্তদিগের মধ্যে শশী, যোগেন, লাটু, গোপাল, নিরঞ্জন ও শরৎ প্রভৃতি তখন প্রাণপণে গুরুসেবা করিতেছিলেন। ভক্ত কালী (স্বামী অভেদানন্দ) শ্যামপুকুরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবক রূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং চিরদিনের মত গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্যামপুকুরের বাসগৃহে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শরৎ, শশী, নরেন, যোগেন প্রভৃতি ভক্ত যুবকগণ তখনও নিজ নিজ বাটীতেই থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। তারকনাথ তখন ছিলেন তাঁহাদেরই মত একজন দর্শক মাত্র এবং "এক কাপড়ে কোঁচার খোঁট গায়ে দিয়া শ্রীনিত্যগোপালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ছায়ার ন্যায় বেড়াইতেন।" (১)

কাশীপুরের উদ্যানবাটিকায় একদিন তারককে নির্জ্জনে পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"তুই ওর পিছনে পিছনে বেড়াস্ কেন? ও এখানকার নয়। তুই এখানে ছেলেদের সঙ্গে থাক্।" সেই অবধি তারক কাশীপুরে থাকিতে লাগিলেন। (২) বলিতে গেলে সেই সময় হইতেই তারকনাথের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। নিয়ত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়া সংসারত্যাগী তারক সত্য সত্যই অনাসক্ত সন্ন্যাসী হইয়া উঠিলেন। এতদিন তিনি ছিলেন ঠাকুরের একজন দর্শক মাত্র—এখন তিনি হইলেন তাঁহার সেবক ও অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং অন্যান্য শিষ্যদিগের ন্যায় তাঁহার নিকট হইতে গৈরিক বসন লাভ

(১) স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি (মঠ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
(২) ঐ

করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"যার শেষ জন্ম সে-ই এখানে আস্‌বে—যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আস্‌তে হবেই হবে।" (১) তারকনাথের সাধক-জীবন এই বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করে।

অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে নিকটে পাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বহুদিন হইতেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"তোদের সব দেখ্‌বার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন ক'রে উঠ্‌তো, এমন ভাবে মোচড় দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে পড়্‌তুম্। ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হ'ত! লোকের সাম্‌নে, কি মনে কর্‌বে ভেবে কাঁদ্‌তে পার্‌তুম না! কোনও রকমে সাম্‌লে-সুম্‌লে থাক্‌তুম্! আর যখন দিন গিয়ে রাত আস্‌ত—মার ঘরে, বিষ্ণু-ঘরে আরতি বাজনা বেজে উঠ্‌তো, তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এখনও এলিনি ভেবে আর সাম্‌লাতে পারতুম্ না; কুঠির উপরে ছাদে উঠে'—'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয়রে' ব'লে চেঁচিয়ে ডাক্‌তুম্ ও ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তুম! মনে হ'ত পাগল হ'য়ে যাব। তারপর কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লি—তখন ঠাণ্ডা হই। আর আগে দেখেছিলাম ব'লে, তোরা যেমন-যেমন আস্‌তে লাগ্‌লি অমনি চিন্‌তে পারলুম!··· মা দেখিয়ে বলে দিলে এরাই সব, অন্তরঙ্গ।" শ্রীনিত্যগোপালের নিকট হইতে সরাইয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কেন যে তারকনাথকে নিজের আশ্রয়ে আনিয়াছিলেন উদ্ধৃত বাণী হইতেই তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীনিত্যগোপাল যে একজন উন্নত অবস্থার সাধক-পুরুষ এবং তাঁহার যে পরমহংসের অবস্থা হইয়াছিল ইহা শ্রীশ্রীঠাকুর জানিতেন

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

এবং সকলের নিকট বলিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, শ্রীনিত্য-গোপাল তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন না, তাই তিনি তাঁহাকে আকর্ষণ করেন নাই, বলিয়াছিলেন—"ও এখানকার নয়।" ঠাকুর বলিতেন—"মানুষ গুলোর ভেতর কি আছে, তা' সব দেখ্‌তে পাই; যেমন কাঁচের আল্‌মারির ভেতর যা যা জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেই রকম।" "যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ করিতে পারে না—কাজেই ভক্তদিগের কাহারও ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ বা ভাবের বিপরীতে গমন বা আচরণ কখন সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি কখনও কেহ অপর কাহারও দেখাদেখি বিপরীত ভাবের আচরণ করিত ত ঠাকুর তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইতেন ও তাহার ভুল বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।" (১) শ্রীনিত্যগোপালকে পরিত্যাগ করিয়া তারকনাথ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়-গ্রহণ-ব্যাপার সম্পর্কেও এইরূপ কথাই বলা যাইতে পারে।

কাশীপুরের উদ্যানবাটিকা শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের কঠোর তপস্যায় চিরকালের নিমিত্ত সুপবিত্র হইয়াই থাকিবে। দক্ষিণেশ্বরে যে মন্ত্র উদ্‌গীত হইয়াছিল, কাশীপুরে তাহা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিল। ভক্তগণ ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া এই স্থানে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। জপ, ধ্যান, কীর্ত্তন ও পাঠে তাঁহাদিগের সময় যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া যাইত তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। গুরু-সেবায় ও তপস্যায় কাশীপুরে যে তাপস-জীবন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পরিণতি ঘটিয়াছিল বরাহনগর ও আলম বাজারের মঠে এবং হৃষিকেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি নানা তীর্থে। ১১ই ডিসেম্বর (১৮৮৫ খৃঃ) হইতে দেহরক্ষা পর্য্যন্ত (১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খৃঃ) ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটিকায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মাঘ মাসে তাঁহার নিকট

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

হইতে যে একাদশ (১) জন অন্তরঙ্গ (২) ভক্ত গৈরিক বসন লাভ করিয়াছিলেন, তারকনাথ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

(১) নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, বাবুরাম, শশী, তারক, শরৎ, যোগেন, লাটু নিরঞ্জন, বুড়ো-গোপাল।—The Life of Ramkrishna by Rolland (1929)—Pages 202--204.

(২) কাশীপুরে আসবার কয়েকদিন মাত্র পর (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খৃঃ) শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত "শ্রীম'র নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। ঠাকুরের অসুখের গুহ্য উদ্দেশ্য তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, এ অসুখটা কদ্দিনে সারবে?

মাষ্টার। একটু বেশী হয়েছে—দিন নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কত দিন?

মাষ্টার। পাঁচ ছ' মাস হ'তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অধীর হইয়া) বল কি?

মাষ্টার। আজ্ঞা সব সারতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল। আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি!—তবে এমন ব্যামো কেন?

মাষ্টার। আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি উদ্দেশ্য?

মাষ্টার। আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন হ'বে। নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে। বিদ্যার 'আমি' পর্য্যন্ত থাকছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।—এক একবার মনে হয়, কাকে আর বলব! দ্যাখোনা, এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে ব'লে কত রকম ভক্ত আসছে। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইন্ বোর্ড ত হবে না—'অমুক সময় লেকচার হইবে।' (ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাস্য)।

মাষ্টার। আর একটি উদ্দেশ্য, লোক বাছা। পাঁচ বছরে তপস্যা করে যা না হতো, এই কয়দিনে ভক্তদের তা হয়েছে—সাধনা, প্রেম, ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা' হলো বটে।.......(ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ব্যথিত হইয়া বলিলেন—) লোক বাছা যা' বলছ তা' ঠিক। অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই' জিজ্ঞাসা করে তারা বহিরঙ্গ।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

কাশীপুরে অবস্থানকালে বুদ্ধদেবের মহান্ চরিত্র যে কয়েকজন অন্ত-রঙ্গের হৃদয়ে সুদৃঢ় মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিল, তারকনাথ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। বুদ্ধগয়ায় যাইয়া তপস্যা করিবার জন্য যেদিন নরেন্দ্র-(স্বামী বিবেকানন্দ) ও কালী প্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) কাহাকেও না জানাইয়া কাশীপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন, তারকনাথও সেদিন তাঁহা-দিগের অনুগামী হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট শুনিয়াছি যে, বুদ্ধগয়ার মন্দির মধ্যে (১) ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, একটি জ্যোতি তারকনাথের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যাহা হউক, বুদ্ধ গয়া হইতে নরেন্দ্রনাথাদির প্রত্যাগমনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে নানা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কহিলেন:—

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বুদ্ধদেবের) কি মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র। আজ্ঞা না; রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা' হয় সেই রকম মাথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। চক্ষু?

নরেন্দ্র। চক্ষু সমাধিস্থ।

(১) এই ঘটনাটি কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—"বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখেন যে, একটা শক্তি তারক-নাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারকনাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তা[illegible] চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। তারকনাথকে সেই হইতে সকলে 'মহাপুরুষ' বলিয়া ডাকিতেন।"—মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীমৎ মহারাজ অভেদানন্দ, যিনি সে সময় বুদ্ধগয়ার মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই বিবরণ সমর্থন করেন না। তিনি যাহা বলেন তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) আচ্ছা,—এখানে সব আছে,—না? নাগাদ্ মস্যুর ডাল, ছোলার ডাল—তেঁতুল পর্য্যন্ত।

নরেন্দ্র। আপনি ওসব অবস্থা ভোগ ক'রে নীচে রয়েছেন!—

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে যেন নীচে টেনে রেখেছে।

(ঠাকুর মণির হস্ত হইতে পাখাখানি লইলেন, কহিলেন—)

এই পাখা যেমন দেখ্‌ছি, সাম্‌নে—প্রত্যক্ষ—ঠিক অম্‌নি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি! আর দেখ্‌লাম্‌······তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয়-মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি।

নরেন্দ্র। হাঁ, হাঁ, সোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে একটি রেখামাত্র আছে—(ভক্তের 'আমি' আছে) সম্ভোগের জন্য।

নরেন্দ্র। (মাষ্টারকে) মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্য থাকেন,—অহঙ্কার নিয়ে থাকেন—দেহের সুখ দুঃখ নিয়ে থাকেন। যেমন মুটেগিরি; আমাদের মুটেগিবি on compulsion (কারে প'ড়ে)। মহাপুরুষ মুটেগিরি করেন সখ্ ক'রে। (১)

(৩)

কাশীপুর-বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের মধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। "সকলেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে কি না এই প্রশ্ন উঠিল। রামদা, সুরেশ মিত্র, গিরিশ ঘোষ—ইঁহারাই তখন প্রবীণ। ইঁহারা তখন স্থির করিলেন যে, যে যার বাড়ী ফিরিয়া যাউক ও নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকুক। নরেন্দ্রনাথ

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

মনে মনে স্থির করিলেন যে, আর বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন না। সকলে মিলিয়া কঠোর তপস্যা করিবেন। অবশেষে সুরেশ মিত্র বলিলেন— বুড়োগোপাল, তারক ও লাটু—এই তিনজনের থাকিবার জন্য একটা স্থান ক'রে দেওয়া আবশ্যক এবং তিনি তাহার ভার লইবেন। এইরূপ নানা গণ্ডগোলের পর বরানগর মুন্সীদের একটা পোড়ো-বাড়ী ভাড়া করা হইল……এইরূপে বরানগরের মঠ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল।" (১)

পরবর্ত্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"(ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া) দলাদলি ঠিক নয়, একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। জান্‌বি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—তা' গেরস্থই হ'ন আর সন্ন্যাসীই হ'ন— তাঁদের ভিতর দল-ফল নাই, থাক্‌তেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা' জানিস্? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙ্গে রঙ্গিয়ে, এক একজনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে।" (২)

যাহা হউক, বরাহনগরে প্রথম মঠ স্থাপিত হইলে পর—ভক্তদিগের মধ্যে যে তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনা দেখা গিয়াছিল তাহা হিমালয় গুহাবাসী তপোনিরত দুর্জ্জয় তপস্বীর কৃচ্ছ্রসাধনকেও হার মানাইয়া দেয়! সে সময় অনেকেই মঠে "ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বলিলেন—'দেখ, আমরা সন্ন্যাসী, কখন কোথায় থাকি ঠিক নাই। ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা কর্‌লে মহা হাঙ্গাম হ'বে, অতএব ঠাকুরপূজা ক'রে কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) জেদ করাতে ঠাকুর-ঘর প্রতিষ্ঠিত হইল।…

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২) স্বামী-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তিনি এক মন, এক প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের সেবায় ছিলেন।...তাঁহার মন্ত্র একই কথা ছিল—'জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব! জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব! জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব!" (১)

"একদিন নরেন নিত্যপূজাব জন্য শশীকে ভীষণ ভাবে তিবস্কাব করেন, তাহাতে শশী এতই বিচলিত হইলেন যে, নরেনকে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঠাকুর-ঘব হইতে টানিয়া বাহিব কবিয়া দিলেন। পবে শশী অনুতপ্ত হইয়া নরেনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (২) "এই সময়ে ত্যাগীভক্তদের ভিতর কয়েকটি ভাব বা ভাগ হইল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন পড়াশুনার দিকে মন দিলেন। হিন্দুব সমস্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ, খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থের বিশেষ আলোচনা হইল।...এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সকল আনাইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃাত সকলে পড়িতে লাগিলেন। কালী বেদান্তীও (স্বামী অভেদানন্দ) এই দলের ভিতর। পড়াশুনা যখন চলিল তখন রীতিমত ভাবে গ্রন্থপাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ঠিক যেন পবীক্ষা দিতে যাইবে এই ভাবে পড়াশুনা চলিতে লাগিল। আব এক ভাগ হইল,—তাহাদেব মত হইল যে সাধন ভজন তপস্যাই হইল প্রধান বস্তু, পড়াশুনার আব আবশ্যক নাই। কঠোব তপস্যা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি হইল প্রধান জিনিস।...যোগেন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ), নিরঞ্জন মহাবাজ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) ও তারকদা (স্বামী শিবানন্দ) এঁরা এত পড়া-শুনার দিকের লোক নন। ইঁহারা সাধনমার্গের লোক। সাধন, জপ ও ধ্যান ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইঁহারা পড়াশুনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বলিতেন।...তখনকার দিনে, প্রচলিত কথায়, দুই শ্রেণীব

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২) স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি (মঠ) হইতে প্রকাশিত।

বিভাগ হইল। এক 'দানার' দল—তাঁরা বাহ্যিক বিধি-নিয়ম কিছু মানিতে চান না। কঠোর বৈরাগ্য ভাবের লোক, যেন নূতন শক্তি বার ক'রে জগৎকে প্লাবিত করিবেন!...এই 'দানার দলই' পরে জনসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। অপর শ্রেণী—'সখীর' দল অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিভাবে সাধন করেন। অনেকটা মৃদুভাবাপন্ন লোক।... এস্থলে এ কথা বুঝিতে হইবে যে, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা পড়াশুনার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও খুব সাধন-ভজন করিতেন। সাধন-ভজন যেন প্রাণের জিনিস ছিল,—প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; পড়াশুনাটা আনুষঙ্গিক বস্তু।" (১)

তারকনাথ পূর্ব্বাপরই ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত। ত্যাগী ভক্তগণ যেদিন যথারীতি হোমাদি করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তারকনাথ তখন তাহা না করিলেও তিনি ভিতরে ও বাহিরে সুতীব্র ত্যাগী ছিলেন। বিধি নিয়ম, পূজা প্রভৃতি তাঁহার প্রাণের বস্তু ছিল না, তাঁহার প্রাণের ভাব ছিল—"অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব।" এই ভাব ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইয়া তাঁহাকে আত্মদর্শনে সমর্থ করিয়াছিল—তাঁহার অন্তরে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করিয়াছিল। বরাহনগর-মঠে ভক্তগণ প্রত্যেকেই সেবার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। পায়খানা ধৌত করা হইতে আরম্ভ করিয়া মঠের দৈনন্দিন সকল কার্য্য সেবার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। মঠের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন কালে একদিন পায়ের চাপে কতকগুলি গেঁড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তারকনাথের চরণতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। ক্ষতমুখে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত বহিল। তারকনাথ সেদিকে গ্রাহ্যই করিলেন না;

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ-স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

কহিলেন—"শরীরের দিকে অত চাইলে কি কাজ হয়? ওসব দেখ্‌তে নেই, চল জল নিয়ে যাই।" তারকনাথ নিজে সেবার মূর্ত্তি হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মানবের জন্য একটি মহৎ বাণী রাখিয়া গিয়াছেন—"৺গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ-পূজা বড়।" সত্য সত্যই একদিন তিনি গঙ্গাপূজা করিতে যাইয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসমান মানুষের পূজাই করিয়াছিলেন।

জনৈক শিষ্য একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি?" উত্তরে স্বামীজি বলিলেন—"নিজ হিতের জন্য। এই দেহটা, যাতে 'আমি' অভিমান ক'রে ব'সে আছিস্, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, একথা ভাব্‌তে গেলে, এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়—অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাব্‌বি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এই রূপে কর্ম্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে আস্‌বে, তখন তোরই আত্মা সর্ব্বজীবে, সর্ব্বঘটে বিরাজমান, এ তত্ত্ব দেখ্‌তে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জান্‌বি, এক প্রকার ঈশ্বর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্ম-বিকাশ,—জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সাধনার দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।...পরার্থে সেবাপর হ'তে হ'তে সাধকের জীবন্মুক্তি অবস্থা ঘটে; নতুবা কর্ম্মযোগ ব'লে একটা আলাদা পথ উপদেশ কর্‌বার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।" (১) স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পরম বাণী—৺গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ-পূজা বড়—স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃত উপদেশ হইতেই সে বাণীর মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারা যায়।

(১) স্বামী-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ যখন বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া গেল তখন নানা বিষয়ে মঠের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তেলাকুচার তরকারি, লবণ ও ভাত মাত্র আর তখনকার আহার্য্য নাই, ভাতের সঙ্গে ডাল ও তরকারি দেখা দিয়াছে। এদিকে সন্ন্যাসিগণ আপন আপন ভাবে নিজেদের গড়িয়া তুলিতেছেন; দ্বিধা, সঙ্কোচ বা কোন সঙ্কীর্ণভাব তখন আর কাহারও মধ্যে নাই। কেহ বা তখন কৌপীন-কন্থা মাত্র সম্বল করিয়া ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন, কেহ বা মঠকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। মঠবাসিদের মনে তখন এই ধারণাই তীব্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অখণ্ড বৈরাগ্য চাই—জপ ধ্যান, পূজা হোম সেই বৈরাগ্যকে আনিবার পথ মাত্র! যে জপ ধ্যান পূজাই করিয়া গেল অথচ বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিল না তাহার সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া গেল—গুরুভার নোঙ্গরটী ফেলিয়া নৌকার দাঁড় টানিতে টানিতেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল—তাহার নৌকা যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়া গেল!

গৃহী ভক্তগণ বরাহনগর বা আলমবাজারের মঠে আসিলেই দেখিতে পাইতেন যে, ভক্ত সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনন্ত প্রেমের প্রবাহ চলিয়াছে। তখন "প্রত্যেক লোক অপরকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা অনুরূপ মনে করিয়া" যথাসাধ্য সেবা ও শ্রদ্ধা করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা বলিতেন 'কাহারও ভাব নষ্ট করিও না'। সন্ন্যাসিগণ তখন এই মহৎ শিক্ষাকে এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, নিত্য নিত্য একত্রে ধ্যান, জপ, উপাসনা প্রভৃতি করিলেও প্রত্যেকেই আপন আপন ভাবে গঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সময়ে দেখা যাইত তারকনাথ যেন সর্ব্বদাই পৃথিবীর বাহিরে অন্য কোন একটি আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন—তিনি যেন সর্ব্বদাই আত্মহারা—মন আর দেহে

নাই। কোনও বাধাই তখন আর বাধা বলিয়া বোধ হইতেছে না—কোনও বিধি-নিষেধই তখন আর তাঁহার জন্য কোনও শৃঙ্খল রচনা করিতে পারিতেছে না—"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" এই মহাসূত্রই যেন তখন মূর্ত্তি লইয়া তারকনাথের প্রতি বাক্যে ও কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আবার যখন ভগবান্ লাভ না হওয়ায় গভীর বিরহে মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তারকনাথ তখন অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে আকুল হৃদয়ে গাহিতেছেন—

> হরি গেল মধুপুরী, হাম্ কুলবালা,
> বিপথ পড়ল সহি! মালতী মালা;
> নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস্,
> সুখ গেল প্রিয় সাথে, দুখ মোহি পাশ্।

কঠোর তপস্যায় দিনের পর দিন যাইতেছে—মাথার কেশ রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, দেহে ধূলা কাদা মাটী! দেহের দিকে তাকাইবার সময় তখন তারকনাথের ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ এই অবস্থায় তারকনাথকে দেখিয়া যেদিন কলিকাতার এক বাড়ীতে তাঁহাকে কল-তলায় বসাইয়া দেহ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন—সেদিন দেখিলেন, সেই আত্মভোলা সন্ন্যাসীর দেহচর্ম্মের উপর হইতে পরতে পরতে মাটী ধুইয়া পড়িতেছে! অনেক ক্ষণ ধৌত করার পর তবে চর্ম্মের স্বাভাবিক বর্ণ বাহির হইল!

তারকনাথ কহিলেন—"সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে ব'সে জপ করি আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটি ডুব দিয়ে আসি। গা-ও ঘসিনি, গা-ও পুঁছিনি; যেখানে-সেখানে প'ড়ে থাকি, সেই জন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে। ওহে! একটু গুল দাও দিকিনি! দাঁতটা মাজি, অনেক দিন দাঁত মাজ্‌তে ভুগে গেছি!"

বরাহনগরের মঠে এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল—কিন্তু কৈ ভগবান্ লাভ ত ঘটিল না! যে জন্য এত কৃচ্ছ্রসাধন তাহার শেষ ফল কি এই হইল? সকলেই অত্যন্ত মন-ভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। অনেকে ভাবিতে লাগিলেন—কলেজ ছাড়িলাম, গৃহ ছাড়িলাম, আহার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া দিন দিন কৃশ হইলাম। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলাম—ধূলা মাটী অঙ্গের ভূষণ করিলাম। কিন্তু কৈ? যাঁহার জন্য এত করিলাম তিনি কৈ! তিনি কোথায়! চল, আর তপস্যায় কাজ নাই—গৃহে—ফিরি! এমন সময় একদিন নরেন্দ্রনাথ আসিয়া ধ্যানে বসিলেন। নিকটে একখানি বাইবেল পড়িয়াছিল। ধ্যানান্তে উহা খুলিতেই দেখা গেল লেখা আছে—"*He that puteth his hand unto the plough and looketh back shall never reap the harvest*"—কি সুন্দর আশার বাণী! স্বয়ং যিশুখৃষ্টই যেন সে দিন দয়া করিয়া যুবক সন্ন্যাসীদিগকে ভগবৎ আরাধনার পথ দেখাইলেন—কহিলেন,—'মাটী চষিবে বলিয়া লাঙ্গলের মুঠা ধরিয়াই অন্যদিকে মন দিয়াছ! এমন করিলে কি জমীতে ফসল ফলিবে?' নরেন্দ্রনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন—"সকলেই যদি বাড়ী ফিরে যায় ত যাক্, আমি যাচ্ছি না। আমি যে পথ ধরেছি সেই পথেই থাক্‌ব।" নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের শক্তি সেদিন অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের অন্তরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিল। মঠ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা পলকে বিদূরিত হইয়া গেল। মঠের সন্ন্যাসিগণ আবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা) মঠের একটি প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানে বসিলেন—আহার করিবার জন্যও উঠিলেন না। অনেক ডাকা-ডাকির পর কহিলেন—"যদি তারক আমাকে স্পর্শ করিয়া থাকে তবে আমি আসন ছাড়িব। তারকের স্পর্শই জপের সমান।" তারকনাথ ছিলেন

তখন বরাহনগরের মঠের কর্ত্তা। তিনি অবিলম্বে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের দেহ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে ভোজনের স্থানে আনিলেন এবং ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে স্পর্শ করিয়াই রহিলেন। গুরুভ্রাতাগণ তারকনাথকে যে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৪/ "ধ্যান করিবার সময় ত্রাটক বা একদৃষ্টি বলিয়া একটা প্রথা আছে। এই ত্রাটক করিলে মনটা স্বভাবতঃই স্থির হইয়া যায়। এক প্রকার ত্রাটক হইতেছে—নাসিকাতে দৃষ্টি। নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিলে মন স্থির হয়।…চলিত ভাষায় ইহা হইতেছে পদ্মনেত্র।…তারকনাথ ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে অল্প দূরে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন।" তারকনাথ জপ অপেক্ষা ধ্যানেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বলিতেন—"আমি কি রকম ধ্যান করি জান? মহাব্যোম বা মহাশূন্যের ভিতর আমি স্থির হ'য়ে ব'সে আছি—সত্ত্বা মাত্র আছে—দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে থাকি। এমন কি কোন চিন্তাই উঠিতে দিই না। এক ভাবে স্থির, নিশ্চল, নিষ্পন্দ হ'য়ে, সত্ত্বামাত্র অবলম্বন ক'রে বসে থাকি। আমার এই ধ্যানটা ভাল লাগে।" (১)

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। ধ্যান সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কাল বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সাম্নে যে রয়েছে তা' বুঝতে পারতুম না, মন নিরোধ হ'য়ে যেত—কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠ্‌ত না—যেন নির্বাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখ্‌তে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোনও সামান্য বাহ্য বিষয় ধ'রে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধ'রে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হ'য়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা।……এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হ'তে পারে না। যিনি যে বিষয় ধ'রে ধ্যানসিদ্ধ হ'য়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্ত্তন ও প্রচার করে গেছেন। তারপর

প্রথম জীবনে তারকনাথ কোনও স্থানে দীর্ঘ দিন বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না—সর্ব্বদাই নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বরাহনগর মঠে অল্পদিন থাকিবার পর তিনি কাশীতে গেলেন এবং তথা হইতে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ঝুসীতে যাইয়া তপস্যা করিতে

কালে, তাতে মনঃস্থির করতে হ'বে একথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (Means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (End) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশূন্য করা—তা' কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হ'লে হবার যে নাই।"—স্বামি-শিষ্য সংবাদ।—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।—স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন—"প্রথম প্রথম ধ্যান ত মনের সঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপদ্মে লাগাতে হয়। ধ্যান না কর্‌লে মন স্থির হয় না। আবার মন স্থির না হ'লে ধ্যান হয় না। মন স্থির হ'লে ধ্যান কর্‌ব, এইরূপ ভাব্‌লে আর কখনও ধ্যান করা হবে না। দুই-ই এক সঙ্গে কর্‌তে হ'বে। মনের বাসনাদি সব কিছুই নয়, ধ্যানের সময় ভাববে 'সব অসৎ'। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্রমে মনেতে সৎভাবের impression (সংস্কার) হবে। খুব কাজ করে যাও। প্রথম প্রথম বেগার দেওয়ার মতই লাগে—যেমন 'ক' 'খ' শিখবার সময়। তারপর ক্রমে শান্তি আস্‌বে। ধ্যান-ধারণার কোন condition (বাঁধাবাঁধি) নেই। নির্জ্জন স্থানে ধ্যান অভ্যাস কর্‌লেই হ'ল। যত বেশী (ধ্যান ধারণা) কর্‌তে পার্‌বে ততই মন একাগ্র হ'য়ে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে। নিত্য নিয়মিতভাবে কর্‌তে হবে। ধ্যান মানে তাঁকে নিরন্তর ভাবা। উহা পাকলে—প্রত্যক্ষ হ'লে তবে সমাধি। চার বার ধ্যান কর্‌বি—সকালে, স্নানের পর, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে। প্রথম প্রথম মন স্থূল বিষয়ে থাকে। ধ্যান জপ কর্‌লে তখন সূক্ষ্ম বিষয় ধর্‌'ত শিখে। বাজে গল্প-টল্প না ক'রে সারা দিন তাঁর স্মরণ-মনন কর্‌বি। খেতে শুতে বস্‌তে—সর্ব্বক্ষণ। ঠাকুর বল্‌তেন—'মনের বাজে খরচ কর্‌তে নেই'—অর্থাৎ, তাঁর স্মরণ-মনন কর্‌তে হবে। স্মরণ-মনন সর্ব্বক্ষণ অভ্যাস হলে, তখন ধ্যান কর্‌'ত বস্‌লেই জমে যায়। ধ্যান যতই জম্‌বে ততই ভিতরে আনন্দ। আসনে বসেই অমনি ধ্যান জপ আরম্ভ [illegible]তে নেই। প্রথম বিচার ক'রে মনকে বাইরে থেকে গুটিয়ে এনে, তারপর ধ্যান জপ আরম্ভ কর্‌তে হয়। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ ভিন্ন রাস্তা নেই। রাম ও কাম একসঙ্গে হয় না। সাধন ভজনের প্রথম অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম করা খুব ভাল—এত সময় জপ কর্‌ব, এত সময় ধ্যান কর্‌ব এত সময় পাঠ কর্‌ব ইত্যাদি। বেশ সোজা হ'য়ে পা মুড়ে বস্‌বে, দুটি হাত বুকের কাছে কিংবা উপর পেটের উপর রেখে ধ্যান কর্‌বে। আসনে বসেই ধ্যান কর্‌বে না। দু' তিন মিনিট চুপ ক'রে ব'সে থেকে মনকে Blank (শূন্য) কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। যেন অন্য কোন চিন্তা মনে উদয় না হয়। তারপর ধ্যান কর্‌বে।

—ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ।—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

লাগিলেন। ডাক্তার গোবিন্দ চন্দ্র বসু বলিয়াছেন—"এই দুইটি যুবক জ্বলন্ত পাবকের ন্যায়—যেমন জ্ঞান, তেমনি ধ্যান, তেমনি বৈরাগ্য। দু'জনে গিয়ে ঝুসীতে তপস্যা কর্‌তে লাগ্‌লেন। শুধু পা, আর গায়ে একখানা ঘোড়ার কম্বল! তাঁরা কঠোর তপস্যা সুরু কর্‌লেন। আমি এক একদিন গিয়ে দেখে আস্‌তুম্। লজ্জায় ও ক্ষোভে আমার বুক ফেটে যেত! আমি জুতা মোজা পায়ে দিয়ে, গায়ে জামা ও আলোয়ান দিয়ে দু'জনকে দেখ্‌তে যেতুম; কিন্তু এই দুইটি দেবপ্রতিম যুবক শুধু পায়ে, একটা ঘোড়ার কম্বল গায়ে দিয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন! পায়ের গোড়ালী ফেটে গেছে! আমি সন্ধ্যার আগে বাড়ীতে ফিরে আস্‌তুম্, কিন্তু আমার প্রাণটা সেখানে প'ড়ে থাক্‌ত।" এই সময়ের তপস্যার কথায় স্বামী শিবানন্দ (তারকনাথ) বলিয়াছেন—"কি দিন, কি রাত্তির, একভাবে ধ্যানে কাট্‌ত! সকাল বেলা একবার ছত্রে গিয়ে খানকতক রুটি আর একটু ডাল আন্‌তুম্, কিন্তু তা' দিয়ে খাওয়া চলে না। গোবিন্দ ডাক্তার মাঝে মাঝে একটু আনাজ-তরকারী দিয়ে আস্‌ত। সেই আনাজ-তরকারী রেঁধে মাঝে মাঝে একটু মুখ বদ্‌লাতুম্।

মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী এই ভাবে কন্‌খল, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বদ্রীনারায়ণ, আল্‌মোড়া প্রভৃতি সেকালের দুর্গম তীর্থক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া সেই সকল স্থানে যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সে কাহিনী হয় ত বেশী লোকের নিকট পরিচিত নাই। কিন্তু সেই সাধনলব্ধ শক্তি-বলে তিনি যে শত শত ব্যক্তির তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছিলেন ইহা সেইদিনের কথা। সেই নির্লিপ্ত, আসঙ্গবিরহিত, প্রেমময় মহাপুরুষ বহু-শত জনের গুরু হইয়াও কোনদিন কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই যে, তিনি গুরু—তিনি তাঁহাদের পরম দেবতা। এদিকে "তিনি যে (সামাজিক) পুরাতন-ধারার বিরোধী ছিলেন তা'ও নয়—তাহাও তিনি মানিতেন;

কিন্তু যেখানে আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, সেখানে পুরাতন-ধারা বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিতেন। তিনি সময়োপযোগী আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। গোঁড়ামী, বিধি-নিষেধ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না এবং অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন বা হৈ চৈ করাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। যেখানে যেটুকু আবশ্যক, তিনি সেইটুকুই পরিবর্ত্তন করিতেন। এইজন্য তিনি এত লোকরঞ্জন হইয়াছিলেন।" (১) স্বামী শিবানন্দ মহারাজের চরিত্রের এই দিকটি দেখিলে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সেই তেজোগর্ভ বাণী—"দেশ, সভ্যতা ও সময়োপযোগী ক'রে সকল বিষয়েই কিছু কিছু change (পরিবর্ত্তন) ক'রে নিতে হয়।······আহার, চালচলন, ভাব ভাষাতে তেজস্বিতা আন্‌তে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার কর্ত্তে হ'বে—সব ধমনীতে রক্ত-প্রবাহ প্রেরণ কর্‌তে হ'বে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে দেশের লোক—survive কর্ত্তে (বাঁচ্‌তে) পার্‌বে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এদেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।" (২)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের পর বেলুড়-মঠের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বরূপে স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে বলিতে শুনা গিয়াছে—"দেখ! এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান্ লাভ, সাধন ভজন—এই হ'ল এখানকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখ ও সাধন ভজন করে—এই হচ্চে দেখ্‌বার জিনিষ। বামুন কি কায়েৎ, কি বাগ্দী, এ কথার কোন আবশ্যক নেই; কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোন কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান।— শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত।
(২) স্বামী-শিষ্য সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। যে ঠাকুরকে মান্‌বে, সাধন ভজন কর্‌বে, সে-ই এখানে থাক্‌তে পার্‌বে। জাতাজাতির কথাটা এখানে হওয়া উচিত নয়।" (১) স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—Through Laws unto no Laws—নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই নিয়মহীন রাজ্যে পৌছিতে হইবে। স্বামী শিবানন্দ মহারাজেব কর্ম্ম ও জীবন ছিল এই বাণীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

বেলুড় মঠ—"ভারতের মহামানবের সাগব-তীর!" (২) সেই তীরে দাঁড়াইয়া মঠের মোহন্ত-মহারাজ স্বামী শিবানন্দ উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া খৃষ্টান, মুসলমান, বাগ্দী—আর্য্য অনার্য্য সকলকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিতেন। তখন তাঁহার কণ্ঠে এক স্বর-শূন্য সঙ্গীতধ্বনি বাজিয়া উঠিত, যাহার ভাব ছিল—

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য
হিন্দু, মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ—
এসো এসো খৃষ্টান।

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২) শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ নানা তীর্থভ্রমণানন্তর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আলমবাজার মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ পর বৎসর পাশ্চাত্য প্রদেশে যাত্রা করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যজ্ঞ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। "ধ্যান পূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্র-নির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভস্মাস্থি, স্বামীজি স্বয়ং দক্ষিণ-স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য (শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টা রোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাবভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথি মধ্যে স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন—"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায়, যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাক্‌ব। তা' গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি।" সে জন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে ক'রে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জান্‌বি, বহুকাল পর্য্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হ'য়ে থাক্‌বেন।"—(স্বামি-শিষ্য সংবাদ।—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।) বেলুড়ের বর্ত্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ম্মরমন্দির ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৩৪২, ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া) অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শততম জন্মতিথি উপলক্ষে রচিত হইয়াছে।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সাবাকার
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।

—গীতাঞ্জলী

সর্ব্বাবস্থায় নিরভিমান, উদার ও প্রেমপূর্ণ পূর্ণ হৃদয় স্বামী শিবানন্দ মহারাজ নিজেকে সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াই চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথা-বার্ত্তা ও হাবভাব শুধু এইটুকুই প্রকাশ করিত যে, তিনি এক আনন্দময় লোকে বিরাজ করিতেছেন—তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। সর্ব্বদা অচঞ্চল, সকল কার্য্যে স্থির ধীর এবং পৃথিবীতে থাকিয়াও সর্ব্বদা পৃথিবীর বাহিরের মনোময় লোকে বিচরণ করিয়া তিনি নিরন্তর উপাসনার জীবন্ত প্রতীকরূপে ভাগীরথী-তীরে বিচরণ করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি বলিতেন—"দেহটার আর কি আছে? যা' করবার সে করেছে। তবে অকারণে এইটাকে ফেলে দিবার আবশ্যক নেই। যতদিন থাকে থাক্। এজন্য মনকে বিশেষ চঞ্চল কর্‌বার আবশ্যক নেই! দেহটা হচ্চে জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন কর্‌বার একটা উপকরণ। সে সব কাজ খুব করেছে; তবে যখন ইচ্ছা হবে, একেবারে সমাধিতে চলে যাব, দেহটা আপনি খসে পড়্‌বে।" ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ স্বেচ্ছায় সেই তাপসবাঞ্ছিত মহাসমাধিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন্ ও মঠ উজ্জ্বল হইয়া রহিল —মঠকে ঘিরিয়া তাঁহার বাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল—"আনন্দময় জগৎ— সর্ব্বত্র আনন্দ দেখ্‌ছি; আমি মহা আনন্দে আছি, তবে দেহটা বড় জীর্ণ হয়েছে, মাঝে মাঝে গোলমাল করে। তা ঐদিকে মন না দিলেই হয়। দেহটা যা ইচ্ছে হয় করুক। আমার মনটাকে ওর জন্য চঞ্চল কর্‌বার আবশ্যক নেই।

যোগিরাজ

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

ছেলেরা অন্যের কাছ থেকে ধার ক'রে কতকগুলি কথা মুখস্থ ক'রে পাশ কচ্ছে—এদের বিদ্যা হচ্ছে ধোবা-ভাঁড়ারের মত; ধোবার নিজের কাপড় নাই—সব পরের কাপড়।........ধার করা বিদ্যা জীবনের কোন প্রকৃত কাজেই আসে না। জ্ঞান কি বাহিরে থেকে কেউ দিতে পারে? জ্ঞান তোর ভিতরেই আছে। এইটি বিশ্বাস কর্—তুই অনন্ত জ্ঞানের আধার। শুধু বই পড়্‌লে কি হবে।........উপনিষদ্ বলেছেন—"যে আনন্দ পেয়েছে, সে সকল ভয়ের পারে গিয়েছে।" অতএব আনন্দলাভই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আজকাল ছাত্রদের পড়ার ঠেলায় প্রায় নিরানন্দেই সদাসর্ব্বদা থাকৃতে হয়। কি হ'বে এই বিদ্যায়! যে বিদ্যা হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দের সৃষ্টি করে, নিম্ন হ'তে উচ্চ দিকে ধাবিত করে, সমস্ত অজ্ঞানতা দূর ক'রে আত্মজ্ঞান দিতে পারে সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা।

—সৎ চিন্তা কর্, জুয়াচুরী ত্যাগ কর্—আবার দেশের অবস্থা ফিরে যাবে, দেশের কল্যাণ হবে। সত্য ভিন্ন উপায় নাই—সত্যকে আঁকড়িয়ে ধর্। সত্যমেব জয়তে নানৃতং। ঈশ্বর সত্য স্বরূপ।

—ভগবানের শরীরে সত প্রকার শক্তি আছে, তার প্রত্যেক শক্তি কণিকাকারে প্রত্যেক জীবের মধ্যে বর্ত্তমান........সে শক্তিকে তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে জাগিয়ে তোলো, দেখ্‌বে সে শক্তি অসীম। অসীম পুরুষের অংশ ত অসীম হবেই, কারণ Every part of Infinite is Infinite (অসীমের অংশটিও অসীম)।

—তপস্যা মানে উধাও হ'য়ে ঘুরে বেড়ান নহে। নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপ, ধ্যান, আত্মসংযম করার নাম তপস্যা।......চিত্ত শুদ্ধ যতদিন না হইতেছে, ততদিন মনের চঞ্চলতা যাইবে না। মনের চঞ্চলতা থাকিলে জপ-ধ্যান ভাল লাগে না। সে সময়ে পূজা, সাধুসেবা, গীতাদি পাঠে মন লাগাইতে হইবে এবং ভগবানের নিকটে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে।........ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি দিয়া থাকেন।........প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরে বসিয়া ২।৩ হাজার বার ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌বি এবং প্রার্থনা কর্‌বি। জপ করিতে করিতে মন স্থির হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি চিন্তা কর্‌বি।........হাতে তালি দিয়ে 'হরিবোল' 'হরিবোল' একশতবার বল্‌বি। এইরূপ করিলে মনের পাপ দূর হইয়া যাইবে। —কাম ক্রোধাদি জীবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এগুলি দোষের নয়। তবে এগুলির দাস হইয়া যাওয়াই দোষের। এগুলি বাড়ালেই বাড়ে এবং কমালেই কমে। যে দিকে অভ্যাস করিবে, সেইরূপ ফল পাইবে। প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ আছে—এই দুই পথের দ্বারাই ঈশ্বর লাভ হয়। তোমরা প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। তোমরা যদি দিনের মধ্যে একবার ভগবানের নাম ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত কর—তাহাই যথেষ্ট। তোমাদের কোন ভাবনাই নাই।

—জাতীয় ধর্ম্ম ও দেশীয় জিনিসের উপর যতদিন আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ফিরিয়া না আসিবে ততদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হইতে পারিবে না।

—স্বামী অভেদানন্দ

(১)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহার অন্তরে নিহিত বিরাট শক্তির অসাধারণত্ব উপলব্ধি করিলেন তখনই বুঝিতে পারিলেন—মুক্তিলাভের জন্য নহে, মুক্তি-বিতরণের জন্যই তাঁহার আগমন হইয়াছে। অপূর্ব্ব যোগ-দৃষ্টিবলে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও লীলাসহচরগণ অচিরেই আসিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং কৃপালাভ করিয়া দেশে দেশে, দিকে দিকে মানবের পরম ধর্ম্ম বেদান্তের বাণী প্রচার করিবেন। রাণী রাসমণির জামাতা পরম ভক্ত মথুর বাবুকে তাই একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে। তারা সব আস্‌বে, এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জান্‌বে, শুন্‌বে, প্রত্যক্ষ

করবে—প্রেমভক্তি লাভ করবে। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে—তাই এ খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেয় নি—রেখেছে।" (১) ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের কোনও সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সকল উপলব্ধি হইয়াছিল এবং অন্তরঙ্গগণের আগমনের বহু পূর্ব্বেই তিনি যোগবলে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের পর তিন বৎসর কাটিয়া গেল, অন্তরঙ্গদিগের বিরহে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে বিশেষ কোনও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল না। শুনিতে পাওয়া যায় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কোনও একদিন একটি সুদীর্ঘকাল-স্থায়ী সমাধির অন্তে অন্তরঙ্গদিগের জন্য তাঁহার হৃদয় ক্রমেই বেশী ব্যাকুল হইয়াছিল। মনীষী রোমা রোলাঁ কর্তৃক বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা পাঠে জানা যায় যে, ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে একে একে ১৯ জন ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া জগৎ-গুরুর চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদিগের মধ্যে ১১ জন তাঁহার নিকট হইতে গৈরিক বসন লাভ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। (২) শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার এই একাদশ জন লীলা-সহচরের বৃত্তান্ত শুধু বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের একটি বিশিষ্ট যুগের অমূল্য ইতিহাস —সে ইতিহাস এখন সমুদ্রপারেও মঠ, সঙ্ঘ, সমিতি ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার কালে আপন জয়ধ্বজা প্রোথিত করিতেছে। 'কথামৃত' এবং "লীলা-প্রসঙ্গ"কেই সেই ইতিহাসের শেষ কথা বলিয়া গ্রহণ করিবার যুগ এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে যে সকল অনৈক্য

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২) The Life of Sri Ramkrishna—Romain Rolland—Page 202.

এখনই দেখা যায় সেগুলির সমন্বয়-সাধন করিবার প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। (১)

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে বাঙ্গালাদেশে পাশ্চাত্য-মহিমার ঝড় বহিতেছিল এবং সেই ঝড়ে বহু দূরে উড়িয়া গিয়াছিল গীতা, গায়ত্রী ও গুরু! নবগঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য তখন একদিকে যেমন ব্রতী হইয়াছিলেন কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি—তেমনি নির্ব্বাসিতপ্রায় সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে পুনরায গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্রত ধারণ কবিয়াছিলেন পরিব্রাজক ও বাগ্মী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং পরম পণ্ডিত শশধব তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি। একদিন কলিকাতার কোনও সুবিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে তীক্ষ্ণধী ও সুপণ্ডিত চন্দ্রনাথ বসু পর্য্যন্ত এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, বক্তার বাহু ধরিয়া সভাব মধ্যেই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন!

পণ্ডিত-চূড়ামণি শশধরের মুখে হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সেকালের কলিকাতায় কিরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—"নানা মুনির নানা মত কথাটি সর্ব্ববিষয়ে সকল সময়েই সত্য; পণ্ডিতজি

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের মুখপত্র "বিশ্ববাণীতে" শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আমেরিক প্রবাসের 'ডায়েরী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে স্বামী শঙ্করানন্দ লিখিয়াছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং নূতন রূপ ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। উপাদান সংগ্রহে ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির অভাবে অসংখ্য ভ্রম প্রমাদ, পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা পরমহংসদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়া, সত্যান্বেষণের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়াছে।"—বিশ্ববাণী, বৈশাখ—১৩৪৬। নবপর্য্যায় 'বিশ্ববাণী' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ করিতে করিতে আমার মনেও অনুরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় কতকগুলি অনৈক্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের শ্রীকরে অর্পণ করিয়াছিলাম। এই দীন লেখকের উপর অসীম স্নেহবশতঃ তিনি দয়া করিয়া সেই প্রবন্ধগুলিই স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মব্যাখ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা মিথ্যা হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোতার হুড়াহুড়ির অভাব ছিল না। আফিসের ফেরতা বাবু-ভায়া ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত। আল্‌বার্ট-হলে স্থানাভাবে ঠেশা-ঠেশি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সকলেই স্থির, উদ্‌গ্রীব—কোনরূপে পণ্ডিতজির অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যা যদি কতকটা শুনিতে পায়।··· কলিকাতার অনেকস্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা, শশধর পণ্ডিতের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা!" (১)

এই অসাধারণ বাগ্মী যেদিন দক্ষিণেশ্বরের পুঁথিগতবিদ্যাহীন পরমহংস-দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন সেদিন তিনি তাঁহার বাণী শুনিয়া বিমোহিত হইয়া গেলেন এবং সজলনয়নে যুক্তকরে কহিলেন—"দর্শনচর্চ্চা ক'রে আমার হৃদয় শুষ্ক হ'য়ে গেছে; আমায় এক বিন্দু ভক্তি দান করুন।" শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিলে পণ্ডিতজি একটি নূতন মানুষ হইয়া ফিরিয়া গেলেন এবং কিছুকাল পরই প্রচার-কার্য্য ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য ৺কামাখ্যাধামে প্রস্থান করিলেন! তাঁহার কর্ণে নিয়ত বাজিতে লাগিল—শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী—"বাবা, আর একটু বল বাড়াও, আর কিছু দিন সাধন-ভজন কর। গাছে উঠ্‌তেই এক কাঁদি। তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এসব কর্‌ছ।··· যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি হ'বে?·· ···চাপরাশ থাক্‌লে তবে লোকে মান্‌বে।······চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা' ক'রে গেলেন তারই কি রয়েছে বল দেখি! আব যে আদেশ পায়নি তার লেক্‌চারে কি উপকার হবে।" (২)

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

যাহা হউক, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি যখন বাঙ্গালাদেশকে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন,—

বাক্য সুকৌশল অতি বল রসনায়।
শাস্ত্রের করেন ব্যাখ্যা বিবিধ সভায়॥

* * * *

আসিতে না পারে যারা অবস্থায় আড়ে।
বক্তৃতা বিক্রয় হয়, কিনে ঘরে পড়ে॥
—শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।(১)

সেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অনেকেই যেমন আল্‌বার্ট-হলে ভিড় ঠেলিয়া পণ্ডিতের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-কথা শুনিতে যাইতেন, ওরিয়েণ্টাল সেমিনরির ছাত্র সপ্তদশবর্ষ বয়স্কযুবক কালীপ্রসাদও তেমনি ভিড় ঠেলিয়া সভায় যাইতেন। অনেকের নিকট যাহা ছিল একটা সাময়িক হুজুগ মাত্র, কালীপ্রসাদের সর্ব্বদা জ্ঞানলিপ্সু দার্শনিক চিত্তের নিকট তাহা ছিল প্রাণের বস্তু। পণ্ডিতজির মুখে ওজস্বিনী ভাষায় বৈদেশিক ও সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে প্রাচীন ও নবীন ইউরোপের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে একটি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিল। যখন তিনি পাতঞ্জলীর যোগ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিলেন তখন সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগী হইবার জন্য হৃদয়ে ব্যগ্রতা জাগিল।

এক একজন মানুষ এক একটি ভাব লইয়া গড়িয়া উঠে। সেই ভাব তাহার প্রকৃতি। কোনও-কিছুকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়া বাল্যকাল হইতেই কালীপ্রসাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই তিনি যাহা-কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন, তাহার ভিতর যে কার্য্য-কারণ

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন।

সম্বন্ধটি নিহিত ছিল তাহাই জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেন। উইলসন্-কৃত ভারতের ইতিহাসে যেদিন তিনি দার্শনিকরত্ন ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের কাহিনী পাঠ করিলেন, সে দিন তাঁহার বালক-মন উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনিও শঙ্করের মত একজন দার্শনিক হইবেন ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। তখন সেমিনরির এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্রদিগের মধ্যে একজন সুদক্ষ চিত্রকররূপে তাঁহার খ্যাতি ছিল। কি পাঠ-শালায়, কি বিদ্যালয়ে ডবল্ প্রমোশন ও উচ্চ পারিতোষিক লাভ করিতেন বলিয়া একজন ভাল ছাত্ররূপে তিনি তখন সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার মন কহিল—তুমি এ কি করিতেছ, কালীপ্রসাদ? হাতের তুলি ফেলিয়া দাও। চিত্রকর হইবার জন্য ত তোমার জন্ম নহে—তুমি আসিয়াছ দার্শনিক হইতে—দার্শনিক হও, চিত্র-শিল্প শিক্ষায় তোমার প্রয়োজন নাই। চিত্রকর শুধু উপরটা দেখে—তুমি অন্তর দেখিতে শিক্ষা কর। কালীপ্রসাদ সেই দিনই চিত্রাঙ্কনের তুলিকা পরিত্যাগ করিলেন।

যদিও তখন তিনি ছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনরির এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র মাত্র কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্যে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য তাঁহার যে উৎকট আগ্রহ ছিল তাহাই তাঁহাকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সেই অপরিণত বয়সেই তিনি ইংরাজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুদর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যেখানে যে আলোচনা হইত, তৎকাল-প্রসিদ্ধ সুবক্তাগণ যেখানে যে বক্তৃতা দিতেন, সুযোগ পাইলেই তিনি সে সমস্ত মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন এবং একাগ্রচিত্তে ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার পিতা রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় সেমিনরির একজন শিক্ষক ছিলেন। পুত্রকে গীতা পাঠ

করিতে দেখিয়া তিনি উহা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন—"একি পড়িতেছ? গীতা পড়িলে পাগল হইয়া উঠিবে!" (১)

পুত্রের নিকট হইতে পিতা ভগবদ্গীতাখানি কাড়িয়া লইলেন বটে, কিন্তু পুত্রকে গীতা-পাঠ হইতে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। কালীপ্রসাদ তখন লুকাইয়া লুকাইয়া গভীর রাত্রে গীতা পড়িতে লাগিলেন! তাই দেখিতে পাই, কালীপ্রসাদ যখন লোকগুরু হইলেন তখন তারস্বরে কহিলেন—"যেদিন থেকে আমাদের দেশ গীতাকে ত্যাগ করেছে সেদিন থেকে তার পতন সুরু হয়েছে।" (২) তাঁহার উপদেশ-বাণীর মধ্যে শ্রীগীতা সর্ব্বদাই জীবন্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন; ভগবদ্গীতার উপর তাঁহার অমুদ্রিত ৬৮ বর্ক্তৃতা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

ধর্ম্মজ্ঞানলাভ এবং যোগশিক্ষার জন্য আগ্রহ যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক ম্যাক্‌ডোনাল্ড বা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এবং অন্যান্য ধুরন্ধরদিগের অভিভাষণ শুনিয়া যখন আর তৃপ্তি হইল না, কালীপ্রসাদ তখন যোগশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট যোগ-সূত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং সেই সকল সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক হঠযোগ ও রাজযোগ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা, নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কি ভাবে রাজযোগ আয়ত্ত করিতে হয়, শিব-সংহিতায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যোগী হইবার আকাঙ্ক্ষায় কালীপ্রসাদ উহা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যোগ্য গুরুর নিকট উপদেশ না লইলে যোগ শিক্ষা করার চেষ্টা অত্যন্ত

(১) আত্মজীবনচরিত—Contemporary Indian Philosophy Edited by S. Radhakrishnan. D. Litt ও G. H. Muirhead L. L. D., F. B. A.

(২) যেমন শুনিয়াছি—ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য।

বিপজ্জনক ও বাতুলতা মাত্র! শুধু যোগের গ্রন্থ মাত্র অবলম্বন করিয়া যোগী হওয়া যায় না।

কালীপ্রসাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল—কৈ গুরু? কোথায় গুরু? কি করিলে, কাহার নিকট গেলে সেই গুরুর দর্শন পাইব—যিনি আমাকে যোগ শিখাইবেন!

ইহাকেই বলে গুরুলাভের জন্য ব্যাকুলতা! সকলেরই নির্দ্দিষ্ট গুরু আছেন, কিন্তু ব্যাকুলতা না হইলে তিনি দেখা দেন না। বেদনাকাতর মানবের অন্তর হইতে নিরন্তর যে রোদনের ধ্বনি উঠিতেছে তাহা এই—"অপ স্ম তং পথো যহি"—'পথ দেখাও ভগবান্, পথ দেখাও।' ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অন্ধকার সংসারসাগরের ভিতর দিয়া আমাদিগের শতচ্ছিদ্র তরণী-খানিকে যিনি অনায়াসে পারে লইয়া গিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বলেন—ঐ দেখ সম্মুখে আলোকস্তম্ভ, মাভৈঃ—অগ্রসর হও—আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি—তিনিই গুরু।

> গুরুপ্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
> তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ॥
>
> —শিব-সংহিতা,' ৩।৩০

গুরুর প্রসাদেই সর্ব্বশুভ লভ্য হয়; সেই জন্যই সর্ব্বদা (নিত্যম্) গুরুসেবা করা উচিত, নতুবা 'শুভং ন ভবেৎ'। কালীপ্রসাদ যখন ব্যাকুলচিত্তে সেই 'আনন্দমানন্দকর' প্রসন্ন জ্ঞানস্বরূপ ভবরোগবৈদ্য শ্রীগুরুর সন্ধান করিতে লাগিলেন তখন সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট শুনিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন তিনি ইচ্ছা করিলে যোগশিক্ষা দিতে পারেন।

কোথায় কলিকাতার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আহিরিটোলায় ক্ষুদ্র একটি গলি নীমু গোস্বামী লেন, যেখানে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর

কৃষ্ণা নবমী তিথিতে কালীপ্রসাদের জন্ম হইয়াছিল—আর কোথায় বা ভাগীরথীতীরে বনচ্ছায়ার অন্তরালে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী! তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে স্থলপথে সেই কালীবাড়ীতে গমন বালকদের পক্ষে সহজ-সাধ্য ব্যাপার ছিল না!

পথ যতই দুর্গম হউক না কেন, গুরুর নিকটে যাইয়া যেমন করিয়াই হউক যোগ শিক্ষা করিতেই হইবে—তাহা না করিলে ত আত্মজ্ঞান লাভ হইবে না—নরজন্ম বৃথায় কাটিবে—ইহাই ছিল কালীপ্রসাদের সুদৃঢ় ধারণা। কালীপূজা করিয়া মা তাঁহাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল কালীপ্রসাদ। মা কালীর পুত্র তিনি—তাঁহার আবার ভয়! সেই অপরিচিত দুর্গম পথে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এক রবিবারে মাত্র ১৭ বৎসর বয়স্ক নিঃসঙ্গ কালীপ্রসাদ প্রভাতে চিৎপুর রোড ধরিয়া যাত্রা করিলেন। যতই অগ্রসর হন, সে দুরন্ত পথ আর শেষ হয় না! ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল, ক্ষুধায় ও পিপাসায় দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল—কিন্তু হৃদয়ের ব্যাকুলতা তাহাকে উন্মাদের মত টানিয়া লইয়া চলিল।

পথ চলিতে চলিতে তিনি শুনিলেন—পথ হারাইয়াছেন! তিনি যেখানে আসিয়াছেন তাহা 'সাত পুকুর'—দক্ষিণেশ্বর নহে! কালী-প্রসাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

(২)

পথে, বিপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালীপ্রসাদ যখন দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রখর তপন তখন মাথার উপর গিয়াছে। পৌঁছিয়াই তিনি অনুসন্ধান করিলেন—'পরমহংস মশায় কি এখানে আছেন?' উত্তরে শুনিলেন—'না, তিনি নাই।'

"নাই—?"

"নাই, কলিকাতায় গিয়াছেন—রাত্রে আসিবেন।"

মুখে আর বাক্য সরিল না। যাঁহার জন্য এত শ্রমকেও তিনি শ্রম বলিয়া জ্ঞান করেন নাই,—তিনি আজ এখানে নাই। যে প্রবল আকর্ষণ এতক্ষণ তাঁহাকে টানিতে টানিতে শ্রীমন্দিরের দ্বারে আনিয়াছিল, মুহূর্ত্তে তাহা যেন তাঁহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বারান্দার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে পাথেয় নাই, বাড়ীতে না বলিয়া-কহিয়া একরূপ পলাইয়াই এক বস্ত্রে চলিয়া আসিয়াছেন। তাহার উপর দারুণ পিপাসা এবং তীক্ষ্ণ ক্ষুধার জ্বালা। কালীপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন,—'এখন কেমন করিয়া গৃহে ফিরিব? পদক্ষেপেরও ত সামর্থ্য আর নাই।'

এমন সময় একটি যুবক আসিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন—'চিন্তা কি? সম্মুখেই ওই শীতল গঙ্গা। স্নান করিয়া আইস এবং মাব প্রসাদ গ্রহণ কর। রাত্রে নিশ্চিতই পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইবে।'

যে যুবক এই ভাবে সেই অপরিচিত স্থানে হতাশ কালীপ্রসাদের প্রথম আশ্রয়দাতা ও বন্ধু হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুবিখ্যাত অন্তরঙ্গ-শিষ্য রামকৃষ্ণানন্দ নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাহার সংসারাশ্রমের নাম ছিল শশী।

শাস্ত্রে বলে—'জিতং জগৎ কেন, মনোহি যেন'—যিনি মন জয় করিয়াছেন, তিনিই জগজ্জয়ী হইয়াছেন। কালীপ্রসাদ অবিলম্বে মনকে জয় করিলেন এবং অনায়াসে সকল দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করিয়া পরমহংসদেবের দর্শনের আশায় দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। তিনি যে পরবর্ত্তী জীবনে স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বদাই মন জয় করিয়া জগজ্জয়ী হইয়াছেন—কত সুদুস্তর বাধা-বিপত্তি এবং কখনও-কখনও শত্রুতা,

অকৃতজ্ঞতা, অপ্রেম ও নির্য্যাতনের মধ্যেও সঙ্কল্পে অটল থাকিয়া বলিয়াছেন—'মেরা ঝাণ্ডা উঁচা রহে'—দক্ষিণেশ্বরে দেবীর দ্বারমূলে সেদিন তাহার প্রথম ক্ষুদ্র পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। (১)

পরদিন প্রভাতে কালীপ্রসাদ যখন ভাবিতেছিলেন, না জানি এই যোগী পরমহংসটি কি প্রকারের লোক—বুঝি বা দীর্ঘ জটাজুট-শোভিত ভস্মানুলিপ্ত একজন ভীষণাকৃতি সন্ন্যাসী!—তখন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের শয়নকক্ষের মধ্যে ডাকিলেন। প্রবেশ করিয়াই কালীপ্রসাদ দেখিলেন—ইঁহার ত জটা নাই, দেহে ভস্ম নাই, সম্মুখে ত্রিশূল নাই, পরিধানের বসনও ত গৈরিক নহে। নয়নে বদনে যেন করুণার প্রস্রবণ ঝরিতেছে। এ তবে কেমন যোগী?—কেমন সন্ন্যাসী?

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহমধুরকণ্ঠে কহিলেন—"আমার কাছে তুমি কি চাও বালক?"

কালীপ্রসাদ কহিলেন—"আমি যোগ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে শিখাইবেন কি?"

(১) ঘরে তিনি এত সহজভাবে থাকিতেন যে, আমাদের (বেদান্ত মঠের ব্রহ্মচারীদিগের) মনে হইত তিনি আমাদের সমানই বা হইবেন! অনেক সময় আমরা তাঁহাকে উপদেশ দিতে গিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের লেশ মাত্র না থাকাতে কেহই বুঝিতে পারিত না যে তিনি অনন্তসাধারণ। তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ভাব কুটিল জগৎ বুঝিত না, তাই তাঁহাকে অহঙ্কারী মনে করিত। তিনি এত সরল ছিলেন যে, যদি [illegible] অদৃশ্য শক্তি তাঁহাকে রক্ষা না করিত তবে তাঁহাকে যে কত বিপদে পড়িতে হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি সরল স্পষ্টবক্তা হওয়াতে অনেকেই তাঁহার উপর চটা ছিলেন এবং তাঁহাদের সাধ্যমত তাঁহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই! কিন্তু তিনি অম্লানবদনে সকলকেই ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগকে জানাইতে চাই, যাঁহারা শুধু অসৎ উদ্দেশ্য বা ক্ষমতার লোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়াছেন।—সংঘ-বার্ত্তা, বিশ্ববাণী—আশ্বিন, ১৩৪৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর কহিলেন—"নিশ্চয় শিখাইব।"

তিনি কালীপ্রসাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং তপস্যালব্ধ দিব্য দৃষ্টিতে বালকের জন্ম জন্মান্তর দেখিয়া লইয়া কহিলেন—"পূর্ব্ব জন্মে একজন বড় যোগী ছিলে—এসো বৎস! আমি তোমাকে যোগ শিক্ষা দিব।......এখন তোমার সামান্য বাকি আছে। এই তোমার শেষ জন্ম।" (১)

পরমহংসদেব কালীকে উত্তর-বারন্দায় লইয়া গিয়া একখানা তক্তা-পোষের উপর বসিতে বলিলেন—এবং তাঁহার 'জিহ্বায়' স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা মূল মন্ত্র লিখিয়া দিয়া বক্ষে হস্তাপর্ণ করিলেন। "ভগবানের পদ্মহস্ত-স্পর্শে কুল-কুণ্ডলিনী বিদ্যুদ্বেগে সুষুম্না পথে উর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া কালীর মনকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন করিয়া দিল। শীঘ্রই কালী কাষ্ঠবৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া পড়িলেন। পরমহংস-দেব পুনরায় বুকে হাত দিয়া কালীর সংজ্ঞা আনয়ন করতঃ ধ্যান, যোগ ও সমাধি সম্পর্কে নানাবিধ গূঢ়তত্ত্বের উপদেশ দিয়া বলিলেন—

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পীরিত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥ (২)

এইভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কালীপ্রসাদ মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু "প্রতি সপ্তাহে ২।৩ বার—বিশেষতঃ প্রতি রবিবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিতে লাগিলে। ঠাকুর বলিতেন—"তুই না এলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়।—তোকে রোজ রোজই দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।"

(১) আত্মচরিত—Contemporay Indian Philosophy Edited by S. Radha-krishnan D, Litt. and J. H. Muirhead L. L. D. F. B. A.

(২) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত। (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)

শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়া কালীপ্রসাদ উত্তরোত্তর সাধনার উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অন্তর এমনিই বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল যে, গৃহ-সংসার আর ভাল লাগিল না। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ভিন্ন আর যেন কেহ বন্ধু নাই—আত্মীয় নাই—আর যেন কোনও সহায় বা সম্বলও নাই।(১) তখন ধ্যানস্থ

(১) স্বামীজি-মহারাজের দেহরক্ষার পর তাঁহার কাগজ-পত্রের মধ্যে একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। তিনি যে গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে কি ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কবিতাটি সেই পরিচয় দেয়:—

তুমি যে কৃপা করেছ প্রভো
তাহা কি আমি ভুলিতে পারি,
তুমি যেমন খেয়েছ আমায়,
আমি তেমনি খেয়েছি তোমায়;
এ রহস্য বুঝিবে কেবা
তাহা আমি বলিতে নারি।
তোমার আদেশে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করতে নারি।
(*It will die with me*)
তুমি আমি এক হয়েছি
তুমি আমি ভিন্ন নহি।
তুমি আধেয় আমি আধার—
এ দেহ-মন-প্রাণ সকলি তোমার।
সমর্পিনু দেব, তোমার চরণে
যাহা খুসী কর জীবনে-মরণে।

—বিশ্ববাণী—পৌষ, ১৩৪৬।

আমার মনে হয় স্বামীজি-মহারাজের এই কবিতাটি অসম্পূর্ণ। অকস্মাৎ কোনও দিন প্রাণের আবেগে তিনি উহা লিখিয়াছিলেন। উহা ভক্তের আকুল আত্মনিবেদন—তাঁহার ন্যায় বৈদান্তিকের বেদান্তবাদের ইঙ্গিত নহে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে কতদূর নিবিড় ছিল এই কবিতা তাহার কিছু পরিচয় দেয়। "তোমার আদেশে এ রহস্য প্রকাশ আমি করিতে নারি"—"It will die with me"—পাঠকগণ এই কথা কয়টির অর্থ অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন।

হইবামাত্র নানা দেব দেবীর জীবন্ত মূর্ত্তি তাঁহার মানসনয়নে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাকে বিস্ময়ে, আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ করিয়া দিত। ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে কালীপ্রসাদ নানা অচিন্তিতপূর্ব্ব উপলব্ধিসমূহ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলেন। বেদাদিপ্রসিদ্ধ ভগবানের উৎকৃষ্ট তত্ত্বসমূহ "দিবীবচক্ষুরাততম্", যাহা সর্ব্বদা জ্ঞানীর নয়নে আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রতিভাত হয়, ধ্যান করিতে করিতে একদিন কালীপ্রসাদের সেই তত্ত্বদর্শী নয়নের দিব্যানুভূতিও ঘটিল। অনুভূতির পর নবীন অনুভূতির আনন্দে কালীপ্রসাদ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন বৈকুণ্ঠ-দর্শন করিলেন! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন—'এখন তোর রূপদর্শনের ঘর শেষ হলো, তুই অ-রূপের ঘরে গেলি।" বৈকুণ্ঠ-দর্শনের ব্যাপারটি ছিল এইরূপ ঃ—

"একদিন তিনি গভীর রাত্রে ধ্যানস্থ হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার আত্মা দেহরূপ পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া স্বাধীন বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিয়া অনন্ত আকাশে ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে উর্দ্ধগামী হইয়া অবশেষে অপূর্ব্ব দৃশ্যসমূহ দেখিতে দেখিতে এক সুন্দর শোভাসমন্বিত প্রাসাদপথে অনির্ব্বচনীয় স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া স্তরে স্তরে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্নভাবের মূর্ত্তিবিকাশ দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, খৃষ্টান, ইস্‌লাম্ প্রভৃতি ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও প্রতীক দেখিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া গেলেন। এমন সময়ে তিনি কোনও অমানবীয় অতিবাহিক আত্মার প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া এক বিরাট কক্ষে (বড় হলের ন্যায়) প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে এক একটি বেদীতে যত দেব-দেবী, অবতার পুরুষ, ধর্ম্ম-প্রচারকগণ (যেমন হিন্দুর দশাবতাব এবং শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, জরথুষ্ট্র,

মহম্মদ) এবং সর্ব্বধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণ—নানক, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। কালীপ্রসাদ তখন দেখিতে পাইলেন,—পরমহংসদেব সেই হলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এই দৃশ্য দেখিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, ক্রমশঃ পরমহংসদেবের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বিরাট রূপ ধারণ কবিল এবং প্রত্যেক বেদীর অধিকারী-পুরুষ আপনাপন আসন হইতে উত্থিত হইয়া পরমহংসদেবের বিরাট অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।" (১)

পরবর্ত্তী কালে সাধনসিদ্ধ কালীপ্রসাদ যখন গুরু হইলেন তখন একদিন একজন ভক্ত শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—"ঠিক ঠিক ধ্যান কর্‌লেই ঈশ্বর লাভ হয়। প্রথমে স্থূল ধ্যান কর্‌তে হয়, তাবপর সূক্ষ্মে মন যায়। তার পর কারণে মন যায়, তার পর মহাকারণে মন যায়। ······ঈশ্বর লাভ তো রে সোজা! কেন হ'বে না—চেষ্টা কর্‌লেই হ'বে।···আমরা যখন তপস্যা কর্‌তাম তখন দেহের উপর কোন মমতা ছিল না; কা'রো সঙ্গে কথা কইতাম না, কা'কেও পায়ে হাত দিতে দিতাম না। কখনও গান গাইতাম, কখনও ধ্যান কর্‌তাম। ঠাকুব বারো বৎসর ঘুমালেন না;—আমরাও ভাব্‌তাম, আমরা তাঁর সন্তান, আমরা কেন পার্‌ব না; আমরা যতটা না ঘুমিয়ে থাক্‌তে পার্‌তাম, ততটা যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তাম।······আত্মনির্ভরতা নিয়ে আয়;—

(১) বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৪৬।

হৃদয়-কমল-মধ্যে, রাজিতং নির্ব্বিকল্পং,
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপং।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
বিমলপরমহংসং, রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ (১)॥

ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ রামকৃষ্ণাবতার স্তোত্রং" পাঠ করিলে বৈকুণ্ঠদর্শনের ভাব কথঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে। স্বামীজি-মহারাজ এই স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।—স্তোত্ররত্নাকর—শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।

ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর্,—তোর মনের ইচ্ছা তাঁকে জানা…তিনিই তোকে সাহস দেবেন। ঠাকুরের উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই ও দেখ্‌না কত কম বয়সে পৃথিবী জয় ক'রে এলাম।"

"কাম ক্রোধাদির দাস হ'লে জীবনে কখনও কি সুখ পাবি? সকল সময় মনে জোর আন্‌বি। এই দেখ্‌না এই Strength of mind (মনের জোর) ছিল বলেই কত কম বয়সে এখান থেকে এক পয়সাও না নিয়ে পায়ে হেঁটে কাশীতে গেছি। সেখান থেকে লক্ষ্নৌ, তার পর হরিদ্বার ও কেদারনাথ যাই। কেদারনাথে কত কষ্ট গেছে। চারিধারে বরফ। শৌচের জল রেখেছি, জমে বরফ হ'য়ে গেছে। সঙ্গে মাত্র একখানা কম্বল, একখানা কাপড় ও দু'টি কৌপীন। কেদারনাথে সাধুদের থাক্‌বার জন্য ছোট ছোট ঘর আছে। এসব ঘরের দরজা বৎসরের বেশী সময়েই বরফে ঢাকা থাকে। সেই শীতের রাত্রে এই বরফের চাঁই কেটে থাকবার বন্দোবস্ত কর্‌তে হলো। ঘরে ঢুকে দেখি চালা দিয়ে উপর থেকে বরফ গ'লে ঠাণ্ডা জল টুপ্-টাপ্ করে ভিতরে গড়িয়ে পড়্‌ছে। সঙ্গে মাত্র একখানা কম্বল,—তার উপর Mountain Sickness হলো। Mountain Sickness, Sea Sickness (সমুদ্র-পীড়া)-এরই মত। শুধু বমি হ'তে থাকে। মনে জোর আন্‌লুম; রাত্রে তিন বার বমির বেগ এল, কিন্তু একবারও বমি কর্‌লুম না। আমেরিকাতেও ঐরূপ করেছি। ইচ্ছা ক'রে অসুখ আনতুম্, আর মনে জোর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম। এখন দেখ্‌লি ত Strength of mind-এর (মনের জোরের) কত ক্ষমতা!"

শিষ্য কহিলেন—"সকলেই যদি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়, তবে কি ক'রে ভগবানের সৃষ্টি থাক্‌বে?"

গুরু-মহারাজ উত্তর দিলেন—"সৃষ্টি রাখ্‌বার জন্যই বোধ হয় তোর

জন্ম হয়েছে, এই তুই মনে কচ্ছিস্! তাঁর সৃষ্টি তিনিই তো দেখ্‌বেন। সৃষ্টির কর্ত্তাকে তুই জান্‌বার চেষ্টা কর। এই দেখ্‌না, লাখ্ লাখ্ সৌর-জগৎ যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর কি কখনো সৃষ্টি লোপ পেতে পারে। এই Solar System-এর (সৌরজগৎ) মত আরো কত লক্ষ লক্ষ Solar System আছে। এই Infinite Space (অনন্ত আকাশ)-এর মধ্যে তুই কতটুকু, আর তোর শক্তিই বা কতটকু যে, তাঁর সৃষ্টি নষ্ট কর্‌বি! 'একোঽহম্ বহু স্যাম্' ভাবে তিনি যেমন সৃষ্টির প্রথমে বহু হয়েছিলেন, সে রকম ভাবে তিনি অনন্ত কাল বহু হ'যে লীলা করবেন্।"

"আর এমন কথা তোকে কে বল্লে যে, আত্মজ্ঞানলাভ করতে হ'লে সংসার ছেড়ে বনে চলে যেতে হবে। পূর্ব্বকালে ঋষিরা স্ত্রী পুত্রাদি নিয়ে সংসার কর্‌তেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌ও লাভ কর্‌তেন। তবে সে ভাবে চলা বড় কঠিন। আজকালকার দিনে তা' একরূপ অসম্ভব। সেইজন্য ঠিক ঠিক জ্ঞান হবার পূর্ব্বে সংসার থেকে একটু দূরে থেকে সাধন-ভজন কর্‌তে হয়। আত্মজ্ঞান লাভ হ'লে সংসার করা চলে। ঠাকুর তাই আমাদের বল্‌তেন—"অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসী তা' কর্।"(১)

(৩)

কালীপ্রসাদ প্রথম জীবনে প্রায় সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গ লাভ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কলিকাতায় ভক্তদিগের গৃহে গিয়া নিজে উৎসবে মাতিতেন তখন সেই মত্ততা সংক্রামক হইয়া সেখানে যে আসিত তাহাকেই মাতাইয়া তুলিত। এই সকল পারিবারিক উৎসবসভায় কিরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের

(১) যেমন শুনিয়াছি—ব্রহ্মচারী সমুদ্ধচৈতন্য।

ভাব সমবেত জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিত, প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন:—"দেখ পরমহংস মশায় যখন রামদার (রামচন্দ্র দত্ত) বাড়ীতে আস্‌তেন, তাঁকে প্রথমে দেখ্‌তুম তো সাধারণ লোক। তার পর যখন সমাধিস্থ হ'তেন বা উচ্চভাবে চ'লে যেতেন, তখন দেখ্‌তুম্ যে, তাঁর দেহ থেকে যেন একটা আভা বা শক্তি বেরুচ্চে। সেই শক্তিটা যেন ঘরটাকে ভ'রে ফেল্লো! তার পরে সেই শক্তিটা দুয়ার জানালা দিয়ে বেরিয়ে, রাস্তাতে বেঞ্চি পেতে যাঁরা ব'সে থাক্‌তেন তাঁদের যেন স্পর্শ কর্‌তে লাগ্‌লো! বাইরের একটি শক্তি যেন তাঁদের স্পর্শ কর্‌ছে! প্রথমে প্রত্যেকেই সেটা প্রত্যাখ্যান কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন; কিন্তু সেই শক্তিটা ধীরে ধীরে চামড়া ভেদ ক'রে যেন ভিতরে ঢুক্‌ত! স্তরে স্তরে যে শক্তিটা ঢুকিতেছে তাহা বেশ টের পাওয়া যেত। অবশেষে সেই শক্তিটা সেই ব্যক্তিকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ত। এই অভিভূত ভাবটা প্রায় তিন দিন থাক্‌ত, যেন একটা ঘোর নেশাতে রয়েছে। একজন আর একজনের গায়েতে এই শক্তির আবরণটা বেশ স্পষ্ট অনুভব কর্‌ত।……আমি এই শক্তি আভা বা অপর যাহাই বল, অনেকবার অনুভব করেছিলাম।"(১)

কালীপ্রসাদ সেই সকল শক্তিতরঙ্গলীলার উৎসব-সভায় যোগদান করিতেন। "লীলা-প্রসঙ্গে" বা "কথামৃতে" এ বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইবার কোনও কারণ নাই। স্বামীজি-মহারাজের দেহান্তের পর তাঁহার স্বহস্তে লিখিত 'জীবন-চরিতের' একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় তিনি লিখিয়াছেন—

(১) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

"১৮৮৪ সাল হইতে যে সকল ঘটনা 'শ্রীম' লিখিত 'কথামৃতে' বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু যুবক ভক্তগণের মধ্যে আমি অল্পবয়স্ক থাকায় বোধ হয় মাষ্টার মহাশয় আমার নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, "শ্রীম"র জীবদ্দশায় সেজন্য আমি বহুবার তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'কথামৃতের' বহু সংস্করণ হইয়া গেলেও কিছু সংশোধনই তিনি করিয়া গেলেন না বা আজ পর্য্যন্ত তাহা হইল না।" (১)

নিয়ত এইরূপ দুর্জ্জয় দেবশক্তির আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহার শিষ্য-জীবন গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই উত্তরকালে তিনিও মহাশক্তিধর হইয়াছিলেন এবং কপর্দ্দকহীন ও বান্ধবহীন অবস্থায় অপরিচিতের মত মার্কিণে গমন করিয়া শেষে দেবোচিত সম্মান লাভ পূর্ব্বক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভারতের যে গৌরবপতাকা তিনি নিজের চরিত্র, জ্ঞান, প্রতিভা, বাগ্মিতা, সংগঠন-কৌশল ও প্রভুদত্ত শক্তির বলে মার্কিণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজিও তাহা সেই পূর্ব্ব গৌরবেই উড্ডীন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকগণ এখন মার্কিণে যাইয়া সেই পতাকাতলেই দণ্ডায়মান হইতেছেন! উহা ভিন্ন অন্য কোনও বিশিষ্ট পরিচয় আর তাঁহাদিগের নাই। (২)

(১) বিশ্বরূণী—ভাদ্র, ১৩৪৬।

(২) *Swami Vivekananda nominally formed a Vedanta Society (in New York) with Miss Phillips as its Secretary and Mr. Van Haagen, Miss Waldo and Mr. and Mrs. Good Year as its members.*...... on my arrival at New York I wrote a letter to Swami Vivekananda in which I requested him to write to his American friends to come forward and help me in my new field of work. In *reply Swami Vivekananda wrote* to me from Calcutta that I *must not depend on his friends, that I should stand on my own feet and struggle*, I was very much surprised at this advice but instead of being discouraged, I was inspired with grim determination to depend entirely upon the will of our Lord and to go no

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে গলার বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখা গেল "অধিক কথা কহিলে এবং সমাধিস্থ হইবার পরে" উহা বৃদ্ধি পাইতেছে। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন শ্রীশ্রীঠাকুর কাহারও নিষেধ না মানিয়া পাণিহাটিতে চিঁড়ার মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। "পঁচিশ জন ভক্ত দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া প্রাতে নয় ঘটিকার ভিতরে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল।" (১) শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ইহারা সকলেই পাণিহাটি যাত্রা করিলেন। সেই ভক্তদলের মধ্যে কালীপ্রসাদও ছিলেন একজন। (২) পাণিহাটিতে সেদিন প্রাণোন্মাদকারী সঙ্কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব নৃত্য করিয়া ঠাকুর শত সহস্র ব্যক্তিকে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন এবং কীর্ত্তনের দলগুলি সম্মিলিত হইয়া ঠাকুরকে দেখাইয়া দেখাইয়া গাহিতে লাগিল—

working with the resolute heart of a brave soldier neither thinking of the morrow nor of the results of my work.—*Leaves from my Diary*—Swami Abhedananda (published in the বিশ্ববাণী—চৈত্র, ১৩৪৫ during the life-time of His Holiness the Swamiji-Maharaj).

C. f.—Since the arrival of the Swami Abhedananda in New York on 6th August (1897), the interest in the Vedanta Philosophy *received a new impetus.* ......He created a respect for his teachings and enlisted such adherents as would not be convinced unless shown that Huxley, or Tyndal, or Spencer, or Kent agreed in substance with a particular view advanced by the Vedanta. ......The seeds sown by the Swami Vivekananda on the American soil *went on ever growing vigorously as days passed, striking their roots deep down into the heart of the nation.*

—The Life of Swami Vivekananda—How the movement went—I by His Eastern and Western Disciples, Vol. III (1915)—The Semi-centenary Birthday Memorial Edition.

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শাহচৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত।

"(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে"—ঠাকুরের ভক্ত ও সেবক কালীপ্রসাদও সেদিন অন্যের মতই সেই কীর্ত্তনরস-মদিরাপানে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমভক্তিবিহ্বল চিত্ত সেদিন যে বিশেষভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে এক জন ভক্তকে বলিয়াছিলেন—"আজ কেমন দেখ্‌লি বল্‌ দেখি। যেন হরিনামের হাট-বাজার বসিয়া গিয়াছে—না?"

পাণিহাটির মহোৎসবে যোগদান করিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অসুখ খুব বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তার উপদেশ দিলেন অধিক কথা যেন বলা না হয়। ঠাকুর একজন ভক্তকে দেখিয়াই বলিলেন—"তা ব'লে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়? এই ছ্যাখ্‌ দেখি—তুই কতদূর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা' কি হয়?" তিনি বাক্য-সংযম করিলেন না। কোনও ঈশ্বরীয় কথা হইলেই পূর্ব্ববৎ তাঁহার ভাব-সমাধি হইতে লাগিল। "শোকে তাপে মুহ্যমান জনগণ পথের সন্ধানে ও শান্তির প্রয়াসী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করুণাময় আত্মহারা হইয়া পূর্ব্বের মতই তাহাদিগকে উপদেশাদি দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।"

দক্ষিণেশ্বরে যখন চিকিৎসায় কোনও উপকার হইল না, তখন ভক্তদিগের অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্বিন মাসে কলিকাতা শ্যামপুকুরের বা[illegible] আসিলেন। কালীপ্রসাদও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। (১) শুধু সহযাত্রী হইয়া আসা নহে—তিনি সেইদিন হইতেই গৃহত্যাগ করিয়া

(১) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। স্বামীজি-মহারাজের জীবদ্দশায় তাঁহারই আশ্রম হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিলে তিনি অবশ্যই তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন।

ঠাকুরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন! সেই অহোরাত্র গুরুসেবার কথা "লীলাপ্রসঙ্গে" দেখা যায় না—শুধু এইটুকু দেখা যায়—"স্বামী অভেদানন্দের ন্যায় অনেকে আবার ইতিপূর্ব্বে দুই একবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিলেও এখানেই (শ্যামপুকুরে) ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।" (১) স্বামী সারদানন্দ মহারাজের এই উক্তি বিচারসহ নহে, কারণ শ্যামপুকুরে "কালী একান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে অহোরাত্র গুরুসেবায় ব্যস্ত হইলেন ও তদ্দর্শনে নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) বলিয়াছিলেন—'Kali is the personal Attachee to his Holiness Sree Ramkrishna Paramhansa' (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের খাস-ভৃত্যই কালী)। এই সময়ে শশী, শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), যোগেন, নরেন, রাখাল, বাবুরাম ও গোপাল-দাদা নিজ নিজ বাটীতে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন।" (২)

শ্যামপুকুরে তিন মাস অবস্থিতি করিবার পর কাশীপুরে মতিঝিলের সম্মুখে একটি বাগান-বাড়ীতে ঠাকুরকে আনা হইল। তখন তাঁহার ব্যাধি আরও বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। "Personal Attachee" বা খাস-ভৃত্য কালীর ত কথাই নাই, অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে "তখন শশী, যোগেন, লাটু, গোপাল, নিরঞ্জন ও শরৎ প্রভৃতি সেবকগণ প্রাণ ঢালিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা" করিতে লাগিলেন। (৩)

এই কাশীপুরের উদ্যানবাটিকায় কালীপ্রসাদ যে শুধু প্রাণপণে গুরুসেবাদ্বারা গুরুপূজা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে, অন্য কয়েকটি

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত।

(৩) স্বামী অভেদানন্দ – ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত।

অন্তরঙ্গ যুবকের ন্যায় তাঁহারও কঠোর তপস্যা আরম্ভ হইল। "ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া জপ-ধ্যান, কখনও বা কীর্ত্তন করা, কখনও বা সৎ চর্চ্চা, সৎ প্রসঙ্গ করা, কখনও বা হলঘরটিতে বসিয়া জপ করা, ধ্যান করা" (১) এইভাবে অন্যের ন্যায় কালীপ্রসাদেরও দিন কাটিতে লাগিল। এই সময়ে সেবাকার্য্যের অবকাশে তিনি পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত বৌদ্ধ-দর্শন ও বেদান্ত পাঠ এই কালেই আরম্ভ হয়। বহুবাজারে প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স এসোসিয়েসনে উপস্থিত হইয়া এই সময়েই কালীপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতাদিও শুনিতেন। (২) একদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে করিতে কালীপ্রসাদ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক মিলের ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। ঠাকুর কহিলেন—"কি বই পড়ছিস্।" কালীপ্রসাদ উত্তরে কহিলেন—"ইংরাজি ন্যায় শাস্ত্র।" ঠাকুর সহজে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওতে কি শিখায়?" উত্তর হইল—"ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্বন্ধে যুক্তি ও বিচার শিখায়।" তখন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"তুই-ই ত ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি।" (৩)

এ কথা সত্য যে, "ছেলেদের মধ্যে বই পড়া" কালীপ্রসাদই প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরেই অর্থাৎ বরাহনগরে মঠস্থাপনের অল্পদিন পরেই কালাপ্রসাদ তাঁহার দারুণ অধ্যয়ন-লিপ্সার জন্য গুরুভ্রাত কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া মঠ হইতে বিতাড়িত হইবার চক্রান্তে পতিত

(১) শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২) আত্মচরিত—Contemporary Indian Philosophy: Edited by S. Radhakrishnan D. Litt and J. H. Muirhead L. L. D. F. B. A.

(৩) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হইয়াছিলেন! "তখন নরেন্দ্র মঠে ছিলেন না। তারক ও নিরঞ্জন মঠে (বরাহনগর) তত্ত্বাবধান করিতেন।...একদিন শশী মহারাজ কালীকে গোপনে জানাইয়া দিলেন যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন হেতু তিনি জনৈক গুরুভ্রাতার বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে প্রহার দ্বারা মঠ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এক দুরভিসন্ধির আয়োজন চলিতেছে! কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, উক্ত গুরুভ্রাতার মতে মঠে শাস্ত্রাধ্যয়ন করা অন্যায়, যেহেতু পরমহংসদেব নিজে লেখা পড়া করিতেন না!" (১) এই ঘটনার পর নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া কালীপ্রসাদ বরাহনগর-মঠ ত্যাগ করিলেন এবং ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে জুনাগড়ে আসিলে একদিন পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বরাহনগর-মঠে দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া স্বামীজি মর্ম্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু সোদরপ্রতিম কালীপ্রসাদকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"তুমি রামকৃষ্ণের সন্তান, তোমাকে লইয়াই মঠ, তুমি মঠে না গেলে মঠ কাহার জন্য।"

যাহা হউক, কাশীপুর উদ্যানবাটিকায় অবস্থানকালে কালীপ্রসাদের জ্ঞান, প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং চরিত্রের তেজস্বিতা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিল। একদিন তিনি কালীপ্রসাদকে কহিলেন—"ছেলেদের মধ্যে তুই-ই বুদ্ধিমান্; নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেইরূপ তুই-ও পার্‌বি।" (২) আর একদিন রাত্রিতে কালীপ্রসাদ যখন ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঠাকুর বলিলেন "তোর ভ্রূ দুইটি, চোখ ও কপাল দেখে শ্রীকৃষ্ণের

(১) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(২) ঐ

মুখের উদ্দীপনা হয় ও আমার ভেতর রাধার ভাব জেগে উঠে কেন বল্ দেখি ?" কালীপ্রসাদ বলিলেন—"আপনিই জানেন, তাহা আমি কি বলিব।" পরমহংসদেব বলিলেন—'তোর ভিতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে, তা না হ'লে আমার এ ভাব হ'বে কেন ?' সেই রাত্রি হইতেই কালী-প্রসাদের ধর্ম্মজীবন এক নূতন রসের আস্বাদন পাইয়া পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। সে রস—সাধনার শেষ কথা—রামকৃষ্ণের প্রেম। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই অপূর্ব্বতত্ত্ব "উদঘাটন" করিয়া প্রালীপ্রসাদের চিত্তকে মণিমণ্ডিত করিয়া দিলেন।

প্রায় অনুরূপ সময়ে কালীপ্রসাদের পিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুত্রকে ভিক্ষা চাহিলেন! ঠাকুব মৃদুহাস্যে বলিলেন—"তোমার ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গে এসেছে ও আস্‌বে। আমি তাকে খেয়ে ফেলেছি। সে আর তোমার ছেলে নয়। সে আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ !" (১)

(৫)

কাশীপুরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের যে সেবা হইতেছিল তাহা মানুষ কর্ত্তৃক মানুষের সেবা নহে—তাহা ভক্তকর্ত্তৃক শ্রীভগবানের পূজা। এই পূজার দুইটি অঙ্গ ছিল—একটি ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা এবং আব একটি কঠোর তপস্যা। সে তপস্যার স্থান যেমন কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায় ছিল, তেমনি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলেও ছিল। নরেন্দ্রনাথ, তার[illegible]ও কালীপ্রসাদ কয়েকদিন ধরিয়া "প্রায় প্রত্যহ" দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। (২) কাশীপুরে তাপসবৃন্দের কঠোর

---

(১) স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামীজি-মহারাজের রচিত কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।

তপস্যার মূলমন্ত্র ছিল ভগবান্ তথাগতের প্রাণস্পর্শী বাণী—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। নবীন তাপসবৃন্দ তখন উদ্যানবাটিকার বড় হলঘরের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংস প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

কি ভীষণ পণ! মানবে উহা সম্ভবে না।—এই আসনে আমার দেহ শুষ্ক হইয়া যাক্! আমার ত্বক্, অস্থি, মাংস এইখানেই বিলীন হউক। দুর্লভ বোধি (জ্ঞান) যতদিন না লাভ হয় ততদিন এই আসন ছাড়িব না!

কাশীপুরের নবীন সন্ন্যাসিগণ এইরূপ পণ করিলেন। পণ করিলেন, প্রাণ যায় যাউক—ঈশ্বরলাভ করিতেই হইবে। বুদ্ধদেব ও তাঁহার সাধনপথ তাপসদিগকে অধিকার করিয়া লইলেন। অন্যান্য ভক্তগণ অপেক্ষা নরেন্দ্রনাথ এবং কালীপ্রসাদই বুদ্ধদেবের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ ছিলেন নরেন্দ্রনাথে ছায়া—একান্ত ভক্ত ও অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নরেন্দ্রনাথ যাহা বলিতেন, অগ্রজের আদেশ স্বরূপ কালীপ্রসাদ তাহাই পালন করিতেন—কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। সেই নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন—'চল্ কালী বুদ্ধগয়ায় গিয়া বুদ্ধদেবের তপস্যার স্থলে বসিয়া সাধনা করা যাক্'—অবিলম্বে কালীপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন গুরুভ্রাতা তারকনাথ।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের (কালীপ্রসাদ) মুখে শুনা গিয়াছে যে, "প্রথমে সমস্ত রাত্রি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের বাহিরে বোধিদ্রুমতলে, তৎপরে

অতি প্রত্যূষে মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির নিম্নে তাঁহারা একত্রে ধ্যান করিয়াছিলেন।" ধ্যানাবসানে নরেন্দ্র দেখিলেন, একটা জ্যোতিঃ (কোন শক্তি নয়) তারকনাথ ও কালীপ্রসাদের দিকে অগ্রসর হইয়া মিলাইয়া গেল! (১)

বুদ্ধগয়ায় যাইয়া নবেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ ও তারকনাথ মঠের মোহান্তের অতিথিস্বরূপ তিন চাবি দিন বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় তাহারা নিত্যই শুনিতেন, মধ্যাহ্নভোজনের পূর্ব্বে প্রসাদ পাইবাব জন্য মঠের সন্ন্যাসী-সাধুমগুলীকে এই বলিয়া আহ্বান করা হইত— "পঙ্গৎ কি হরিহর্ মহাপুরুখো," অর্থাৎ, হে মহাপুরুষগণ! পাতা

(১) এই ঘটনাটি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। (ক) "মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যানে" আছে—ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন তারকনাথের দেহমধ্যে একটি শক্তি প্রবিষ্ট হইল; নরেন্দ্র অমনি বার বার তারকনাথকে (স্বামী শিবানন্দ) প্রণাম করিতে লাগিলেন। তারকনাথ কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইলেও নরেন্দ্রনাথ প্রণাম করিতে বিরত হইলেন না! (অনুধ্যান—১১ পৃষ্ঠা)।

(খ) স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের কোনও উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মনীষী রোমা রোলাঁ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, স্বয়ং বুদ্ধদেবই বুদ্ধগয়ায় নরেন্দ্রনাথকে দেখা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন! (The Life of Vviekananda by M. Romain Rolland, P. 85).

(গ) মায়াবতী হইতে প্রকাশিত স্বামীজির জীবনচরিতে বুদ্ধপরিপ্রবেশের এই কাহিনীটি নাই। (Page 342, Vol. I) এই গ্রন্থে আছে—নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ রোদন করিয়া উঠিলেন এবং পার্শ্বে উপবিষ্ট তারকনাথকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন (প্রণাম নহে)। (ঘ) "স্বামী-শিষ্য সংবাদের" পূর্ব্বকাণ্ড—১৪২ পৃষ্ঠায় আছে যে, বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে করিতে দেখিয়াছিলেন যে, দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে একটি [illegible]াসী-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। বুদ্ধদেব দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিতেন না, সুতরাং এই সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের ছিল না। "কথামৃতের" তৃতীয় ভাগ—২৮৬ পৃষ্ঠায় বুদ্ধগয়া ভ্রমণের উল্লেখ আছে। কোনও জ্যোতিঃ বা শক্তি বা বুদ্ধদেব স্বয়ং নরেন্দ্রনাথের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে সে কাহিনী "কথামৃতে" থাকিবারই সম্ভাবনা ছিল। নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন—শুধু এইটুকুই "কথামৃতে" আছে। কথামৃত—তৃতীয় খণ্ড—২৮৬ পৃঃ।

পড়িয়াছে, আহার করিতে আসুন।' সেই আহ্বান শুনিয়া সকলে প্রসাদ পাইতে যাইতেন। বাঙ্গালার এই সাধকত্রয় বুদ্ধগয়ায় থাকা-কালে রহস্যচ্ছলে পরস্পরকে—"মহাপুরুখ্" বা 'মহাপুরুষ' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! সাধারণ ভাবে 'মহাপুরুষ' বলিলে সন্ন্যাসীও বুঝায়। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, স্বামী শিবানন্দ মহারাজের "মহাপুরুষ" আখ্যার ইহাই আদি কারণ।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের "লীলা-প্রসঙ্গ" কাশীপুর উদ্যানবাটিকায় সংঘটিত আর একটি ব্যাপারের সহিত শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনকাহিনীকে অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! বিষয়টি গুরুতর বলিয়া একটু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

"শিবরাত্রির দিন নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ) প্রভৃতি উপবাস ও রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক চারি প্রহরে শিবপূজা ও ধ্যান করিতেছিলেন। নরেন ও কালী পাশাপাশি বসিয়াই ধ্যান করিতে-ছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গিলে নরেন কালীকে বলিলেন, 'আমার শরীরে খুব জোরে একটা current (শক্তি প্রবাহ) চল্‌ছে। পরমহংসদেব যে শক্তি-সঞ্চার করেন তা' কি এই শক্তি? আমার হাতে হাত দিয়ে দেখ্‌ত।"

ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ ত দূরের কথা ইঙ্গিত মাত্রেও অপরের মধ্যে শক্তি সংক্রমিত করিতেন। যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ তখন নরেনের দক্ষিণ হস্তের কনুইয়ের নিকটে ও দক্ষিণ উরুতে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ন্যস্ত করিয়া অনুভব করিলেন যে, নরেনের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে। নরেন জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিছু feel (অনুভব) কচ্ছ কি? কালী বলিলেন—'হাঁ,

strong vibration (জোর কম্পন) feel (অনুভব) কচ্ছি।' সে সময়ে অপর কেহ নিকটে ছিল না।" (১)

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে তিনিও বলিয়াছিলেন—"ওই পর্য্যন্তই ঘটিয়াছিল।"

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের "লীলা-প্রসঙ্গে" আছে—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী শিবরাত্রিতে ব্রতোপবাস করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং আরও দুই একজন শিবপূজা ও জপ, ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "রাত্রি দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজি পূজার আসনে বসিয়াই" বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার অনুভূতি হইল যে স্পর্শমাত্রেই তিনি অন্যের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সংক্রমণ করিতে সক্ষম। অনুভূতিটি সত্য কি মিথ্যা অবিলম্বে তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য "সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন—'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক্ ত।'

স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিলেন। "দুই এক মিনিটকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন—"ব'স্ হয়েছে। কিরূপ অনুভব কর্‌লি?"

---

(১) এই সময়ে যে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শক্তিসংক্রমণের ক্ষমতা ছিল তাহার প্রমাণাভাব। তাঁহার জীবন চরিতে (Mayaboti Series, Vol I, P. 161) এইরূপ আছে—Noren was now sensing spiritual powers within him. He knew moments when he literally touched divinity······His thought became a sweeping power.

পরবর্ত্তী কালে নরেন্দ্রনাথ মঠ ত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিবার সময় বলিয়াছিলেন—I shall not return until I acquire such realisation that my very touch will transform a man.—The Life of Swami Vivekananda: Mayaboti: 1933—Vol. I. P. 231. সুতরাং কথিত শিবরাত্রির দিনে নরেন্দ্রনাথের শক্তিসংক্রমণ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

অভেদানন্দ কহিলেন—"ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্‌লে যেমন কি একটা ভেতরে আস্‌ছে জান্‌তে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হ'তে লাগ্‌লো।......হাত স্থির ক'রে রাখ্‌তে চেষ্টা করেও রাখ্‌তে পার্‌ছিলুম না।" (১)

ঘটনাটি ঠিক কতটুকু ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এই তথাকথিত শক্তিসংক্রমণের ফল স্বরূপ যাহা হইয়াছিল বলিয়া "লীলা প্রসঙ্গে" বর্ণিত হইয়াছে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একদিন তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন! "লীলা-প্রসঙ্গে" আছে—"পরে সকলে দুই-প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন।" [এইরূপ হইয়াছিল বলিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেন নাই।] এইরূপ গভীর ভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। তাহার সর্ব্ব শরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এক কালে লুপ্ত হইল। ["উপস্থিত সকলের"—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন, তৃতীয় ব্যক্তি কেহ উপস্থিত ছিল না।] "লীলা-প্রসঙ্গ" বলেন এক ব্যক্তি তামাকু সাজিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের জন্য আনিয়াছিল।]—'উপস্থিত সকলের মনে হইল, স্বামীজিকে ইতঃপূর্ব্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীজিও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইয়াছিলেন।" (২) [স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন যে, নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া তিনি কখনও গভীর ধ্যানে বিলুপ্ত-চৈতন্য হন নাই!]

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ।

(২) ঐ

শক্তিসংক্রমণের ফল এইখানেই শেষ হইল না। "লীলা-প্রসঙ্গ" পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ শক্তি-সঞ্চার করিয়া কালীপ্রসাদকে এইরূপই অধোগামী করিয়াছিলেন যে, "ফলে দেখা গেল, অভেদানন্দ যে ভাব-সহায়ে পূর্ব্বে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসব হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈত ভাব ঠিক্ ঠিক্ ধরা ও বুঝা কাল-সাপেক্ষ হওযায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচার বিবোধী অনুষ্ঠান সকল করিয়া ফেলিতে লাগিল (!)"

তাহার পর—"ঠাকুর তাহাকে (স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে) এখন হইতে অদ্বৈত-ভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্য্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অভেদানন্দের ঐ ভাব-প্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া ঠাকুরের শরীরত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল (!)" (১)

ইহার পর "লীলা-প্রসঙ্গে" আছে—এই ব্যাপারের জন্য ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকে তীব্র ভংর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"কি রে? একটু জম্‌তে না জম্‌তেই খরচ! আগে নিজের ভিতর ভাল ক'রে জম্‌তে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ কর্‌তে হবে তা' বুঝ্‌তে পার্‌বি। মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর (কালীপ্রসাদের) ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল্ দেখি! ও এতদিন একভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হ'য়ে গেল! ছ' মাস গর্ভ যেন নষ্ট হলো!" যা' হবার

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ—মায়াবতী সংস্করণের স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিতে (Vol. I. P. 161) আছে যে, নরেন্দ্রনাথ কালীপ্রসাদের ভিতর :—"A certain high consciousness of the Advaita Vedanta" প্রবিষ্ট করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহার ফল কি ধর্ম্মজীবনের তথাকথিত উচ্ছেদ? এই গ্রন্থের মুখবন্ধে আছে যে, উহা "লীলা-প্রসঙ্গের" অনুবর্ত্তী।

হয়েছে ; এখন হ'তে হঠাৎ অমনটা আর করিস্‌নি। যা' হোক্ ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।"(১)

স্বামী অভেদানন্দ-মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুব কোন দিনও তাঁহার সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথকে এরূপভাবে তিরস্কার করেন নাই। "কথামৃতে" কাশীপুরে শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপনের কোনও প্রসঙ্গ নাই এবং নরেন্দ্রনাথ যে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন তাহাও নাই। "লীলাপ্রসঙ্গে" লিখিত শিবরাত্রির ব্যাপার ১৮৮৬ সালের ফাল্গুন মাসে ঘটিয়াছিল। "কথামৃতে" দেখিতে পাই—১৮৮৬ সালের ১৬ই এপ্রিল নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদ একত্রে দক্ষিণেশ্বরে তপস্যা করিতে গিয়াছেন! শ্রীশ্রীঠাকুরেব ভৎর্সনা-বাক্য কালীপ্রসাদকে যথেষ্ট সতর্ক করিয়া দিবারই সম্ভাবনা ছিল! এমন অবস্থায় তিনি কি আবার সেই অনিষ্টকারী!) নরেন্দ্র-নাথের ছায়ার মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয়? তিনি ত তখন জানিয়াই গিয়াছেন যে, নরেন্দ্রনাথেব শক্তিসংক্রমণের ফলে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল সাধনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার জীবনও অধোগামী হইয়াছে—এতই অধোগামী যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও আর তাহা সংশোধন করিতে পাবিতেছেন না!

"লীলাপ্রসঙ্গে" এই কাহিনী বিবৃত থাকায় স্বদেশে এবং বিদেশে উহাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কারণ "লীলা-প্রসঙ্গ" ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণিক জীবন-চবিত এবং বঙ্গভাষায় রচিত একখানি রমণীয় ইতিবৃত্ত। এইরূপ মনে হয় যে, বিশেষরূপে যাচাই করিয়া না

(১) শ্রীশ্রীরা৲কৃষ্ণ কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চরিত্র "শীর্ষক অধ্যায়ে" শতাধিক চিত্রের মধ্যে কাশীপুরের অনেক বিবরণই স্থান পাইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক শক্তি সংক্রমণের ফলে কালীপ্রসাদের জীবনের ধারাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলে এমন একটি গুরুতর বৃত্তান্তের উল্লেখ "তারিখ চিত্রের" মধ্যে স্থান পাইবারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা নাই!—কথামৃত, পরিশিষ্ট ৩১-৩৯ পৃষ্ঠা ;

লইয়া কোন তৃতীয় ব্যক্তির কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাতেই এই অলীক বৃত্তান্ত স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের কলঙ্ককাহিনী-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বর্ত্তমান থাকিয়া গেল!

"লীলাপ্রসঙ্গ" যখন প্রকাশিত হয় তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় ছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যখন দেখিলেন কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ বিষয়ের সহিত ঐ পুস্তকে তাঁহাকে সম্পর্কিত করা হইয়াছে, তখন স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট পত্র লিখিয়া ভ্রম সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যদিও স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পত্রোত্তরে নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাব জীবনকালে বা পরেও ভ্রম সংশোধন করিবার সুযোগ ঘটে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যকে ভ্রমপ্রমাদ ও অতিরঞ্জন শূন্য করিবার দায়ীত্ব এখন বেলুড় মঠের ও উদ্বোধন-আফিসের। তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গে এত কথা লিখিতে হইল। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

উদ্বোধন আফিস
১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা
১৭—৮—২৫

প্রিয় অভেদানন্দ—

তোমার পত্র পাইলাম। **বই খুলিয়া দেখিলাম আমারই ভুল হইয়াছে।** আগামী সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া দিব। উদ্বোধনে

ছাপাইবার কথা লিখিয়াছ, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই 'উদ্বোধন' পড়িয়া থাকে! উদ্বোধনের গ্রাহক ছাড়া বাহিরের অনেক লোকই পুস্তক কিনিয়াছে ও কিনিবে। সুতরাং এ সংস্করণে যে ভুল রহিয়া গেল তাহার আর কোনও উপায় নাই। আমার ভালবাসা, প্রীতি সম্ভাষণাদি জানিবে। আশা করি তোমার শরীর ভালই আছে। আমি একরূপ ভাল আছি, কিন্তু গোলাপ-মার শরীর খুবই খারাপ। Heart-এর অসুখ। কখন্ যে কি হ'বে বলা যায় না। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীসারদানন্দ (১)

(৬)

চিকিৎসার জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কাশীপুরে আনিবার অল্পদিন পরই তিনি কালীপ্রসাদ প্রমুখ একাদশ জন ভক্ত সেবককে গৈরিকদান করিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ, গৈরিকধারী কালীপ্রসাদ ও নিরঞ্জনকে সম্পূর্ণরূপে নিরভিমান করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর অদেশ দিলেন—ভিক্ষা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ কর। তাঁহারা জয়গুরু বলিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন—পশ্চাতে পড়িয়া রহিল বিদ্যার গৌরব, বংশের মর্য্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা। প্রকাশ্যে প্রভাতে অন্ন-ভিক্ষা, মধ্যাহ্নে পাঠ এবং নিশীথে ধুনি জ্বালিয়া সাধন-ভজন, ইহা লইয়াই তখন এই নবীন সন্ন্যাসীর দল মাতিয়া উঠিলেন। "ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে তর্ক বিচারাদি

---

(১) স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ১৯২৭ সালে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাহার পাঁচ বৎসর পর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে উদ্বোধন আফিসের তত্ত্বাবধানে "লীলা-প্রসঙ্গের" সাধক-ভাব খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া ছিল। তাহাতেও দেখিয়াছি ভুলগুলি পূর্ব্বাবৎ আরক্তচক্ষে পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া আছে!

করিতে করিতে নাস্তিকের মত হইয়া পড়িলেন।” অনুমান হয় এই ব্যাপারের সহিত স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অনবধানে শক্তিসংক্রমণ উপন্যাসটি মিলাইয়া ফেলিয়াছেন!

অবিলম্বে এই সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাইয়া পৌছিল। তিনি একদিন কালীপ্রসাদকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—“হ্যারে, তুই নাকি নাস্তিক হ'য়ে গেলি? তুই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিস্?”

কালীপ্রসাদ বলিলেন—“না, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।”

“তুই বেদ মানিস্?”

“না।”

“শাস্ত্র মানিস্?”

“না।”

“লোকাচার মানিস্?”

“না”—

কালীপ্রসাদের উত্তর শুনিয়া ঠাকুব কহিলেন—“অপর কাউকে বল্‌লে গালে চড় মার্‌ত।”

নির্ভীক ও তেজস্বী কালীপ্রসাদ অমনি উত্তর দিলেন—“আপনিও মারুন।”

ঠাকুর কহিলেন—“দ্যাখ্, নরেন আগে কিছুই মান্‌ত না; এখন রাধা রাধা ব'লে কাঁদে ও কীর্ত্তন করে। এর পর তুইও সব মান্‌বি।”

কালীপ্রসাদ বলিলেন—“আমি অন্ধবিশ্বাস চাহি না। যতদিন ন. ঈশ্বর কি, বুঝিতে পারিতেছি, ততদিন কি করিয়া মানিব। আমাকে জানাইয়া দিন' তবে মানিব।”

শ্রীশ্রীঠাকুর দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—“তুই সব জান্‌বি—তুই এক ঘেয়ে হস্‌নি। আমি এক ঘেয়ে ভালবাসি না।”

ভগবান্ লাভের জন্য যিনি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন কালীপ্রসাদের হৃদয়ের তেজের ন্যায় তেজই তাঁহার প্রয়োজন। তেজস্বীর স্বভাবই এই যে, সে কোন-কিছুই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। স্বাধীন চিন্তা এবং যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিচাব করিয়া গ্রহণ বা বর্জ্জন—ইহাই সুদৃঢ় মানসিক বলে বলী ব্যক্তিদিগের বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য যেমন এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে বিশেষরূপে বিকশিত হইয়াছিল, (১) উহা তেমনি কাশীপুরে স্বামী অভেদানন্দের হৃদয়েও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। অদ্বৈতবাদ তখন কালীপ্রসাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, কাজেই বিচার না করিয়া কি লোকাচার, কি শাস্ত্র, কি বেদ—এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত তিনি কাহারও মুখের কথায় মানিতে প্রস্তুত হইলেন না! আমরা তাই শুনিতে পাই, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিতেছেন—"কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে হয়? আগে ভক্তি পাকুক।" (২) প্রহ্লাদ, শুক, সনকাদি জ্ঞানেব দ্বারায় ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥" আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়। (গীতা ৭।১৭)। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ গীতা—৭।১৯

বহু জন্মের পর জ্ঞানীভক্ত "বাসুদেবঃ সর্ববম্" এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু "স মহাত্মা সুদুর্ল্ভঃ।" শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একজন সেই সুদুর্ল্ভ মহাত্মা। যখন ভগবান্

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ২১১,২৪৩, ২৫১ পৃষ্ঠা।

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—তৃতীয় খণ্ড। ৩০৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন—"তুই পূর্ব্ব জন্মে এক বড় যোগী ছিলি, সিদ্ধিলাভ করিবার একটু বাকী ছিল, এই তোর শেষ জন্ম। আয় তোকে যোগসাধনের উপায় শিখাইয়া দিই।" (১) পরে স্বামী অভেদানন্দ যখন জ্ঞান-পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া ভগবান্‌কেও "গজ ফিতার" দ্বারা "মাপিবার" জন্য উন্মুখ হইয়াছেন—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"(কালে) তুই সব জান্‌বি।" প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহাই হইয়াছিল। জ্ঞান শেষে ভক্তির সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মজ্ঞান" দান করিলেন এবং স্বামী অভেদানন্দ "নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হইয়া অত্যদ্ভুত তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি" করিতে করিতে সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন—সিদ্ধিলাভ করিবার সামান্য যেটুকু এই জন্মের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। সেই দিন নাস্তিক্য-বুদ্ধির মৃত্যু ঘটিল—'সব জানিবার' আর তাঁহার কিছু বাকি রহিল না।

অল্পদিন পূর্ব্বেও যখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে বলিতে শুনিয়াছি—"ঠাকুরের কৃপায় আমি সব জেনেছি, সব দেখেছি, এখন তাঁর ডাকের প্রতীক্ষা কর্‌ছি।"

কাশীপুরের সুখের হাট ভাঙ্গিবার কাল ক্রমে সমাপাগত হইল। ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট নরেন্দ্রনাথের উপর "ছেলেদের' সকল

(১) আত্মজীবন রচিত—Contemporary Indian Philosophy, Edited by S. Radha Krishnan, D. Litt এবং J. H. Muirhed L. L. D., F. B. A.

যেমন শুনিয়াছি- ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য।

স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভার অর্পণ করিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্য রাত্রিতে মহাসমাধিমগ্ন হইলেন!

কালীপ্রসাদ, নরেন, রাখাল প্রভৃতি ভক্তগণ তখন গগন বিদীর্ণ করিয়া সমস্বরে ওঁকার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

* * * *

বরাহনগরের মহাশ্মশানে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব চিহ্ন ভস্মীভূত হইলে পর, ভস্মরক্ষার অধিকার লইয়া তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন, তারকাদি কয়েকজন সন্ন্যাসী-ভক্ত চিতাভস্মপূর্ণ কলসীটি অধিকার করিয়া রহিলেন, কিছুতেই ছাড়িবেন না—এদিকে রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ গৃহী ভক্তগণ উহা কাঁকুড়গাছিতে (শ্রীযোগোদ্যানে) লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন! সকল বিরোধ মিটাইবার জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসুলভ উৎসাহের সহিত কহিলেন—"এসো আমরা নিজ নিজ হৃদয়ে ঠাকুরের সমাধি দিই—এসো সকলে আজ তাঁহার জীবন্ত সমাধি হই!" তৎক্ষণাৎ হামান্‌দিস্তায় কিঞ্চিৎ অস্থি চূর্ণ করিয়া সন্ন্যাসিগণ 'জয়গুরু জয়গুরু' বলিতে বলিতে ভক্তিভরে গিলিয়া ফেলিলেন! মূর্ত্তিমন্ত গুরুভক্তি শশী কিঞ্চিৎ অস্থি গোপনে একটি [illegible] রক্ষা করিলেন। ঠাকুরের মহাসমাধিলাভের অষ্টাহ পর কলিকাতা কাঁকুড়গাছি শ্রীযোগোদ্যানে অস্থিপূর্ণ বৃহৎ কলস বিশেষ অনুষ্ঠানের পর সমাহিত হইয়া গেল। অস্থিপূর্ণ কৌটাটি শেষে বেলুড় মঠে স্থান পাইয়াছে।

* * * *

ঠাকুর নাই—যাঁহাকে ঘিরিয়া সকল আনন্দ, সকল উৎসব, নিত্য মুখরিত হইয়া উঠিত—সকল সম্পদের সম্পদ্ যিনি, সকল আশার আশা যিনি, সকল সৌভাগ্যের সুখ যিনি, তিনি যখন চক্ষুর অন্তরাল হইলেন

তখন কয়েকজন সন্ন্যাসিভক্তদিগের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য আসিয়া দেখা দিল। তাঁহাবা মঠ স্থাপনপূর্ব্বক তথায় থাকিবাব সঙ্কল্প করিলেন, কেহ কেহ বা স্বগৃহে ফিবিয়া গিয়া পাঠে মন দিলেন। কালীপ্রসাদ আব সংসারে ফিরিলেন না—সংসার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন সত্য সত্যই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্ব্বং ন সংসৃতিঃ।
অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাত ব্রহ্মভাবো বহির্ম্মুখঃ।

—বিবেকচূড়ামণি, ৪৪৪

যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আব পূর্ব্ববৎ সংসাব সংঘটন হয় না; যদি হয়, তবে জানিতে হইবে, তিনি সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হন নাই এবং তাঁহার নির্ব্বিশেষ তন্ময়তাও জন্মে নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদা দেবীকে লইয়া সন্ন্যাসী কালীপ্রসাদ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা কবিলেন—তাঁহাব সঙ্গী হইলেন তুই সন্ন্যাসী—যোগেন মহারাজ ও লাটু মহারাজ। এদিকে "হরি, শশী, সাবদা, সুবোধ এবং শরৎ" স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে ন। নরেন্দ্র-নাথের বসত-বাটী লইয়া তখন যে মোকদ্দমা চলিতেছিল তাহাবই তত্ত্বাবধানেব জন্য তাঁহাকে গৃহে যাইতে হইল।

বৃন্দাবনে যাইয়া কৌপীন ও কমণ্ডলু সম্বল করিয়া কালীপ্রসাদ একাকী ৮৪ ক্রোশ বন পবিক্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন এবং "মাধুকবী করতঃ······প্রায় একুশ দিন পর" বৃন্দাবনে ফিবিয়া আসিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, বরাহনগরের "মুন্সীদের একটা পোড়ো বাড়ী"তে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ স্থাপিত হইয়াছে তখন সেই মঠে আসিয়া গুরু-ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তিনি বৃন্দাবনে কালবিলম্ব না করিয়া বরাহনগর-মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির প্রায় ৪ মাস পর কালীপ্রসাদ এবং যুবক ভক্তগণ আঁটপুরে বাবুরাম- জননীর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে যে কয়দিন ছিলেন, কৌপীন ধারণপূর্ব্বক ধুনি জ্বালিয়া, ভস্ম মাখিয়া প্রত্যহ তাঁহারা ধ্যান জপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের আহ্বানে শেষে একে একে সকল অন্তরঙ্গ ভক্তই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন এবং বৈদিক বিধানানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সেই দিন জাহ্নবী-তীরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির স্থাপিত হইয়া গেল। শ্রীগুরুর পাদুকা সম্মুখে রাখিয়া সেদিন কালীপ্রসাদ বিধিমতে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরজা হোমের তন্ত্র-ধারক হইয়াছিলেন। যজ্ঞকালে সকলে সম্মিলিত হইয়া যখন হোমকুণ্ডে শিখাসূত্র আহুতি দিতে লগিলেন এবং জাহ্নবী-তীরে দণ্ড ভাসাইয়া পরমহংস হইলেন, বলিতে গেলে সেইদিনই—'যত মত তত পথে'র বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রথমে উড্ডীন হইয়াছিল। ভক্ত সন্ন্যাসিগণ পরে জীবন পণ করিয়া সেই মন্ত্র দিকে দিকে, দেশে দেশে—সমুদ্র হইতে সমুদ্র পারে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই হোমকুণ্ডের পবিত্র অগ্নিশিখা সেদিন অক্ষয় স্বর্ণসূত্রের মত সন্ন্যাসী ভ্রাতাদিগকে এমন দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত করিয়াছিল যে, একাদশটি সুর সেদিন এক তারে বাজিয়াছিল, একাদশটি প্রাণ এক প্রাণ হইয়াছিল, একাদশটি মন এক মন হইয়াছিল, একাদশ জনের সঙ্কল্প সেদিন এক সঙ্কল্প হইয়াছিল—লোকগঠন ও শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন। যজ্ঞান্তে সন্ন্যাসিগণ যে যাহার ভাব অনুযায়ী নাম গ্রহণ করিলেন। অভেদ মন্ত্রে দীক্ষিত কালীপ্রসাদের তখন নাম হইল অভেদানন্দ। সেই নামেই তিনি আজ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সম্পূজিত হইতেছেন। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর সহস্রদল ঝাড়ের

আলোকে সমুজ্জ্বল পূজার মণ্ডপে যেমন ঘৃতের একটি মাত্র প্রদীপই শুধু জ্বলে, আর সব নিবিয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরেরও এতদিন সেই অবস্থাই হইয়াছিল—একটি মাত্র ঘৃতের প্রদীপ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এতদিন প্রজ্বলিত ছিলেন—আর সব পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল! এই সেদিন সেই শেষ প্রদীপটিও নিবিয়া গেল! এখন সবই অন্ধকার!

(৭)

আহার, নিদ্রা ও সর্ব্বপ্রকার দেহসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরমহংস অভেদানন্দ বরাহনগর মঠে তীব্র তপস্যায় রত হইলেন। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রকিরণে অগ্নিবৎ তপ্ত মঠের বারান্দায় "সঞ্চিত ধূলিরাশির উপর" পতিত হইয়া একদিন তিনি ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গেলেন। একজন গৃহীভক্ত সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেহে হস্তার্পণ পূর্ব্বক দেখিলেন, দেহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত এবং একেবারেই নিস্পন্দ! তিনি ভীতচিত্তে ছুটিয়া গিয়া মঠবাসী স্বামী যোগানন্দকে জানাইলেন—কালী তপস্বী মরিয়া গিয়াছে! সকলেই স্বামী অভেদানন্দের উগ্র তপস্যার কথা জানিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "কালী তপস্বী।" স্বামী যোগানন্দ হাসিয়া কহিলেন—"ও কি মরে! ও শালা অমনি করেই ধ্যান করে।"

মঠের যে কক্ষে স্বামী অভেদানন্দ থাকিতেন তাহার নাম ছিল 'কালী তপস্বীর ঘর।' তিনি ঘোর অদ্বৈত বেদান্তবাদী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে 'কালী বেদান্তী'ও বলিত। "তিনি ঐ ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবারাত্র জপ, ধ্যান, উপনিষদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

স্তোত্র রচনা করিতেন।" (১) এইখানেই শ্রীশ্রীমার স্তোত্র রচিত হইয়াছিল—

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাং।
শরণাগত-সেবক-তোষকরীং,
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥
(ইত্যাদি)

ভাবের মাহাত্ম্যে, ছন্দের লালিত্যে, ভক্ত হৃদয়ের আত্মনিবেদনের সারল্যে এবং ভগবৎ-কৃপা প্রার্থনা ও কারুণ্যে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র রত্নাকর" সত্য সত্যই রত্নের আকর এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্।

স্তোত্র শুনিয়া শ্রীশ্রীমা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিয়াছিলেন—তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।" কিছুদিন মঠে বাস করিবার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছয় মাস কাল পুরীধামে অবস্থান পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে কোনও বৈষ্ণব-সাধু-মহাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত একটি নির্জ্জন গোফায় তপস্যা করিয়াছিলেন। পরবৎসর শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি ভারতের তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পণ করিলেন— "টাকা পয়সা ছুঁইবেন না, রন্ধন করিবেন না, জুতা বা জামা ব্যবহার করিবেন না, কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না, মধ্যাহ্নে তিন বাড়ী অথবা পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগৃহীত হইবে তাহাই একবার আহার করিবেন এবং যেখানেই অন্ধকার হইবে, সেইখানেই পথিমধ্যে কিংবা বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিবেন।" (২)

(১) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(২) ঐ

এইরূপ দুর্জ্জয় পণ প্রতিদিন রক্ষা করিয়া স্বামীজি-মহারাজ অকুতোভয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুর্গম পথ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না, কত কানন প্রান্তর ও গিরি-গুহা তাঁহার আশ্রয়স্থল হইল—হিমালয়ের উন্নত বক্ষে বিরাজিত কেদারনাথের তুষার তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিল না। সেইখানে চতুর্দ্দশ সহস্র ফিট উচ্চে অবস্থিত একটি তুষারসমাচ্ছন্ন গুহায় তিনি একখানি মাত্র কম্বল পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দুষ্কর তপস্যায় কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন এবং পরে আরও দুর্গম গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী দর্শন করিয়া যমুনার তীরে তীরে হাঁটিতে হাঁটিতে দেরাদুন হইয়া হৃষিকেশে আসিলেন। হৃষিকেশে এক ঘাসের ঝুপ্‌ড়িতে বাস করিয়া তপস্যা করিবার কালে অদ্বিতীয় ষড়দর্শনবিৎ বেদান্তী সাধু ধনরাজ গিরির সহিত স্বামী অভেদানন্দের পরিচয় হইল। অধ্যয়নস্পৃহা এই দুর্গম পর্ব্বতগুহাতেও তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। তিনি ধনরাজ গিরি মহারাজের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রব্রজ্যায় বাহির হইয়া যখন স্বামী বিবেকানন্দ সেইখানে আসিয়াছিলেন তখন ধনরাজ গিরি মহারাজ তাঁহাকে পুলকিত হৃদয়ে শিষ্য অভেদানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"অভেদানন্দ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা!" অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধির শেষ সোপান অতিক্রম করিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এইখানেই বিষ্ঠা ও চন্দন লইয়া সাধন করিতেন। বাক্‌সিদ্ধি ঘটিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য একদিন মনে মনে বলিলেন—"আমার দেহ কঠিন রোগাক্রান্ত হউক।" তিন দিবস যাইতে না যাইতেই তিনি কঠিন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইলেন! পরে ক্রমে সুস্থ হইয়া তিনি এলাহাবাদের সন্নিকটে ঝুসিতে আসিয়া 'রাজযোগ' সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। এইখানেই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ভোজ্যদ্রব্য পাইয়া তিনি বুঝিলেন—"তেষাং

নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্” (গীতা—৯।২২) ভগবানের এই বাক্যটি ধ্রুব সত্য—সত্যসত্যই ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ নিজেই বহন করিয়া থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ অনেকবার এই মহাবাক্যের সত্যতার পরিচয় পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এইভাবে আরও নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। আবার সেখানে সাধন, ভজন ও শাস্ত্রালোচনায় দিন কাটিতে লাগিল। এত অধ্যয়ন স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ভাল লাগিল না! তখনকার অপরিণতবুদ্ধিবশতঃ তিনি মনে করিলেন—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গ্রন্থপাঠে অনুরাগী ছিলেন না, তখন তাঁহারই মঠে বসিয়া এত অধ্যয়ন করা, তাঁহার অনুশাসনকে অবজ্ঞা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিক অধ্যয়ন করিবার অপরাধে মঠে স্বামী অভেদানন্দের বিরুদ্ধে একটি প্রবল ষড়যন্ত্র জন্মলাভ করিল! তিনি শুনিলেন তাঁহাকে প্রহার করিয়া মঠের বাহির করিয়া দেওয়া হইবে! (১) তিনি প্রহারের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া নিজেই মঠ ত্যাগ করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পণ করিলেন বরাহনগর মঠে আর আসিবেন না। কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা হইয়া চিত্রকূট, সরযূ—তথা হইতে জয়পুর, খেতড়ি, আবু ও গির্ণার দর্শন করিয়া নর্ম্মদাতীরে জুনাগড়ে আসিয়া দেখিলেন পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে নবাব সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী বৈদান্তিক মনসুখরাম-সূর্য্যরাম ত্রিপাঠির সহিত বেদান্তের বিচার করিতেছেন।

বহুকাল পরে অপ্রত্যাশিতভাবে দুই গুরুভ্রাতায় সম্মিলন ঘটিল।

(১) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দ পরম পুলকে স্বামী অভেদানন্দকে বাহুবেষ্টনে ধবিলেন এবং যখন মঠের দুর্ব্যবহারেব কথা শুনিলেন তখন তাঁহাব উজ্জ্বল নয়ন দুইটি সিক্ত হইয়া উঠিল। যাহা হউক, জুনাগড়ে পণ্ডিতজীব সহিত স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত-বিচাব আবম্ভ হইল। উভয়েই ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত—উভয়েই সংস্কৃতে আলোচনা কবিতে লাগিলেন। শেষে জুনাগড় হইতে দ্বাবকা এবং প্রভাস—প্রভাস হইতে বোম্বাই এবং তথা হইতে পুণা, বরোদা, নাসিক, দণ্ডকাবণ্য প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ কবিয়া, গোদাবরী ও কাবেরীব পুণ্যসলিলে পবিস্নাত হইয়া স্বামিজী-মহাবাজ রামেশ্বর সেতুবন্ধে আসিয়া উপনীত হইলেন। ধনুষ্কোটীতে সমুদ্রসঙ্গমে স্নান করিয়া তিনি তাঞ্জোব, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুবা, কাঞ্চী ও কুম্ভকোনম্ প্রভৃভি পুণ্যতীর্থ দর্শন করিতে কবিতে দীর্ঘকাল পব মঠে ফিবিয়া আসিলেন। পণ করিয়াছিলেন, বরাহনগব মঠে আব আসিবেন না। কার্য্যেও তাহাই হইল। দেখিলেন, মঠ তখন বরাহনগব হইতে আলমবাজাবে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আলমবাজার-মঠে আসিয়া স্বামীজি-মহাবাজ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গুরুভ্রাতাদিগেব ঐকান্তিক শুশ্রূষায় তিন মাস পরে আবার চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেন। ববাহনগবের মঠ ছিল লোকচক্ষুতে একটি নূতন বকমেব প্রতিষ্ঠান। লোকে তাই উহাকে গ্রহণ না করিয়া তখন ব্যঙ্গ কবিত! প্রতিবেশী বালকগণ এই মঠের আত্মভোলা সন্ন্যাসিদিগকে দেখিলেই করতালি দিয়া বলিত—

আগে চলে রাজহংস
পাতিহংস কালিহংস
ঝুলিতে পরমহংস
প্যাক্ প্যাক্ প্যাক্!

কিন্তু মঠ যখন আলমবাজারে গেল তখন "সাধারণ লোকের ভিতরেও মঠের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব" আসিয়াছিল।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বিচিত্র জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছিল দক্ষিণেশ্বরে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায়। এই আলমবাজার-মঠে দেবজীবনের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া গেল! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দ্বারা যে মহৎকার্য্য সম্পন্ন করাইবেন বলিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে গঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ অধ্যয়নলিপ্সাকে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাকে অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন—আমরা এখন স্বামীজি-মহারাজের জীবনের সেই চতুর্থ অধ্যায়ের সমীপবর্ত্তী হইতেছি। এতদিন ছিলেন তিনি ছাত্র, শিষ্য, ভক্ত, ব্রহ্মবিৎ সাধক ও পর্য্যটক—এখন তিনি লোকগুরু হইলেন।

(৮)

"১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন এবং বোম্বাই হইতে জাপান দিয়া আমেরিকার ভ্যান্‌কুভারে যান। তথা হইতে চিকাগো শহরে উপস্থিত হন।" তাঁহার যাত্রার কথা অল্পসংখ্যক লোকেই জানিতেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে কলিকাতার সংবাদপত্রে তাঁহার গৌরবমণ্ডিত সাফল্যের বিষয় প্রকাশ পাইল—সকলেই শুনিল যে, চিকাগোর ধর্ম্মমহাসম্মেলনে একজন স্বামীজি ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! অল্পদিন পরেই লোকে জানিতে পাইল এই পাশ্চাত্যজগৎ-বিজয়ী বাঙ্গালী স্বামী বিবেকানন্দটি কে। "এই সময় কলিকাতায় ও বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে স্বামীজির কথাবার্ত্তা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা হইতে লাগিল! নানা স্থানে সভা, অভিনন্দন ও বক্তৃতা ইত্যাদি হইতে লাগিল। বাঙ্গালা

দেশটা একেবারে গরম হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু জাতি নিজেদের বিজয় হইয়াছে এই জ্ঞানে পরস্পরে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। হিন্দু জাতির নব জাগরণ ও নব অভ্যুত্থান বিশেষভাবে এই সময় হইতেই হইল।······সমগ্র হিন্দু জাতি যে পাশ্চাত্য জাতির উপর বিজয় লাভ করিয়াছে এই চর্চ্চা চলিতে লাগিল।"

"যেমন একদিকে বহু লোক স্বামীজির পক্ষ অবলম্বন করিলেন, অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজ ও খৃষ্টান সমাজ বিপরীত মত অবলম্বন করিলেন এবং স্বামীজির কুৎসা করিতে লাগিলেন। (১) এই সময় শরৎ মহারাজ, কালী-বেদান্তী, সান্ন্যাল মহাশয় (শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল) এই তিনজন বিশেষভাবে অগ্রণী হইয়া স্বামীজির জন্য নানা স্থানে সভা, অভিনন্দন ইত্যাদি করাইতে লাগিলেন।" (২)

"কালী বেদান্তী প্রাণপণে এই সময় খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউন-হলে সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্য্য-প্রণালী মুদ্রিত করা এবং সেই সভার রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে ও আমেরিকায় পাঠান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তিনি সাধনার মত করিয়াছিলেন।" (৩)

---

(১) শুনিয়াছি, এই সময়ে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ প্রথমে খিওসফিষ্টদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। "মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান" নামক পুস্তকের ১৪০ পৃষ্ঠা[illegible] দেখিতে পাই—"ক্রমে ক্রমে মঠের সকলেই শরৎ মহারাজ, কালী বেদান্তী ও সান্ন্যাল মহাশয়ের পন্থার অনুগামী হইলেন এবং অল্পমাত্র যে অপ্রিয় কার্য্য হইয়াছিল তাহাও তিরোহিত হইল।" এই "অল্পমাত্র অপ্রিয় কার্য্যটি" কি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধমত গ্রহণপূর্ব্বক থিওসফিষ্টদিগের সহিত মিলন?

(২) মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত।

(৩) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে জানিতে হয় যে, সে সময় ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং খৃষ্টান পাদ্রীগণ ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত হইয়া আমেরিকায় প্রচার করিতেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি নহেন এবং "তাঁহার ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নহে।" সুতরাং তখন পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল। সে দিন স্বামীজি প্রতিষ্ঠা না পাইলে, আজ কি আমেরিকার অঞ্জলি অর্ঘ্য বেলুড়মঠে অর্পিত হইতে পারিত? স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ জীবন পণ করিয়া তাঁহার অগ্রজতুল্য গুরুভ্রাতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেদিন বাঙ্গালার মনীষীবর্গের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন এবং বলিতে গেলে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতার টাউন-হলে রাজা প্যারী-মোহনের নেতৃত্বে একটি বিরাট সভা বসিয়াছিল এবং সভার মন্তব্য অবিলম্বে তার-যোগে আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল। একথা এখন বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, তখন পর্য্যন্ত স্বামীজি ছিলেন স্বদেশে অপরিচিত এবং বিদেশে ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত কলঙ্কের কালিতে অনুলিপ্ত!

'রমতা সাধু এবং বহতা জল' কখনও মলিন হয় না—তাই স্বামী অভেদানন্দের জীবন পৃথ্বীপর্য্যটকের পুণ্যময় জীবন। সুযোগ পাইবামাত্র তিনি পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন এবং তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

সুদীর্ঘ পর্য্যটনের পর প্রয়োজনানুরূপ বিশ্রামেরও অবকাশ হইল না, লণ্ডন হইতে স্বামীজির আদেশ আসিল—'এখানকার কাজের জন্য কালীকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দাও।' শুধু আহ্বানও নহে, সঙ্গে সঙ্গে পাথেয়ও আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বামী অভেদানন্দ জানিতেন তিনি মাত্র এনট্রান্স-পাশকরা যুবক।

সংস্কৃতই না হয় শিক্ষা করিয়াছেন—ইংরাজীতে আর কতটুকু অধিকার তাঁহার! সেই সামান্য ইংরাজী বিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া নিরামিষ-ভোজী সন্ন্যাসী কোন্ সাহসে সাহেবদিগের দেশে যাইয়া সাহেবদিগের মধ্যে সাহেবদিগের ভাষায় প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইবেন! স্বামী অভেদানন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন—কাঁদিয়া ফেলিলেন—বিলাত যাইতে অসম্মত হইলেন। (১) গুরু-ভ্রাতাগণ জেদ করিয়া ধরিয়া বসিলেন—স্বামীজির আদেশ, সুতরাং যাইতেই হইবে। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া কলিকাতার আউটরাম ঘাটে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে স্বামী অভেদানন্দকে তুলিয়া দিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন।

পরদিন জাহাজ ছাড়িবে। অপরিচিত যাত্রীদিগের মধ্যে থাকিতে থাকিতে রাত্রিতে স্বামী অভেদানন্দের মন এমনই অস্থির হইয়া উঠিল যে, তিনি জাহাজ ত্যাগ করিয়া বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। দুর্গম কানন, দুস্তর প্রান্তর—হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ—ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত অফুরন্ত সুদীর্ঘ পথ—ঘাসের ঝুপ্ড়ি, বালুময় গোফা কোনও কিছুতেই যাঁহার হৃদয়কে মুহূর্ত্তের জন্য দমাইতে পারে নাই—ইংলণ্ডের বিভীষিকা তাঁহাকে কাঁদাইয়া ফেলিল! যাহা হউক, শেষে গুরু-ভ্রাতাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালার এই প্রৌঢ় সন্ন্যাসী আবার জাহাজে যাইয়া উঠিলেন এবং তদ্‌গতচিত্তে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

উপযুক্ত সময়ে জাহাজ ছাড়িল—এডেনে আসিতেই ভীষণ ঝড়ের আক্রমণে জাহাজ কাঁপিতে লাগিল, সাগর নাচিতে লাগিল। স্বামী

(১) বঙ্গবাণী—বৈশাখ ১৩৩৫।

অভেদানন্দ সমুদ্রপীড়ায় কাতর হইয়া শয্যা লইলেন। পাঁচ সপ্তাহ পরে যখন জাহাজ যাইয়া লণ্ডনের বন্দরে লাগিল—স্বামীজি-মহারাজ দেখিলেন, তাহাকে জাহাজ হইতে লইয়া যাইবার জন্য কেহই আসেন নাই! যাহা হউক, অকস্মাৎ সেখানে একটি বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি শুনিলেন, মিষ্টার ডব্‌লিউ সি ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ীতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে!

স্বামীজি-মহারাজের মনে হইল যে অকূলে কূল পাইলেন!

* * * * *

লণ্ডনে একমাস কাটিয়া গেল! স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এই নবাগত গুরুভ্রাতাকে নানা বন্ধুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন এবং সহসা একদিন একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হাতে দিয়া বলিলেন—"কালী, খৃষ্টথিওসফিক্যাল সোসাইটীতে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে।"

স্বামীজি-মহারাজ কহিলেন—বক্তৃতা! অসম্ভব! আমি কিছুতেই পারব না।

স্বামীজি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—তা' হবে না, পারতেই হবে। এমনি ক'রে তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া শিখ্‌তে হবে!

স্বামীজি-মহারাজ কাতর হইয়া বলিলেন-তুমি কি আমাকে এমনি ক'রে অপদস্থ করতে চাও?

স্বামীজি যখন কোন আপত্তিই শুনিলেন না, তখন অভেদানন্দ হতাশ হইয়া কহিলেন—কেমন ক'রে আরম্ভ করতে হ'বে, কেমন ক'রে শেষ করতে হ'বে বলে দাও তবে।

স্বামীজি বলিলেন—প্রাণে ভাব এলেই মুখে তা' ফুটে উঠ্‌বে।

স্বামী অভেদানন্দ তখন পঞ্চদশীর বেদান্ত অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করিলেন। কহিলেন—নরেন, আমি পড়ি, তুমি একটু শোনো।

নরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—এখন শুন্‌বো কেন? সভায় শুন্‌বো!"

স্বামীজি-মহারাজ দেখিলেন—সে পাষাণে কর্দ্দমের লেশমাত্রও নাই! তিনি একরূপ মরিয়া হইয়া উঠিলেন এবং স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী সভাগৃহ পরিপূর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন!

মনে মনে 'জয়গুরু জয়গুরু' বলিতে বলিতে স্বামীজি মহারাজ বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কোথায় পড়িয়া রহিল তাঁহার সেই লিখিত অভিভাষণ—তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। হৃদয় যখন ভাবে পূর্ণ থাকে তখন সত্যসত্যই বাক্যের অভাব হয় না। তিনি অনর্গল বলিতে লাগিলেন—তাঁহার মুখ দিয়া যেন হিমালয়শৃঙ্গ হইতে বর্ষার প্রস্রবণ নামিতে লাগিল। দণ্ডে দণ্ডে বেদান্তের গূঢ় তত্ত্বগুলি সরল, সহজ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল! বক্তৃতা শুনিয়া স্বামীজির আনন্দ আর ধরে না। তিনি কহিলেন—'এখন যদি আমি মরি তাহাতে আর দুঃখ নাই। আমার বাণী তোমার মুখ দিয়াই প্রচারিত হইবে এবং বিশ্ব উৎসুক হইয়া তাহা শুনিবে'। (১) কাপ্তান সেভিয়ার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিলেন—"স্বামী অভেদানন্দ দেখ্‌ছি আজন্মই প্রচারক! তিনি যেখানেই যাবেন, তাঁর জয় সুনিশ্চিত।"

এতদিন যে নিঃসহায় সন্ন্যাসীটি অভেদানন্দ মহারাজের হৃদয়মধ্যে ধ্যানান্তামত নয়নে সমাধিমগ্ন ছিলেন, পাশ্চাত্যে কর্ম্মের আহ্বানে তিনি সেই সভাগৃহে সাহসা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন এবং সিংহবিক্রমে প্রার্থনা

(১) Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it—স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কারলেন—হে ওজঃস্বরূপ আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্য্যস্বরূপ আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর, হে বলস্বরূপ আমাদিগকে বলবান্ কর! ওজো দেহি মে, বীর্য্যং দেহি মে, তেজো দেহি মে।

লণ্ডনে অবস্থানকালে স্বামীজি-মহারাজের সহিত ভুবনবিখ্যাত আচার্য্য মোক্ষমূলর, পল্ ডুয়োসন্ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আলাপ পরিচয় ও নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

স্বামী-অভেদানন্দেব উপব লণ্ডনে প্রচারকার্য্যের সম্পূর্ণ ভাব অর্পণ কবিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিন্তমনে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তম করিলেন। লণ্ডনে যখন সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচারিত হইতেছিল তখন "স্বামী বিবেকানন্দের আদেশ মস্তকে ধাবণ করিয়া" স্বামীজি-মহারাজকে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় আমেরিকায় যাইতে হইল। নিউইয়র্কে নামে মাত্র যে বেদান্তসমিতি ছিল তাহার তখন অত্যন্ত শৈশব ও দুর্ব্বল অবস্থা। স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে শিষ্যমণ্ডলী দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেব মধ্যে অনেকেই তখন বেদান্ত ত্যাগ করিয়াছেন! (১) সামান্য যে কয়েকজন তখনও অনুরাগী ছিলেন স্বামীজি-মহারাজ শুধু তাঁহাদিগকে লইয়াই কার্য্য আরম্ভ কবিলেন। কর্ম্ম এমনইভাবে সেই কর্ম্মবীরকে পাইয়া বসিল যে, নিউইয়র্কের এক মট্-মেমোরিয়াল্ হলেই ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে ৯০টি বক্তৃতা দিতে হইল! তিনি পাতঞ্জল দর্শন ও ভগবদ্গীতার অধ্যাপনার জন্য দুইটি ক্লাস খুলিলেন এবং তাঁহার ছাত্রগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত রাজযোগ এবং গীতা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি

(১) Farewell Address to His Holiness the Swami Abhedananda given by the Vedanta Society of New York on May 14th, 1906.—The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India, P. IX.

স্বামীজি-মহারাজ তিলেকের জন্যও বিশ্রাম করিতেন না—দেহের উপরও মমতা রাখিতেন না! তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে—"কাজ কর্‌তে ভয় করিস্ কেন? কাজকে ভয় কর্‌বি না। কর্ম্মযোগ চাই। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করা। আমি জুতো সেলাইও করেছি। কেবল আমাদের দেশেই জাত-বিচার;—তুই এটা কর্, তুই ওটা করিস্ না—শুধু জাত জাত ক'রে দেশটা গেল! প্রত্যেকটি কর্ম্ম হচ্ছে উপাসনা, বুঝ্‌লি! Work is Worship (কর্ম্মই উপাসনা)···ভগবানের উদ্দেশ্যে দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে কাজই করা যায় তাই উপাসনা।···খালি ঠাকুর-ঘরে যাওয়া, হরি নাম করা, কি গাছতলায় চোখ বুঁজে সব ত্যাগ ক'রে বসাই যে উপাসনা—তা' নয় (১)

অন্য একদিন তিনি শিষ্যকে কাহিয়াছিলেন—"ঘর ঝাঁট্ দেওয়া, বাজার করা, অফিস যাওয়া—সব কাজেই ঈশ্বরের সেবা কচ্ছি এই মনে ক'রে কর্ম্ম ক'রে চলে যাও;—এতে তোমার কর্ম্মবন্ধন কেটে যাবে, তুমি মুক্ত হ'য়ে যাবে, এই হচ্ছে কর্ম্মের সাফল্য লাভের রহস্য (Secret of Success)। এই দেখ্ আমি সেলাইও কর্‌তে পারি, মোটর-কারও চালাতে পারি, আবার গো-সেবাও কর্‌তে পারি। আমেরিকাতে আশ্রমে থাক্‌তাম, সেখানে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করেছি; আমার এই সব কাজ দেখে ওরা অবাক্ হ'য়ে গেছে। আমি ওদের দেশে থেকে, ওদের কাছে ওদের আচার ব্যবহার শিখে—ওদেরই উপর টেক্কা দিতাম!—[illegible]া হ'লে ওরা মান্‌বে কেন! এমন কি ওরা আমার পায়ে জুতো পরিয়ে দিয়েছে। খালি Lecture (বক্তৃতা) দিতে পারলে ত হ'বে না—ওরা চায় Practical life (কর্ম্মময় জীবন), তা' যদি দেখাতে পার,

(১) শুনিয়াছি—ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ-চৈতন্য।

তা'হলে মান্‌বে। আমাদের কাজের কথা শুন্‌লেই জ্বর হয়, মহা কুঁড়েমি ক'রে সময় নষ্ট করি;—এ হচ্ছে মহা তামসিকের লক্ষণ!—ওরা সময়ের মূল্য বুঝে। এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট কর্‌বে না—Time is money (সময়ই হলো টাকার সমান)। (১) ·

কর্ম্ম-বীরের বেদান্ত-প্রচার-কার্য্য চারি বৎসর মধ্যে (১৮৯৬-১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে) মার্কিণ দেশে এমন সাফল্য লাভ করিয়াছিল যে, স্বামী-বিবেকানন্দ মহারাজ নিউইয়র্কে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"নিউইয়র্কের রুদ্ধদ্বারে আমি তিনবার করাঘাত করিয়াছি কিন্তু সে দ্বার তখন খোলে নাই। তুমি যে এখানে বেদান্তকে স্থায়ী বাসভূমি দিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমার আনন্দ আর ধরে না, আজই প্রথমে আমি নিউইয়র্কে আমাদের নিজের একটি আশ্রম পাইলাম।" (২) সে সময়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রাণপণ চেষ্টায় নিউইয়র্কের বেদান্ত-সমিতির নিজস্ব একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল এবং বলিতে গেলে পাশ্চাত্যে বেদান্তদর্শনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। (৩) তাঁহাব জ্ঞানগর্ভ ও সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া নিউইয়র্ক, ওয়াসিংটন, বোষ্টন্, মিল্‌ফোর্ড, নিউটন্-হাইল্যাণ্ড, সালেম্, মণ্টক্লেয়ার, ইলিয়ট্, গ্রীনএকার প্রভৃতি স্থানের শত শত নরনারী মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ক্যানাডা, আলস্কা, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অত্যুজ্জ্বল মনীষার পরিচয় অল্পকাল মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময় আমেরিকার "অনেক খ্যাত নামা বিদ্বান্ ও সমৃদ্ধিশালী অধিবাসী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া" (৪) নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিয়া-

---

(১) যেমন শুনিয়াছি—ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ-চৈতন্য।

(২) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য (স্বামী সদ্রূপানন্দ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৩) The Amrita Bazar Patrika—10-9-39.

(৪) স্বামী অভেদানন্দ—ব্রহ্মচারী শান্ত চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ছিলেন। একবার (১৮৯৯খৃঃ অঃ) স্বামীজি-মহারাজের একজন শিষ্যা মিস্ মিনি বুক্ ক্যালিফোর্ণিয়ায় আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাকে ১৬০ একর (৪৮০ বিঘারও অধিক) ভূমি দান করেন। স্বামীজি-মহারাজ উহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে সমর্পণ করিলে পর স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের আদেশে স্বামী তূরীয়ানন্দের তত্ত্বাবধানে ক্যালিফোর্ণিয়ায় "শান্তি-আশ্রম" স্থাপিত হয়। সেই আশ্রম এখন সান্-ফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত-সমিতির অধীনে পরিচালিত হইতেছে। পরিতাপের সহিত বলিতে হয় যে, বেলুড় মঠের স্বামী অশোকানন্দ মহারাজ কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আসিয়া আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের যে কাহিনী একটি প্রকাশ্য সভায় বিবৃত করিয়াছিলেন তাহাতে স্বামী অভেদানন্দের নামোল্লেখও করেন নাই! (১)

স্বামীজি-মহারাজ ছিলেন সেই রকমের একজন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ(২) "ঈশ্বর-বিমুখী লোক কিছুদিন" যাঁহার "সংস্পর্শে আসিয়াই ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া যাইত, তাঁহার সামান্য উপদেশ পাইয়াই ভোগাসক্ত ব্যক্তির মনে বিষয়ে অনাসক্তি আসিত, জড়প্রায় স্থূলবুদ্ধি লোকের হৃদয়েও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জাগিত এবং অতি দুর্ব্বল প্রাণও সেই বীর-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে আসিয়া দুর্জ্জয় সাহসে ভরিয়া উঠিত। যাদুকর ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক যাদুবিদ্যা দেখাইতে পারে।" (৩) "স্বামী অভেদানন্দের শক্তি ও প্রতিভা ছিল বহুমুখী, এক দিকে তিনি তপস্বী,

(১) The Amrita Bazar Patrika (Town)—25th January, 1935.

(২) দার্জ্জিলিংএ স্বামী অভেদানন্দ মাহারাজ—শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বিশ্ববাণী—ফাল্গুন, ১৩৪৬।

(৩) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ, (বিবেকানন্দ মিশন)। বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৪৬।

জ্ঞানী, ধ্যানী ও ধর্ম্মাচার্য্য এবং অন্যদিকে কর্ম্মী, বাগ্মী, পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও ধর্ম্মনেতা ছিলেন।" (১) সর্ব্ব-সাধারণের জন্য স্বামীজি-মহারাজের নির্দ্দেশ ছিল—নাম জপ, অনুক্ষণ নাম জপ। "প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরে বসিয়া ২।৩ হাজার বার ইষ্টমন্ত্র জপ" করিবে—ইহাই ছিল তাঁহার আদেশ। জপ করিতে করিতে মন স্থির হইলে ইষ্টমূর্ত্তির চিন্তা করিতে হয়। একজন গৃহী-ভক্তকে তিনি একবার লিখিয়াছিলেন—"যতটুকু পার ধ্যান করিবে। বেশী করিবার আবশ্যক নাই। ঠাকুরের নাম জপ করিও যখন মন স্থির না হয় এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিও। বেশী ধ্যান করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব। যারা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হয়েছে তাদেরও ধ্যান সহজে হয় না। তোমাদের কথা ত অনেক দূরে। তবে ঠাকুরের নাম, গুণ-গান ও জপ-তপ করিলেই তোমাদের ধ্যানের ফল হইবে।" (২) স্বামীজি-মহারাজের মধ্যে নানা যোগ-বিভূতি বিকশিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাই। (৩) তবে শ্রীশ্রীগুরু-দেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তিনি সে সকল শক্তি লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। "তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা এবং চরিত্র-মাধুর্য্য প্রভাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন।" (৪) এইরূপ একজন মহাশক্তিধর ছিলেন বলিয়াই বন্ধুহীন নিউইয়র্ক নগরীতে উপস্থিত হইয়া তিনি বহুদিন অনাহারে বা অর্দ্ধাহারেও নিজের পথ সুপরিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার একমাত্র

(১) দৈনিক যুগান্তর—২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৬।

(২) বিশ্ববাণী—আশ্বিন, ১৩৪৬।

(৩) বিশ্ববাণী—ফাল্গুন, ১৩৪৬।

(৪) সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা—৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৬।

মন্ত্র ছিল—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (১) বন কাটিয়া পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া, সাগর শুষিয়া—সর্ব্ববাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার গৌরব, মহাবীর্য্যের গৌরব। স্বামীজি-মহারাজ কি ভাবে সেই অসীম গৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং সেই অসাধারণ কর্ম্মযোগীর শ্রীচরণে দাম্ভিকেরও উন্নতশির ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। (২) যে আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগের বিষোদ্গারী মুখ মূক হইয়াছিল (৩) তীব্র জাতিবিদ্বেষ সেই মার্কিণদেশে তাঁহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই—বরং তাঁহার অন্তরের সুপ্তসিংহটিকে জাগ্রত-সচেতনই করিয়াছিল। তিনি নির্ভীককণ্ঠে সে দেশে ভারতের জয়গান গাহিয়াছিলেন এবং সভার পর সভায়, রচনার পর রচনায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতায় ভারতবর্ষই জগতের গুরু—বলিয়াছিলেন—বিদ্বেষ-পরায়ণ যে সকল খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকগণ অবিরত নিন্দাবাদ করিয়া

(১) Leaves from my Diary—Swami Abhedananda Maharaj in the বিশ্ববাণী—চৈত্র, ১৩৪৫।

(২) And the position that the Ramkrishna Mission had attained in the States was not a little due to the pioneer work of Swami Abhedananda.—The Hindusthan Standard—9. 9. 39.

—It is mainly due to his untiring efforts that the Vedanta Philosophy has secured a parmanent foothold in the West—The Amrita Bazar Patrika—10. [illegible]9.

(৩) In not a few of his speeches in America he challenged the scathing and sweeping denunciation of the Religion and society of the Hindus by the Christian Missionaries. He fought for India in that country in the face of bitter race-prejudice and sectarian jealousy, but through sheer zeal and perseverance he succeeded in making himself heard and appreciated—The Hindusthan Standard—2. 10. 39.

ভারতের হিন্দুসমাজকে হেয় ও ঘৃণ্য করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সাধ্য কি যে, তাঁহারা তদপেক্ষা ভাল কিছু ভারতের হিন্দুদিগকে দিতে পারেন—য়ুরোপের সামাজিক ব্যবস্থা কি হিন্দুসমাজব্যবস্থা অপেক্ষা এতই উন্নত?—It is not even so perfect as the corrupted caste system which exists in India"—(১) পবন যেমন কুসুমসুরভি বহন করিয়া দূর দূরান্তরে লইয়া যায় এবং মানব-সাধারণের মধ্যে উহা পরিবেশন করে, ভারতের সনাতন ধর্ম্মের ক্রিয়াও অনুরূপ—মানবমণ্ডলীকে উদ্বোধিত করিতে যাহা কিছু সত্য আছে, যাহা কিছু পবিত্র আছে, উহা তাহাই বহন করিয়া বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করিতেছে; উহা আকাশের ন্যায় বিরাট ও বাতাসের ন্যায় অপক্ষপাতে সর্ব্বগ। এই সকল কথা যখন ভাবি তখনই স্মরণ হয়—মার্কিণ-প্রবাস-কালে প্রথম দুই তিন বৎসর বলিতে গেলে "ভিক্ষাবৃত্তি" অবলম্বন করিয়া স্বামীজি-মহারাজকে কর্ম্মে ব্রতী হইতে হইয়াছিল—ভারত ও সনাতনধর্ম্ম এতদুভয়কে প্রচার ও প্রকাশ করিতে হইয়াছিল! তিনি তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন:—
I earned my living by becoming a guest of different people who were very kind to invite me in their houses......knowing that I had no funds to support myself and that there was no one to help me financially, they kept me from starving by inviting me at their meals at noon and in the evening. (২)

(১) হিন্দু-ভারতের সামাজিক সংস্কার যে বিশেষ প্রয়োজন—পাশ্চাত্যের গুণগুলি গ্রহণ এবং প্রাচ্যের দোষ বিসর্জ্জন না করিলে যে সমাজদেহ ব্যাধিমুক্ত হইবে না—স্বামীজি-মহারাজ ইহা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন।

(২) Leaves from my Diary—Swami Abhedananda Maharaj in the বিশ্ববাণী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

This was like the *Bhiksha vritti* of the Hindu Sannyasis in India. (১)

যাহা হউক ক্রমে যখন প্রতিষ্ঠা আসিয়া স্বামীজি-মহারাজের চরণলগ্ন হইল এবং অর্থের অভাব আর পূর্ব্ববৎ রহিল না তখন বেলুড়-মঠে "শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজির কাজ ও ভাবের প্রসার করা" অর্থাভাবে একরূপ "স্থগিত রাখিতে হইয়াছে" শুনিয়া তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। (২) সেই বেলুড়-মঠ পরে জীবনকালে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারে নাই এবং দেহাবসানেও দেব-দেহটি সম্মুখে রাখিয়া মঠের কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষ অম্লানবদনে বলিয়াছিলেন—বেলুড়-মঠ-প্রাঙ্গণের প্রান্তে শব-সৎকারের অনুমতি দিতে তাঁহাদিগের সম্মতি আছে, কিন্তু সৎকারস্থলটি নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোন স্মারক-প্রস্তর-স্তম্ভ স্থাপনে সম্মতি নাই! শুধু ইহাই নহে, কাশীপুর মহাশ্মশানে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে—স্মৃতিমন্দিরের পার্শ্বে যাহাতে স্বামীজি-মহারাজের শবদেহের সৎকার না ঘটিতে পারে তাহার জন্য মঠের

(২) Leaves from my Diary—Swami Abhedananda Maharaj in the বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ ১৩৪৬।

(২) "......মঠের কি রকম টানাটানি অবস্থা। অর্থাগম প্রায় একেবারেই বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজির কাজ ও ভাবের প্রসার করা প্রায় একেবারে স্থগিত রাখ্‌তে হয়েছে। মঠের Trustee-রা সকলে মিলিত হ'য়ে এই ঠিক হয়েছে যে, ঠাকুরের ও স্বামীজির উক্তি ও Lectures and other works প্রভৃতি আমাদের যে সকল Centre হইতে ছাপাইয়া বিক্রয় হয় তাহাদের হইতে লাভের [illegible]র্থাংশ যদি তাহারা মঠে প্রদান করে তাহা হইলে......অনেক কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় [illegible]...আমি তাহাকে (সারদাকে) লিখিয়াছিলাম যে তাহাকে...লাভের 25 p.c. মঠে দিতে হইবে। তাহাতে সে লিখিয়াছে যে তুমি যদি New York Centre হইতে ঐরূপ দিতে রাজী হও ও Indian সকলে দেয় তাহা হইলে সে-ও ঐরূপ দিতে রাজী আছে।......তুমি দিতে না চাহিলে সারদাও নারাজ হইবে...এখানকার অন্যান্য Centre-রাও grudge করিবে। এই উদ্দেশ্যের সমস্ত সফলতা ও কার্য্যে পরিণতি কেবল এখন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, অন্যথা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।......"
—বেলুড়-মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পত্র (১।২।১৯০৬)।—বিশ্ববাণী, বৈশাখ—১৩৪৬।
স্বামীজি-মহারাজ "এই চিঠি পাইয়া......৬৭৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন।"

কেহ কেহ চিতাশয্যা রচিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আপত্তি উত্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই!

বীর-সাধক, শক্তিমান্ সন্ন্যাসী, অদ্ভুতকর্ম্মা লোকগুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন "শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম প্রিয় ও বুদ্ধিমান্ শিষ্য" এবং "তাঁহারই হাতে ও ছাঁচে গড়া।" (১) "পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ জিউর উপযুক্ত গুরুভাই" ছিলেন তিনি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্কিণ হইতে প্রথমবার ভারতে প্রত্যাগমন করেন কিন্তু তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বেই পবনবাহিত সুরভির মত তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ভারত-ব্যাপ্ত হইয়াছিল! স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ হইতে তাঁহাকে আমেরিকায় লিখিয়াছিলেন—"তোমার Lectureগুলি বড় প্রাঞ্জল এবং সুপাঠ্য। ভারতবর্ষে তোমার কত প্রতিপত্তি। Coconada নামক একটি স্থানে Industrial Exhibition হয়। তাহাতে তোমার এক বৃহৎ প্রতিকৃতি দর্শকগণের বিনোদনার্থ রচিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ জিউর তুমিই উপযুক্ত গুরুভাই ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমি ইহাতে যে কত আনন্দিত তাহা তোমায় বলিয়া কি জানাইব।" (২)

স্বামীজি-মহারাজ ছিলেন একাধারে "ত্যাগী, যোগী, মনস্বী...... তাঁহার পবিত্র চরিত্র, গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সুগভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব চিন্তাশীলতা, অদ্ভুত কর্ম্মসাধনা, অলৌকিক ত্যাগ, সুদৃঢ় নিষ্ঠা, অটল অধ্যবসায় ও অসীম নির্ভীকতা" (৩) এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের চরণারবিন্দে একান্ত নির্ভরশীলতা, তাঁহাকে বর্ত্তমান জগতের অন্যতম

(১) শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজির পত্র—বিশ্ববাণী, কার্ত্তিক— ১৩৪৩ ও শ্রাবণ—১৩৪৭।
(২) শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র—বিশ্ববাণী, জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৬।
(৩) স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন—বিশ্ববাণী, অগ্রহায়ণ—১৩৪৬।

অতি-মানবরূপে চিরদিনের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল গুণরাশি তাঁহাকে অচিরকাল মধ্যে নির্ব্বান্ধব মার্কিণে শত শত বন্ধুজন-পরিবেষ্টিত করিয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ও তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় এরূপভাবে বিগলিত হইয়াছিল যে, তিনি বহুবার খৃষ্টধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—কোন কোন ধর্ম্মযাজক রবিবাসরীয় উপাসনার অন্তে মন্দিরে উপস্থিত নব-নারী-দিগকে জানাইয়া দিতেন যে, অমুক দিনে অমুক সময় স্বামী অভেদানন্দ অমুক বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন! সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধও করিতেন। (১) সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ঠাকুরের "পরম-প্রিয় ও বুদ্ধিমান্ শিষ্য" এইরূপে মার্কিণ দেশে ধর্ম্মমতসমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেখানে এমন দিন আসিয়াছিল যখন তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহুদূরস্থান হইতে নরনারী আসিয়া পূর্ব্বাহ্নেই আসন সংগ্রহ করিয়া বসিয়া থাকিত—বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেও লোকে নীরবে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিত। "বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে কোন কোনও সময়ে সপ্তাহে ৫০০০।৬০০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে হইত। আটলাণ্টিক উপকূল হইতে প্রশান্ত উপকূলে পর্য্যন্ত তাঁহাকে তজ্জন্য যাতায়াত করিতে হইত। বক্তৃতার শেষেও অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট তিনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন।......একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ এইভাবে উত্তর দিতে পারিতেন।" (২)

[illegible]উইয়র্কে আগমন করিবার পর কতিপয় সম্ভ্রান্ত নাগরিকদিগের সহিত পরিচিত হইয়া স্বামীজি-মহারাজ প্রথমে তাঁহাদিগের কাহার-

(১) Dr. Heber Newton D. D. of the Episcopal church : Leaves from my Diary—Swami Abhedananda Maharaj in the বিশ্ববাণী—বৈশাখ, ১৩৪৬।

(২) বিবিধ প্রসঙ্গ—স্বামী শঙ্করানন্দ। বিশ্ববাণী—বৈশাখ, ১৩৪৬।

কাহারও বৈঠকখানায় বেদান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী ক্রমেই এত মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন যে, শেষে তাঁহাদিগেরই মুখে মুখে তাঁহার নাম দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ব্যক্তিবিশেষের বৈঠকখানায় কথোপকথন-সভার অধিবেশন ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন বক্তৃতার জন্য হল-ঘব ভাড়া করার প্রয়োজন দেখা গেল। প্রথম দিনের প্রকাশ্য সভায় (১৮৯৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বব) বক্তৃতার বিষয় ছিল—বেদান্ত কি ? সে দিন শ্রোতা ছিল মাত্র চল্লিশ জন। কিছুদিন পরেই ৪০ জন শতাধিক হইয়া উঠিল এবং সভার জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হলের আবশ্যক হইল। ক্রমে আরও বৃহত্তর এবং বৃহত্তম স্থানের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বামীজি-মহারাজ সমগ্র আমেরিকায় এরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সৌহার্দ্দ্য আকর্ষণ করিলেন যে, বক্তৃতা দিবাব জন্য নানা নগব, নানা শিক্ষা-সদন, নানা বিদ্যাপীঠ বা ইউনিভার্সিটি এবং ক্লাব্ প্রভৃতি ও প্রথিতনামা নানা বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট হইতে সর্ব্বদা সাদর আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। পৃথ্বীমান্য বৈজ্ঞানিক এডিসন্ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া এত প্রীত হইলেন যে, একটি বৃহৎ গ্রামোফোন উপহার দিয়া তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন—উত্তরমেরু আবিষ্কারক পৃথ্বীখ্যাত ন্যান্সেন্ তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ নিজের বিস্ময়কর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিলেন—সমগ্র যুক্ত-রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে পর্য্যন্ত হোয়াইটহলের প্রাসাদে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। গণ্যমান্য সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, ধর্ম্মযাজক, দার্শনিক, রাজ-নীতিবিদ্ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সুধীবর্গের সহিত মার্কিণে তাঁহার শুধু যে পরিচয় হইয়াছিল তাহা নহে—বন্ধুত্বও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ২৫ বৎসর ধরিয়া এইরূপে মার্কিণের বিশিষ্ট অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের জ্ঞান—ভারতের সভ্যতা, ভারতের সাধনা—ভারতের সংস্কৃতি ও ত্যাগমন্ত্রের যে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, পরবর্ত্তী সন্ন্যাসী-প্রচারকগণ সেই পরিচয়ে আপনাদিগকে পরিচিত না করিলে স্বামী বিবেকানন্দ—অভেদানন্দ কর্ত্তৃক বিজিত সেই মহাভূখণ্ডে অপরিচিতই থাকিয়া যাইতেন!

স্বামীজি-মহারাজ পাশ্চাত্য মহাদেশে যে কতগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতা আমেরিকায় এবং কলিকাতায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের প্রশংসায় সুধীসমাজ পঞ্চমুখ। এখনও প্রায় ২৫০টি বক্তৃতা অমুদ্রিত আছে। তাহার মধ্যে আছে গীতা ও কঠোপনিষদের ভাষ্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাসমূহ, আর "Advanced Psychology-র উপর জগদ্বিখ্যাত বক্তৃতামালা।" স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা চিরকুমারী বিদুষী মিস্ ওয়াল্‌ডো স্বামীজির বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সংশোধন ও সম্পাদন করিয়াছিলেন; (১) কিন্তু স্বামী অভেদানন্দকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও তাঁহার নিজের বক্তৃতাগুলির পাণ্ডুলিপি নিজেকেই সংশোধন করিতে হইয়াছে। কঠিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি দিনের পর দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। "সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—তিনি যেন আহার নিদ্রা ভুলিয়া ইহাতেই মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন।" বিশ্রাম করিতে বলিলে শুনা গিয়াছে তিনি বলিতেন—"বাকি কাজ ত সেরে যেতে হ'বে।" কে তখন জানিত যে, তাঁহার মহাপ্রস্থানের ইঙ্গিত এই কথার মধ্যে গুপ্ত ছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-মঠের স্বামী শঙ্করানন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"মঠ, মন্দির,

(১) Leaves from my Diary—Swami Abhedananda Maharaj in the বিশ্ববাণী—শ্রাবণ, ১৩৪৬।

স্কুল, কলেজ বহু হইবে—নষ্ট হইবে, কিন্তু তিনি যে ভাবরাশি তাঁহার বিচিত্র রচনাবলীর ভিতর রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল থাকিয়া লোকের মনে শান্তি ও আনন্দ দান করিবে। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার সমস্ত রচনাবলী থাকায়......" তাঁহার ভাবধারার সহিত এদেশের অনেক লোক পরিচিত হইতে পারেন নাই। "তাঁহাব গ্রন্থরাজি যদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত তবে তিনি দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য বলিয়া ভারতে পূজিত হইতেন।" (১) "বাস্তবিকই ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ঠাকুর ও স্বামীজির ভাবরাশি অভেদানন্দ দুই হাতে বিলাইয়াছেন।" (২) স্বামীজি-মহাবাজ "দেহত্যাগের প্রায় ৪ মাস পূর্ব্বে......কথাপ্রসঙ্গে .....বলিয়াছিলেন—কেউ কেউ বলে যে পাশ্চাত্য দেশে আমি কোন কাজ করিনি। যদি আমি ২৫ বৎসর স্বামীজির কাজে লেগে না থাকতাম তবে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যক্ষেত্র কি প্রসার হত? দুদিন বাদে পাশ্চাত্যেরা স্বামীজির বাণী ভুলে যেত। . ..পঁচিশ বছর ধরে ওদেশে আমি স্বামীজির প্রবর্ত্তিত পথে ঠাকুরকে প্রচার করেছি।" (৩) অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার কার্য্যকে "নিজের মত জাহির" করিবার প্রচেষ্টারূপে এক

(১) বিবিধ প্রসঙ্গ—স্বামী শঙ্করানন্দ। বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৪৬। স্বামীজি-মহারাজের প্রথম পুস্তকের নাম "Reincarnation' বা অবতারবাদ। এই গ্রন্থে তাঁহার তিনটি বক্তৃতা আছে—(ক) What is Reincarnation? (খ) Which is Scientific—Resurrection or Reincarnation? (গ) Evolution and Reincarnation। তাঁহার একজন ভক্ত Mr. Vanderbolt এই বক্তৃতাগুলি শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজব্যয়ে দুই সহস্র খণ্ড Reincarnation মুদ্রিত করিয়া স্বামীজি-মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহার অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তক ক্রমে ক্রমে নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।—Leaves from my Diary—Swami Abhedananda Maharaj in the বিশ্ববাণী—পৌষ, ১৩৪৬।

(২) স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

(৩) স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

সময়ে বেলুড়মঠে গৃহীত হইয়াছিল এবং ইহাই বোধ হয় তাঁহার সহিত বেলুড়-মঠের মতবিরোধের অন্যতম কারণ। (১) দ্বিতীয়বার মার্কিণ দেশে যাইবার পূর্ব্বে "তিনি (বেলুড়) মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করিয়া মঠের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পবিদর্শন করেন। ট্রাষ্টিদেব সভাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আজীবন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন এই প্রস্তাব উপস্থিত" (২) করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল। "শুনিতে পাই এই সময়ে মঠের কেহ কেহ স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্থানে স্বামী সারদানন্দকে বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু স্বামীজি-মহারাজের জন্যই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সঙ্ঘ চিরদিনই ভাল এবং একজন মহাপুরুষের কথায় সঙ্ঘের মধ্যেই শ্রীভগবানের বাস ও স্থিতি—কিন্তু দল চিরদিনই নিন্দনীয়—উহা নিয়তই বিরোধ আনে ও অন্ধকারের প্রাচীর তুলিয়া আলোকের অবাধগতিকে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে!

(১) এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী) মাদ্রাজ হইতে ১লা আগষ্ট ১৯০৭ তারিখে স্বামীজি-মহারাজকে আমেরিকায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—"তোমার পত্র ও Constitution and By-laws of the Vedanta Society (নিউইয়র্ক) পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আমি অতি মনোযোগের সহিত বইখানি পড়িলাম। যদিও উহাতে রামকৃষ্ণমিশনের নামতঃ উল্লেখ নাই, তথাপি যে উহা মিশনেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা আমার বেশ উপলব্ধি হইল। সারদা বোধ হয় মনে করে যে, তুমি রামকৃষ্ণ-মিশন্ ছাড়া আর একটা কিছু তৈয়ার করিয়াছ। ইহা তাহার বিষম ভুল যদি সে এরূপ মনে করে।...এই দেশেই (ভারতবর্ষে) শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজকে directly preach কল্লে লোকে বলে, এরা আর একটা দল পাকাচ্ছে, তা ও দেশে (পাশ্চাত্যে) লোকে বল্‌বে না ত [illegible]...আমাদের অজ্ঞানই পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ। আমরা পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাত নই বলিয়া পরস্পরকে না বুঝিতে পারিয়া অনেক সময় মনোমালিন্য বশতঃ বিবাদ প্রভৃতি করিয়া ফেলি; আমার বোধ হয় সারদার Vedanta Society সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাকে নাই বলিয়া সে মনে করে যে, তুমি নিজের মত জাহির করিতেছে—প্রভৃতি।......যাক্ তুমি ওসব দিকে নজর দিও না। ক্রমে স্বীয় দলবলের সহিত সারদাও বুঝিতে পারিবে।......"—শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র। বিশ্ববাণী—আষাঢ়, ১৩৪৬। স্বামীজি-মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত New York Vedanta Society-র "Constitution" কার্ত্তিক, ১৩৪৬ সালের বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

২ আমেরিকায় স্বামী শ্রীঅভেদানন্দ—স্বামী শঙ্করানন্দ। বিশ্ববাণী—মাঘ, ১৩৪৬।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সহায়-সম্পদহীন একজন দীন সন্ন্যাসী স্বামী-বিবেকানন্দের আহ্বানে লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন ভারতে তাঁহাকে কেহ চিনিত না। হিন্দুধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী মার্কিণ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ভারতে আসিবার পথে কলোম্বো নগরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন ভারতবাসীর চক্ষে তিনি সম্রাটের অপেক্ষাও অধিক পূজনীয় হইয়াছেন, কারণ ভারতবর্ষ হীরকখচিত স্বর্ণ-গঠিতরাজমুকুট অপেক্ষা সন্ন্যাসীর গৈরিককেই বেশী মান দেয়। সেই বিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী-অভেদানন্দ মহারাজকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য যখন কোটাহিনা উদ্যানবাটিকার দ্বারদেশ হইতে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইল তখন তিনি দুগ্ধফেননিভ শ্বেতবস্ত্রে মণ্ডিত পথে চরণবিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন; ভাবোন্মত্ত নরনারী গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়া সেই পথকে আবৃত করিয়া দিল। তখন অদূরে বেনু-বাঁশীর রবের সঙ্গে শত সহস্র কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে লাগিল। তাঁহার মস্তকের উপর একটি বৃহৎ ও সুসজ্জিত দেবছত্র ধারণ করিয়া ছত্রধারীরা চলিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে সুবাসিত বারির ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। পত্র, পুষ্প, পল্লব ও পতাকায় সুশোভিত বৃহৎ বৃহৎ নব-রচিত তোরণ অতিক্রম করিয়া স্বামীজি-মহারাজ বিশ্রামভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন! এই ভাবে কলোম্বো হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত নানা নগরে ও উপনগরে রাজমানে সম্বর্দ্ধিত হইয়া স্বামীজি-মহারাজ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মানপত্রের পর মানপত্রে তাঁহার জয় ঘোষিত হইতে লাগিল। তিনিও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া চলিলেন—"যদি বিশ্বজয়ী হইতে চাও তবে আগে আত্মজয় কর। অভীঃ হও। ব্রহ্মকে যে জানিতে পারিয়াছে, ভয়শূন্য সে। বিশ্বমানবের জন্যই বাঁচিয়া থাক, আবার বিশ্বমানবের জন্যই মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।

মনুষ্যত্বের সেবায় ইন্দ্রিয়সুখ বলি দাও এবং শ্রীভগবানের দাস হইয়া সকল কর্ম্ম কর। সর্ব্বদা তোমার সেনাপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হও। সকলকে প্রেম করিয়া ভগবান্‌কে ভালবাসিতে শিক্ষা কর। কাম এবং ক্রোধ যে জয় করিয়াছে, এই জীবনেই সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।'(১) স্বামীজি-মহারাজ যতদিন পার্থিব দেহে ভারতে বর্ত্তমান ছিলেন— মাহাত্মা গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সর্ব্বদা মঠে আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া গিয়াছেন—কলোম্বো হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত কতবার তাঁহার জয়গানে মুখরিত হইয়াছে—কোথাও বা শোভাযাত্রাকালে তাঁহার শকট টানিয়া বিমুগ্ধ জনমণ্ডলী মনে করিয়াছে— শ্রীশ্রীভগবানের জয়যাত্রার রথ টানিলাম!

(৯)

সাত মাস পরই আবার যখন লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হইতে ডাক আসিল, স্বামীজি-মহারাজ কর্ম্মদেবতার সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুনরায় পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিলেন এবং প্রায় পঞ্চদশ বৎসর মার্কিণে সুযশের সহিত ধর্ম্ম-প্রচার ও নানাস্থানে বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সান্‌ফান্সিস্‌কোতে জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক স্বামীজি-মহারাজ হনোলুলুতে আসিলেন। সেখানে তখন (pan-Pacific) শিক্ষাসংসদের বৈঠক বসিয়াছিল। ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেস্থানের কার্য্য শেষ করিয়া তিনি জাপানে আসিলেন এবং জাপানিদিগের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য সাংহাই, হংকং,

(১) The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India—Published by Bramhachari Santa Chaitanya.

ক্যান্টন্, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিলেন এবং ভারতের দান বেদান্তের বাণী বিলাইতে লাগিলেন। যখন তিনি সিঙ্গাপুরে তখন মালয়-রাজ্যের আমন্ত্রণে তাঁহাকে কুয়ালা-লাম্পুরে যাইতে হইল এবং কনফ্যুসিয়সের ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও তাওইজম্ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হইল। কুয়ালা-লাম্পুরে যখন এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা চলিতেছে, তখন রেঙ্গুন হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। রেঙ্গুনে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজিকে অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। রেঙ্গুন হইতে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, বেলুড়-মঠের বাতাস স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের পরই গতি-মুখ ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছে! সে সময়ে নিজের বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় আর ছিল না, কারণ তিব্বতের হিম্সি-মঠ তখন স্বামীজি-মহারাজকে প্রবল বেগে টানিতেছিল। "আমেরিকায় থাকাকালে তিনি শুনিয়াছিলেন, ডাক্তার নোটোভিচ্ নামক জনৈক রুষ-পর্য্যটক তিব্বত প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া জানিতে পান যে, যীশুখৃষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ও সেই বিষয়টি তিব্বতের হিম্সি-মঠের পুস্তকাগারে একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে বিবৃত আছে। আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়াই স্বামীজি-মহারাজ সেই তত্ত্বের সন্ধানে ৫৬।৫৭ বৎসর বয়সে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অমর-নাথ হইয়া পদব্রজে দুরধিগম্য তিব্বতের হিম্সি-মঠে গমন করিলেন এবং মঠের পুস্তকাগারে সেই হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়া উহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ করিলেন। সেই অনুবাদটি "পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" (১)

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামীজি-মহারাজ দেখিলেন, বেলুড়-মঠ তাঁহার নিকট বিদেশ তুল্য হইয়াছে! তিনি সেদিকে

(১) লেখকের 'বাঙ্গালীর বল' (দ্বিতীয় সংস্করণ), ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কলিকাতায় ও দার্জ্জিলিংএ শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করিলেন এবং কলিকাতার মঠগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। বহু নর-নারী এই দুই মঠে তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন। কৃপাদানে তিনি অকৃপণ ছিলেন।—"দেহান্তের একদিন পূর্ব্বেও দীক্ষা দান করিয়াছেন। সকল ভক্তের পাপ-তাপ নিজে গ্রহণ করিয়া তিনি নিয়তই তাহাদিগকে শান্তি ও মঙ্গল বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।"

বেলুড়-মঠ তীব্র মতানৈক্যের জন্য স্বামীজি-মহারাজের নিকট বিদেশ হইয়াই রহিল বটে, কিন্তু যে সকল নরনারী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। কারণ জীবদ্দশায় বঙ্গদেশে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ যিনি শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন, স্পর্শ করিয়াছিলেন ও আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং লোক-কল্যাণ-চিকীর্ষায় এই তাঁহার শেষ যোগি-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—ইহাই ছিল তাঁহার শেষ জন্ম! (১)

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ একই অরণিকাষ্ঠ হইতে সমুদ্গত দুইটি হোম-শিখা। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম—প্রতিভা, ত্যাগ, নির্ভীকতা, অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা—তীব্র স্বদেশপ্রেম সর্ব্বোপরি মানব-প্রেম ও "তেজস্বিতা এবং আত্মদর্শনজনিত আত্ম-বিশ্বাস"—লোকে

---

(১) স্বামীজি-মহারাজের একজন ইউরোপীয় শিষ্যার নামকরণ হইয়াছিল Sister Sabitri। তাঁহাকে প্রথমবার দর্শন করিতে আসিয়া ভগ্নী সাবিত্রীর মনে হইয়াছিল—"Good Lord! I thought I was now going to see those eyes that beheld HIM, those ears that heard HIM, and not only that, but the very LORD HIMSELF that abides in HIM. And, so it was. But my commotion was so great that I realised nothing till I returned home in my hotel."—My Reminiscence—Sister Sabitri in the বিশ্ববা —আশ্বিন, ১৩৪৬।

বুঝিতে না পারিয়া যাহাকে বলিত দাম্ভিকতা বা আত্মম্ভরিতা তাহা উভয়ের মধ্যেই তুল্যরূপে বর্ত্তমান ছিল।

স্বামীজি-মহারাজ একদিন তাঁহার এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—"আমেরিকার লোকেরা আমাকে বল্লে—আপনি আমেরিকাবাসী হ'য়ে যান। আমি বল্লাম, তা' কেন হ'ব—আমি সন্ন্যাসী,—I am a citizen of the World—সমস্ত জগতই আমার দেশ।" (১)

সাগরের সঙ্গে যেমন হিমালয়ের তুলনা করা চলে না—যে যার মতই মহান্ ও বিরাট,—তেমনি স্বামীজি ও স্বামীজি-মহারাজের মধ্যেও তুলনা করা চলে না, কারণ "দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণের" লীলাকালে ইঁহারাই ছিলেন তাঁহার দুইটি বাহু! (২) প্রতীচী একদিন দেখিল একটি মহান্ ভাব—শ্রাবণের প্রথম ভীষণ বিক্রমে সু-উচ্চ—যেন একটি প্রবল শক্তিশালী তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় আসিতেছে! তরঙ্গ ছুটিয়া আসিল, ধাইয়া চলিল—পশ্চাতে রাখিয়া গেল দেশপবিপ্লাবী ভাবের বন্যা! সেই বন্যার বারিরাশি স্থির হইয়া রহিল এবং সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর দণ্ডের পর দণ্ড প্রাণশক্তি বিতরণ করিয়া কত অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিল। সেই উর্ব্বর ভূমিতে বাঙ্গালীর মনীষা চন্দনতরুর মত জন্ম লাভ করিয়া দিকে দিকে আজিও সুরভি ছড়াইতেছে। স্বামীজি বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার

(১) "১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের যুবক সন্ন্যাসীদের হস্তে নিউইয়র্ক প্রচার-কেন্দ্রের ভার অর্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ আপনার এক শিষ্য-প্রদত্ত বার্ক শায়ার (Berk Shire) নামক-পল্লীপ্রদেশে ২০০ একার (acre) জমিতে আপনার কয়েকজন শিষ্যকে লইয়া একটি আশ্রম স্থাপন করেন। এখানে তিনি ভারতবর্ষের ঋষিদের মত শিষ্যগণকে লইয়া বৃক্ষতলে আসনে বসিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন ও যোগ শিক্ষা দিতেন। এই নিভৃত নির্জ্জন আশ্রমে তিনি থাকিলেও তাঁহাকে অনেক স্থানে যাইয়া বক্তৃতা করিতে হইত।"—আচার্য্য শ্রীঅভেদানন্দ—স্বামী বেদানন্দ। বিশ্ববাণী—আশ্বিন, ১৩৪৬।

(২) ভাই, তুমি যত বড়ই হও আমাদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই 'কালী—ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান্।' ......তুমি প্রভুর হাতে ও ছাঁচে গড়া।—স্বামী প্রেমানন্দজির পত্র। বিশ্ববাণী—শ্রাবণ, ১৩৪৭।

যুগের যে সুদৃঢ় বেদী রচনা করিয়াছিলেন—স্বামীজি-মহারাজ তাহারই উপর নির্ম্মাণ করিয়া গেলেন হেমখচিত মর্ম্মরমন্দির! ভারে ভারে অর্ঘ্য বহিয়া এখন সেই পথে চলিয়াছেন বাঙ্গালী সাধকের দল এবং প্রতীচী হইতেও ভক্তগণ সেই পথেই পুষ্পাঞ্জলী বহন করিয়া বাঙ্গালা দেশে আসিতেছেন। (১)

দার্জ্জিলিংএর জল-বায়ু স্বামীজি-মহারাজের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল বলিয়া তিনি প্রত্যেক বৎসরেই গ্রীষ্মকালে তথায় যাইয়া কিছুকাল বাস করিতেন। পরে তথায় যে আশ্রম স্থাপিত করিয়াছিলেন, (২) বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন্ সস্ত্রীক তাহা দর্শন করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। লাট-সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য যখন মঠে আয়োজন চলিতেছিল তাহার পূর্ব্ব হইতেই তুমুল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ

(১) I stand here not as a delegate from any Institution, not as the President of the Ramkrishna Vedanta Society of Calcutta, but as the humble spiritual son of Bhagawan Sri Ramkrishna and *the last surviving Gurubhai* (Spiritual brother) of the world-renowned Swami Vivekananda, whose mantle fell on my humble self, to carry on the works started by him in England and America in 1896 A. D......I successfully conducted the pioneering Vedanta works, the fruits of which are visible this evening at the representations from far and abroad. It is a source of immense joy to me to see that the message of my Great Master is being more and more recognised and appreciated throughout the world.—Calcutta Town Hall Address of his Holiness The Swami Abhedananda on March 1st, 1937, while presiding over the deliberations of the Parliament of Religions in connection with the celebration of the first Birth Centenary of Bhagawan Sri Ramkrishna.

(২) কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চল শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম লীলাভূমি ছিল বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ইচ্ছা ছিল সেখানে একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামীজি-মহারাজ স্বামীজির সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার মানসে রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান বেদান্ত মঠ-স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সমিতি। পরে উহা মঠে পরিণত হইয়াছে। স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ এখন এই মঠের প্রেসিডেণ্ট। দার্জ্জিলিং মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টের নাম—স্বামী সিদ্ধরূপানন্দ।

হইয়াছিল। সে দুর্যোগ দেখিয়া সকলে হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বামীজি-মহারাজ গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন—তোমরা আয়োজন করিতে ক্ষান্ত হইওনা। কাল যখন লাট-সাহেব আসিবেন, এ দুর্যোগ তখন আর থাকিবে না। পরে আবার হইবে। (১) ফলে ঠিক হইয়াছিলও সেইরূপ।

দার্জ্জিলিং আশ্রম দেবোত্তর করিয়া দিয়া স্বামীজি-মহারাজ প্রসন্ন-চিত্তে বলিয়া উঠিলেন—'সব ঠাকুরকে দিয়া আমি ফকির হইলাম। আর আমাকে দার্জ্জিলিংএ আসিতে হইবেনা!' বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্যের গূঢ় অর্থ তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার আর দার্জ্জিলিংএ যাওয়া ঘটে নাই! প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে—১৯৩৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিং হইতে নামিবার সময় দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্-ট্রেনের দুই এক খানি গাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ায় যাত্রিগণ গাড়ী হইতে নিম্নে ঝম্প প্রদান করেন। স্বামীজি-মহারাজকেও তদ্রূপ করিতে হইয়াছিল! সেই সময় তিনি হৃদ্‌যন্ত্রে কিঞ্চিৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। যে কালব্যাধি ভারত-ভূমিকে রত্নহারা করিয়াছে, তাহার সূত্রপাত এই ভাবে হইয়াছিল।

রোগ যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কলিকাতার বহু সুবিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসক কিছুই করিতে পারিলেন না তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈব-বাণী শুনিয়া স্বামীজি-মহারাজ স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্ক-তীর্থের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। ক্রমে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া সকলেরই আশা হইল যে তিনি যাইবেন না—থাকিবেন। এই রোগভোগের কালেও তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের কোন

(২) দার্জ্জিলিংএ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ—শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—বিশ্ববাণী, ফাল্গুন, ১৩৪৬। স্বামীজি-মহারাজের সহিত দীর্ঘকাল সাহচর্য্যের ফলে ইনি তাঁহার বাক্‌সিদ্ধির আরও অনেক বিবরণ জানেন এবং সেগুলি যত্ন সহকারে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

রূপ বিঘ্ন ঘটিতে দেখা যায় নাই—মুহূর্ত্তের জন্যও আনন্দ তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। যেদিন গিয়াছি সেই দিনই দেখিয়াছি স্বামীজি-মহারাজ কর্ম্ম-ব্যস্ত। মুখে লাগিয়া আছে সরল শুভ্র সুন্দর হাসি—বাক্যে সেই স্বাভাবিক রঙ্গরস। তিনি যে গুরুতর রূপে পীড়াগ্রস্ত একথা তাঁহাকে কখনও বলিতে শুনি নাই! আমরা যতই ব্যাকুল হইতাম তাঁহাকে দেখিতাম, ততই শান্ত স্থির আনন্দময়—হয়ত বা কোন পুস্তকের প্রুফ দেখিতেছেন, না হয় কোন বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতেছেন, অথবা মঠের Trust deed-এর খসড়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সেই জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের হৃদয়ের অন্তস্তলে ভক্তির সুতীব্র রসধারা ফল্গুর জলধারার মতই গুপ্ত ছিল এবং যখন তিনি আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেন—

"ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী—
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী"

তখন নিকটে যাহারা থাকিত তাহাদের প্রাণও উদাস হইয়া উঠিত।

গত ১৫ই কি ১৬ই ভাদ্র (১৩৪৬) "বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু" প্রথম খণ্ড লইয়া যখন আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য নিকটে যাইয়া বসিলাম তখন উহা হাতে লইয়া তিনি বেতের ইজি-চেয়ারখানির উপর সহসা উঠিয়া বসিলেন এবং সহাস্য প্রসন্ন বদনে পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। দেখিলাম তাঁহার নয়নদ্বয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছে। ভাবিলাম—দাসের সেবা তিনি গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে অন্য দুই দিবস যখন সাক্ষাৎ হয় তখন "ধর্ম্মগুরু" বাহির হইতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন বলিয়া একটু উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, সেবা-গ্রহণের কাল তাঁহার ফুরাইয়া আসিতেছে!

সেদিন পুস্তকখানি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন—'যাহোক্ বৈ-ত বেরুল। ভাদ্র মাস যে যমের মাস তা' কি জান না?'

কথা শুনিয়া আমার হৃৎপিণ্ড দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল! দেখিলাম স্বামীজি-মহারাজ হাসিতেছেন—সেই সুন্দর হাসি—এই দুই বৎসর রোগভোগেব মধ্যেও যাহার বিরাম ছিল না। স্বামীজি-মহারাজের কথা শুনিয়া মনটা ছট্-ফট্ করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলাম—'মহারাজ, ভাদ্র মাস যমেব মাস—সে আমাদের জন্য। আপনার জন্য হ'লে আমরা কার কাছে দাঁড়াব!'

আবার সেই হাসি! কক্ষটি যেন হাসিব লহরে ভরিয়া উঠিল। সমুপস্থিত গুরু-ভ্রাতাদিগের মধ্যে কাহারও এক জনের হাতে বইখানি দিয়া বলিলেন—"আমার টেবিলের উপব বাখ।" যে টেবিলে তাঁহার প্রিয় গ্রন্থগুলি থাকিত, দীনের অর্ঘ্য সেই আসনে মর্য্যাদা লাভ করিল দেখিয়া আমি অন্তরে অন্তরে শতবার শ্রীচবণে মস্তক লুণ্ঠন করিলাম এবং কহিলাম—"মহারাজ আপনার অসুখ ব'লে এতদিন বিবক্ত করিনি। আপনি সেরে উঠুন—তখন আপনার কাছে ব'সে আপনার জীবন-কথা শুন্‌ব আর লিখ্‌ব।"

তিনি বলিলেন—"তোমাকে ত আমার ডায়েরি আর কাগজপত্র সব দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম—কাগজ কলম নিয়ে আমার কাছে রোজ এসে বোসো, আমি notes ব'লে ব'লে দেবো।"

কথাগুলি হাসিতে হাসিতেই বলিতেছিলেন—বলিয়াও হাসিয়াই উঠিলেন।

আমি লজ্জিত হইয়া কহিলাম—"এতদিন হয়নি, এইবার সময় ক'রে নেবো।"

সেই জীবন-কথাই লিখিতেছি বটে—কিন্তু সব হারাইয়া আ-জ—!

তখন অন্য কথা পড়িল। আমাদের মন সেই দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে যখন চরণধূলি লইয়া বিদায় হইলাম তখনও দেখিলাম, মহারাজ অনেক ভাল আছেন। রোগমুক্ত হইতে আর বিলম্ব নাই।

* * * *

২২শে ভাদ্র, শুক্রবার—১৩৪৬ সাল। প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মনে হইতেছিল যেন আজ সূর্য্যই উঠিল না! ঝর-ঝর করিয়া অনবরত বৃষ্টির ধারা ঝরিতেছিল এবং ছিন্ন মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে বাড়ন্ত-রবির ক্ষীণ ঝিকি-মিকি কখনও বা দুই একবার দেখা যাইতেছিল। বুঝিতে পারা যায় না যে তখন বেলা নয়টা হইয়া গিয়াছে। এমন সময় বন্ধু-দাসের নিকট হইতে পেন্‌সিলে লেখা এক টুকরা কাগজ আসিল—স্বামীজি-মহারাজ নাই—টেলিফোনের সংবাদ!

না—ই? কখনও কি সম্ভব? মিথ্যা মিথ্যা—নিশ্চয় মিথ্যা! টুকরা কাগজখানা দুই করে দলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম, তুলিয়া লইয়া আবার পড়িলাম—"মঠ হইতে এখনই ফোন্ আসিয়াছে—স্বামীজি-মহারাজ আর নাই!"

* * * *

মহারাজ—মহারাজ! এমনি করিয়া কি না বলিয়া-কহিয়া যাইতে হয়! দুই করে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সস্ত্রীক রেল-ষ্টেসনের দিকে ছুটিলাম। উঃ কত দীর্ঘ সে পথ—সে যে আজ আর ফুরায় না!

মঠে আসিয়া দেখিলাম—পথ, প্রাঙ্গণ, বারান্দা, সিঁড়ি, দ্বিতলে স্বামীজি-মহারাজের কক্ষ দুইটি লোকে লোকারণ্য। গৃহী, সন্ন্যাসী—বৃদ্ধ, বৃদ্ধা—যুবক, যুবতী—কাহারও হাতে ফুল, কাহারও করে মালা—কাহারও চোখে অনবরত জল ঝরিতেছে, কাহারও বা নয়ন অস্বাভাবিক

ভাবে উজ্জ্বল—যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সব জলটুকু নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে !

আমরা অতি কষ্টে ভিড় সরাইয়া প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দেখিয়াই শান্ত-মহারাজ (স্বামী সদ্রূপানন্দ) বলিয়া উঠিলেন —"সব শে-ষ" ! রবি-মহারাজ (ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য) বলিয়া উঠিলেন —"সব শে-ষ !—সব শে-ষ !" আমিও বলিয়া উঠিলাম—"হায় রে ! সবই শেষ !"

সম্মুখে কে ছিল তাহা দেখিবার আর অবকাশ হইল না—দুই হাতে পথ করিয়া স্বামীজি-মহারাজের শয়নকক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন তিল ধারণের স্থান ছিল না। কোনরূপে পালঙ্কের নিকটে যাইয়া—এ কি দেখিলাম ! গৌরী-শঙ্কর খসিয়া পড়িয়াছেন, ভাগীরথী শুকাইয়া গিয়াছেন—চাঁদের মালা ধূলায় লুটিতেছে, জ্ঞানের সূর্য্য দীপ্তিহীন—জাগ্রত-সচেতন বেদান্ত-কেশরী আজ নিদ্রিত—কর্ম্ম আজ সমাপ্তির আনন্দে আত্মহারা ! ছুটিয়া গিয়া দুইটি চরণের উপর মাথা রাখিলাম—তিনি নাই ইহাও বুঝিতে পারিলাম না, আছেনও জানিতে পারিলাম না—শ্রীপাদপদ্ম আমার চক্ষের জলে ভিজিতে লাগিল !—মহারাজ ! মহারাজ ! না বলিয়া-কহিয়া এমনি করিয়াই কি পলাইতে হয় !

কতক্ষণ কাটিল জানি না—হঠাৎ কোন একজনের ধাক্কা লাগিয়া আমি সরিয়া গেলাম এবং পশ্চাতে হটিয়া মহারাজের বদনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। ইহাকেই কি বলে মৃত্যু—না ইহা নিদ্রা ! ওইত যেন সেই হাসিটুকু খণ্ডিত চন্দ্রের মত ওষ্ঠপ্রান্তে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে ! স্বামীজি-মহারাজ কি তবে নিশ্চিন্ত মনে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন ? ওই ত তাঁহার রোগকাতর নয়ন দুইটি

এতদিনে নিদ্রাতুর—নিমীলিত—ওই ত দক্ষিণকর বক্ষোপরি অবিচ্ছিন্ন জপে নিযুক্ত। আর সেই দেহখানি? না-ই—একেবারেই অদৃশ্য—স্তবকে স্তবকে কুসুমার্ঘ্যের অন্তরালে কি জানি কি ভাবে আছে—ভক্তের নয়নাশ্রুতে সিক্ত হইবার জন্য শুধু চরণ দুইখানি শ্বেত ও রক্তপদ্মের পরাগ মাখিয়া পদ্মের আসনের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে! পালঙ্ক—শয্যা—উপাধান—প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত কক্ষতল কুসুমে কুসুমে সমাচ্ছন্ন—মালার উপর মালার রাশি ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর দেহের উপরে এবং পার্শ্বে স্তূপীকৃত। যেমন-যেমন এক একবার ভক্তের স্রোত আসিতেছে তেমনি-তেমনি তাঁহাদিগের অশ্রুসিক্ত শেষ কুসুমার্ঘ্য বৃষ্টির ধারার মত পালঙ্কে, শ্রীচরণে, কুট্টিমে পতিত হইতেছে। সকলের মুখেই এক কথা—"মহারাজ! মহারাজ! আমাদের মহারাজ!"

*　　*　　*　　*　　*

শুনিলাম বেলুড়-মঠে শব-সংকার হইতে পারে কিন্তু কোনও স্মারক প্রস্তরলিপি সেই সংকারের স্থানে রক্ষিত হইবে না! আরও শুনিলাম, স্বামীজি-মহারাজ অনেকবার বলিয়া গিয়াছেন—"ঠাকুরের পায়ের নীচে আমাকে জায়গা দিস্।" বেলুড়-মঠের পক্ষ হইতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, শুনিলাম তাঁহারা নাকি বলিয়াছেন—উহাও হইতে পারে না, সঙ্কীর্ণ স্থানে চিতানলের আঁচ লাগিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি- মন্দিরের কোন অনিষ্ট হইতে পারে এবং সেই কারণে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ আদেশে সে স্থানে আর নূতন কোনও শবদেহের সংকার হইবে না!

মঠের গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে কয়েকজন আমাকে আদেশ করিলেন—'বেলুড়-মঠের স্বামীজিদিগকে বুঝাইয়া রাজি কর—নতুবা দেখিতেছি নিমতলায় স্বামীজি-মহারাজের দেহের সংকার করিতে হইবে।'

সেই নিষ্ফল-চেষ্টায় কালহরণ না করিয়া 'জয়গুরু—জয়গুরু' বলিতে বলিতে গুরু-ভাই লক্ষ্মণ-মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কাশীপুর-মহাশ্মশানের দিকে ছুটিলাম! বলিয়া গেলাম; যতক্ষণ না ফিরি স্বামীজি-মহারাজকে যেন মঠের বাহিরে না লওয়া হয়। যেমন করিয়াই হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে তাঁহার শেষ অগ্নি-শয্যা রচনা করিব।

* * * * *

মহাপুরুষের কার্য্য মহাপুরুষ নিজেই করেন। অন্যে কেবল উপলক্ষ মাত্র। তাঁহাদিগের কামনা-সিদ্ধির পথে বাধা-সৃষ্টি করিতে পারে হেন সাধ্য কাহারও নাই। মানুষ ত দূরে কথা, অপরাজেয় প্রকৃতি পর্য্যন্ত নিজ শক্তির দুর্জ্জয়তা হারাইয়া মহাপুরুষের দাসী হয়, কারণ তাঁহার ইচ্ছা ও ভগবদিচ্ছা—এক ইচ্ছা। তাই মহাশ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকজন সম্পূর্ণ অপরিচিত বান্ধবের (১) সাহায্য লাভ ঘটিল।

কাশীপুর-মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে যে সাড়ে চারি হস্ত পরিমিত স্থান টুকু ছিল সেই স্থানে স্বামীজি-মহারাজের শেষ বিশ্রামশয়ন রচনা করিবার বিশেষ আদেশ (২) কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের নিকট হইতে লাভ করিয়া সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন বেদান্ত-মঠে ফিরিলাম তখন দেখিলাম স্বামীজি-মহারাজ শয়নকক্ষ

---

(১) রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২) শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল মজুমদার (৩) শ্রীযুত গিরীন্দ্রভূষণ রায় (৪) শ্রীযুত ইন্দ্রভূষণ বিদ্। ইঁহাদিগের সাহায্যেই কর্পোরেশনের বিশেষ আদেশ পাওয়া গিয়াছিল।

(২) *Please allow the cremation of Swami Abhedananda by the side of the memorial structure of Ramkrishna Paramhansa Deb as a special case.*

S/d. J. C. Mukerjee,
Chief Executive Officer, Corporation
of Calcutta.
৪. ৯. ৩৯.

হইতে নাটমন্দিরে নামিয়াছেন এবং সেই হাসির ম্লানরেখাটুকু তখনও মুখে ফুটিয়াই আছে !

তারপর ? তারপর আর লিখিতে পারিতেছি না,—স্বামীজি-মহারাজ মন্দিরের বাহিরে আসিলেন ! কে যেন আমার বক্ষে শেল হানিয়া গেল। ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িলাম—চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম।

"হরি ওঁ রামকৃষ্ণ—হরি ওঁ রামকৃষ্ণ" রবে সম্বিত ফিরিল। এতক্ষণে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলাম—আমাদের স্বামীজি-মহারাজ আর নাই ! (১)

মহারাজ ! মহারাজ ! এমনি করিয়াই কি ফাঁকি দিতে হয় ?

* * * * *

স্বামীজি-মহারাজ শেষ-শয়নের জন্য অগ্রসর হইলেন। আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। কতলোক গিয়াছিলাম বলিতে পারি না, কারণ যতই অগ্রসর হইলাম ততই লোকের ভিড় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মনে আছে শুধু স্বামীজি-মহারাজের সেই বিদেশিনী ইউরোপীয় শিষ্যা সাবিত্রী দেবীর কথা। তিনি প্রতিদিন যেমন গুরুদর্শনে আসিতেন, সেদিনও প্রভাতে ফুল লইয়া তেমনি আসিয়াছিলেন। মঠে আসিয়া যখন দেখিলেন, গুরুদেব অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন তখন মঠের মেজেতে পড়িয়া আকুল হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতেই বেদান্ত-মঠ হইতে কাশীপুর—সেই সুদীর্ঘপথ নগ্নপদে অতিবাহন করিলেন। যে স[illegible] মোটর-গাড়ী শবানুগমন করিতেছিল তাহারই কোনও এক

(১) ১৩৪৫ সালের ফাল্গুন মাসে স্বামীজি-মহারাজ "বেদান্ত মঠ দেবোত্তর করিয়া দেওয়ার পর...... সর্ব্বদাই বলিতেন—'আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। সব ঠাকুরকে দিয়াছি, তিনিই সব চালাইবেন।" "দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বদিন (২১শে ভাদ্র, ১৩৪৬) সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিছুই বুঝা যায় নাই। সন্ধ্যার সময় হইতে জ্বর হয় এবং তাহা ১০৪° পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর কমিয়া সমস্ত রাত্রি ১০১° থাকে।...সকালের দিকে দেখা গেল একটু ভাল।" ভোরের সময় তিনি উঠিয়া বসিয়া জল পান করিলেন এবং ৮টা ৩০ মিনিটের সময় "মহাসমাধিতে মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রয়াণ" করিলেন। সমস্ত জীবন তিনি যেমন সহজ ভাবে কাটাইয়াছেন তেমনি সহজভাবেই লীলা সম্বরণ করিলেন।"—বিশ্ববাণী, সংঘবার্ত্তা—আশ্বিন, ১৩৪৬।

খানিতে তাঁহাকে বারবার উঠিতে বলা হইল। তিনি কাঁদিতেই লাগিলেন, গাড়ীতে উঠিলেন না। সকলের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"হরি ওঁ রামকৃষ্ণ! হরি ওঁ রামকৃষ্ণ!"

আমরা কাশীপুরে আসিলাম। তখনও অনেকেই জানিতেন যে, বরাহনগরে গঙ্গাপার হইয়া বেলুড় যাওয়া হইবে। প্রায় সাতটার সময় যখন কাশীপুর মহাশ্মশানে প্রবেশ করা হইল তখনই লোকে বুঝিতে পারিল, স্বামীজি-মহারাজের বিশ্রাম-স্থলে আসিয়াছি। বলিতে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তখনও আপত্তি উত্থাপিত হইল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-মন্দির আগুনের তাপে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং সেখানে শব-সৎকার হইতেই পারে না!

আপত্তি প্রবল হইতে পারিল না কারণ কর্পোরেশনের "বিশেষ আদেশ" আমাদিগের সঙ্গে ছিল। স্মৃতি-মন্দির যাহাতে কোনরূপ নষ্ট না হয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ মত সে ব্যবস্থা করিয়া বাখিয়াছিলেন।

রাত্রি তখন প্রায় নয়টা—মহাশ্মশানের প্রাঙ্গণ তখন নর-নারীতে এমন ভাবেই পূর্ণ হইয়াছে যে, চলিবার ফিরিবারও আর স্থান নাই। 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে শ্মশানভূমি কম্পিত হইতে লাগিল—সে ধ্বনি উচ্ছ্বসিত জাহ্নবীর জলভঙ্গরবের সঙ্গে মিশিয়া পরপারে বেলুড়ের পার্শ্ব দিয়া দূর দূরান্তরে ভাসিয়া গেল। শ্মশানের পশ্চাৎ ভাগে তখন ঘন ঘন মৃদঙ্গরোলের সঙ্গে সুমধুর হরিনামের বন্যা বহিতেছিল এবং পুরো-ভাগে পূর্ণকলেবরা ভাগীরথীর তরঙ্গের পর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ শ্মশানের তটে এক একবার আহত হইয়া শত শত খণ্ডে চতুর্দ্দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল!

তপ্ত জিহ্বাগুলি মেলিয়া যখন ঘৃতনিষিক্ত চন্দনকাষ্ঠ হোমানলের

ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তখন দেখিলাম, যেদিকে বহু ভদ্রমহিলা যুক্তকরে দণ্ডায়মানা ছিলেন—সাবিত্রী দেবীও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া—যেন একখানি পাষাণ-প্রতিমা। অসংখ্য জ্যোতিঃসূত্রে-সমাচ্ছাদিত স্বামীজি-মহারাজের আরক্ত চরণ-যুগলের উপর তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—বহির্জ্জগৎ যেন তাঁহার নিকট হইতে তখন একেবারেই অপসৃত হইয়াছিল!

* * * *

হোমানল আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঊর্দ্ধদিকে তীব্র শিখাগুলি মেলিতে লাগিল,—সেই অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল মানবধর্ম্মগুরু ভারতের অপূর্ব্ব মনীষার সমুজ্জ্বল একটি প্রতীক! আমরা মূক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, আর সজলনেত্রে চাহিয়া রহিল ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের ইতস্ততঃ বিরল-ছেদের ভিতর দিয়া রজনীর তৃতীয় প্রহরের কয়েকটি নিদ্রাহারা বেদনা-কাতর নক্ষত্র!

ওম্

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শ্রীমৎ নিগমানন্দ সরস্বতী

শ্রীমৎ পরমহংস সরস্বতী নিগমানন্দ

(১)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবীদূত সংবাদঃ।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেব্যাস্তুতিঃ।

সে আজ কিঞ্চিৎ অধিক চল্লিশ বৎসরের কথা—একটি সুগঠিত হিরণ্ময়দেহ ব্রাহ্মণযুবক শয্যায় বসিয়া জমিদারীর কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। অদূরে টেবিলের উপর যে টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিতেছিল তাহার উজ্জ্বল আলোক যুবকের গৌর নগ্নদেহ, কুঞ্চিত কেশকলাপ এবং আনত বদনমণ্ডলের উপর পতিত হওয়ায় তাঁহাকে পরম সুন্দর দেখাইতেছিল। দীপশিখা সহসা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইতেছে দেখিয়া তিনি কাগজ-পত্রের উপর হইতে চক্ষু সরাইয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলেন, টেবিলের পার্শ্বে তাঁহার পত্নী সুধাংশুবালার ছায়ামূর্ত্তি দণ্ডায়মানা! সুধাংশুবালা যখন স্বামীর সহিত জমিদারের নারায়ণপুর-কাছারি-বাড়ীতে বাস করিতেন তখন অনেক সময়েই টেবিলের পার্শ্বে যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়া কর্ম্মলিপ্ত স্বামীর সহিত কথাবর্ত্তা কহিতেন, ঠিক

সেই স্থানেই তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া যুবক সুপারভাইজর নলিনীকান্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং চীৎকার করিয়া উঠিলেন!

রাত্রি তখন মাত্র ৮টা; পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির দিনাজপুব জেলার কাছারি-বাড়ীতে তখন লোক-জনের অভাব ছিল না। নলিনীকান্তের চীৎকারে অনেকে ছুটিয়া আসিল এবং সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল—ও কিছু নহে, সাময়িক ভ্রম মাত্র। এই ত মাত্র দুই-তিন মাস পূর্ব্বেই তিনি পত্নীকে নিজ পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাব কুশলসংবাদও পাইয়াছেন। তবে আর বৃথা অমঙ্গলের আশঙ্কা কেন? নলিনীকান্ত তখনকার মত নিজেকে সামলাইয়া লইলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

বাল্যকাল হইতেই নলিনীকান্ত ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের। দেব-দ্বিজে বিশ্বাসহীন, পরকাল ও পুনর্জন্মে আস্থাশূন্য, এবং জাত্যভিমান-বিবর্জ্জিত। কেহ যাহাকে স্পর্শ করিত না, নলিনীকান্ত তাহার সেবা করিতেন, কেহ যে শবের সৎকার করিতে অগ্রসব হইত না—নলিনীকান্ত তাহা স্কন্ধে বহিতেন। আভিজাত্যের গৌরব অপেক্ষা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেবা-ধর্ম্মই ছিল তাঁহার নিকট অধিক আদরণীয়। তিনি মিথ্যার ধার ধারিতেন না। সর্ব্ব প্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিবার অপরাধে কুতুবপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাকে একজন জীবন্ত 'কালাপাহাড়' বলিয়াই মনে [illegible]রিত। সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সর্ব্বদা বিদ্রোহ করিতে দেখিয়া গ্রামের লোকেরা মনে করিত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের এই পুত্রটি দুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া অত্যন্ত দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছে! পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে পর্য্যন্ত মানে না—মুখের উপর শুনাইয়া দেয়। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট—কাহারও কোন অন্যায়

দেখিলেই যে নলিনীকান্তের হৃদয় আগ্নেয়পর্ব্বতের মত তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিত, লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না। প্রথমে পাঠশালায় এবং পরে দরিয়াপুরের মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া নলিনীকান্ত ওভারসিয়ার হইলেন এবং কিছুদিন দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের অধীনে ওভারসিয়ারি করিয়া শেষে রাণী রাসমণির নারায়ণপুর কাছারি-বাড়ীতে সুপারভাইজর হইলেন। অন্য কর্ম্মচারীরা দেখিল, নূতন সুপারভাইজর বয়সে নবীন—বুদ্ধিতে প্রবীণ, কর্ম্মে অনলস, সাধুতায় ও চরিত্রে আদর্শ পুরুষ। নলিনীকান্ত ছিলেন সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম-চন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। সুযোগ পাইলেই তিনি কলিকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আসিতেন এবং তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে তর্ক বাধাইয়া দিতেন। সাহিত্য-সম্রাটের এবং নিজ জননীর স্বর্গারোহণে তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত নলিনীকান্ত সে বেদনা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইত—এই ত দেহ, আর তাহার এ-ই পরিণতি! নলিনীকান্তকে একান্ত আন্‌মনা দেখিয়া পিতা ভুবনমোহন একটি সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। বৃক্ষ যেমন শতবাহুবেষ্টনে ভূমিকে জড়াইয়া ধরে, মাতৃহীন নলিনীকান্তের হৃদয়ও ঠিক সেইরূপ করিয়াই পত্নীকে জড়াইয়া ধরিল। নলিনীকান্ত তাহার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের সাধনায় পত্নীকে ডুবাইয়া দিলেন, নিজেও ডুবিলেন। অহরহঃ মনে হইতে লাগিল—

জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল।

সেই প্রেমময়ীর ছায়ামূর্ত্তি যখন নয়নে পড়িল তখন কে যেন নলিনীকান্তের হৃদয়ে একটি তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। এরূপ অবস্থায় যে সাধারণ সংস্কার আছে তাহাই তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল—তবে কি সুধাংশুবালা নাই? যাইবার আগে ছায়ার মত দেখা দিয়া চিরদিনের মত লুকাইল!

শারদোৎসব আসিতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি ছিল। কোন রূপে সেই কয়েকটি দিন নারায়ণপুরে কাটাইয়া নলিনীকান্ত গৃহে যাত্রা করিলেন। চুয়াডাঙ্গা রেল-ষ্টেশন হইতে কুতুবপুর—সুদীর্ঘ ৮ ক্রোশ পথ। যতই কুতুবপুর নিকট হইতে লাগিল পথ ততই যেন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল—কিছুতেই আর শেষ হয় না! নলিনীকান্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পথে অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিছু কহিল না—কেহ বা নীরবে সঙ্গ লইল—কেহ বা শুধু একবার মুখের দিকে চাহিল মাত্র। জনশূন্য জীর্ণ পরিত্যক্ত গৃহের মুক্ত দ্বার যেমন কাল-বৈশাখীর আঘাতে নিরন্তর ঝট্-পট্ করিতে করিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়—গ্রামবাসীদিগের অস্বাভাবিক মৌনভাবও তাঁহার ব্যথিত হৃদয়কে তেমনি করিয়া তুলিল। তিনি উভয়করে বক্ষ চাপিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—সুধাংশুবালা নাই। কক্ষে, কক্ষান্তরে, অঙ্গনে—ভিতরে-বাহিরে কোথাও নাই! না—ই? বিশ্বাস হইল না। আবার খুঁজিলেন, তখনও দেখিলেন নাই—সত্যই নাই! ভৈরবনদের অশ্রান্ত কলধ্বনির মধ্যে সে হেমপ্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছে! নলিনীকান্ত কাঁদিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। চক্ষে জল আসিল না। তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। শুধু এই কথাই মনে পড়িতে লাগিল—সবই আছে, শুধু সে নাই। সেই গৃহ, সেই শয্যা, সেই তাঁহার বসন, সেই তৈজস-পত্র সবই আছে—শুধু সে-ই নাই!

গ্রামে পূজার অঙ্গনে তখন শানাইয়ে যে আগমনী বাজিতেছিল, নলিনী-কান্তের কর্ণে তাহা বিষ ঢালিয়া দিল।

নলিনীকান্ত শুনিলেন, তিন দিনের জ্বর ভোগ করিয়া সুধাংশুবালা অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। জ্বরে যখন তিনি সংজ্ঞাহীনা তখনও কেহ কানের কাছে নলিনীকান্তের নাম করিলে সুধাংশুবালার মুদিত কমল ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিয়া আকুলভাবে চারিদিকে চাহিত।

নলিনীকান্ত ভাবিতে লাগিলেন—সে নাই, কিন্তু তাহার ছায়ামূর্ত্তি ত আছে—না থাকিলে দেখা দিবে কেন? তবে কি পরলোক আছে? গভীর নিশীথে শুনিলেন কে যেন মৃদুপদক্ষেপে দূর হইতে তাঁহার দিকেই আসিতেছে,—চরণবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ঝুনুর্-ঝুনুর্ করিয়া ঘুংঘুর বাজিতেছে—সুধাংশুবালা হাঁটিলে যেমন করিয়া তাঁহার পাদাঙ্গুলীর ঘুংঘুর বাজিত সেইরূপ! ওই—ওই—বাজিতেছে! নলিনীকান্ত সমস্ত হৃদয় মন নয়নে আনিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ওই—ওই—বাজিতেছে। নিকটে, আরও নিকটে—কৈ? সে কৈ? তাঁহার হৃদয়ে শেল হানিয়া সহসা সে ঘুংঘুর-শিঞ্জন থামিয়া গেল! নাই—আর নাই—আর ত শোনা যায় না! একি সত্যই একটা শব্দ—না ভোজবাজী? পরলোক যে আছে, মৃত্যুই যে মনুষ্যজীবনের শেষ নহে, নলিনীকান্তের মন তখনও তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। কয়েকদিন পরে সন্ধ্যার সময় গ্রাম্যপথে আসিতে আসিতে তিনি দেখিলেন, পথিপার্শ্বে একটি বৃক্ষের নিম্নে তাঁহার পত্নীর ছায়া-মূর্ত্তি! নলিনীকান্ত দেখিলেন—আবার দেখিলেন—আবার দেখিলেন। সে-ই—সে-ই, এ যে সে-ই তাঁহার মনোহারিণী দেবীমূর্ত্তি, কিন্তু মলিনা—যেন "কুসুম সুখাএ রহল আছ বাস"—যেন "বাসি নিমালিনী মালা"—"দিবসে মলিন জনি চাঁদক রেহা।"

দেখিতে দেখিতেই মূর্ত্তি অন্ধকারে মিশাইল। নলিনীকান্ত আর দেখিতে পাইলেন না। তখন সঙ্কল্প করিলেন, পরলোকতত্ত্ববাদিদিগের নিকট গিয়া পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। তিনি শুনিলেন কলিকাতায় থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে পরলোকতত্ত্ব আলোচিত হয়। কলিকাতায় আসিবার সুযোগও ঘটিয়া গেল। তিনি নারায়ণপুরে আসিয়াই শুনিলেন, খুলনা জেলার কুমিরা কাছারিতে বদলি হইয়াছেন। নলিনীকান্ত খুলনার পথে কলিকাতায় আসিয়া থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহিত পরিচিত হইলেন। সেখানে শুনিলেন, প্রেততত্ত্ব ভাল ভাবে গবেষণা করিতে হইলে মান্দ্রাজ-আডেয়ারে রেভারেণ্ড লেড্‌বিটার সাহেবের নিকট যাইয়া উপদেশ লইতে হইবে।

নলিনীকান্ত আডেয়ারে আসিয়া কিছুদিনের জন্য লেড্‌বিটার সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মিডিয়ামের সাহায্যে প্রেতাত্মা আনয়নের কৌশলগুলিও আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ হইল না। কারণ তিনি চাহিতেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মাত্মার সহিত আলাপ। নলিনীকান্ত মাদ্রাজ হইতে ভগ্নমনে কর্ম্মস্থল কুমিরায় ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু জমিদারীর কাগজ-পত্র আর আগেকার মত তাঁহাকে টানিতে পারিল না। তিনি জীবনে এই প্রথম সাধু-সন্ন্যাসিদিগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এতদিনে তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস আসিল যে, যোগবলে সবই সম্ভব। একদিন যখন শুনিলেন, কলিকাতার ডাফ্‌কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত পরম যোগী হইয়া স্বামী পূর্ণানন্দ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তখনকার মত কলিকাতায় আছেন, তখনই কলিকাতায় ছুটিলেন—জমিদারী-হিসাব-নিকাশের কাগজ-পত্র কুমিরার সেরেস্তায় পড়িয়া রহিল। জীবিতা সুধাংশুবালার আকর্ষণ অপেক্ষা পরলোকাশ্রিতা

সুধাংশুবালার আকর্ষণ তখন এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি আর দণ্ডমাত্রও স্থির থাকিতে পারিলেন না। পণ করিলেন—পাইতেই হইবে, যেমন করিয়া হউক সেই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় সুধাংশু-বালাকে পাইতেই হইবে—সে যে ছায়ামূর্ত্তি ধরিয়া বার বার তাঁহাকে দেখা দিয়া মিলনের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিতেছে—সে যে বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ছুটিয়া ছুটিয়া তাঁহারই কাছে আসিতেছে—মরিয়াও ত সে শান্তি পায় নাই—বিস্মৃতির সাগরে ত ডুবিয়া যায় নাই। সে ত হারায় নাই—আছে—আছে—সে আছে।

নলিনীকান্ত কলিকাতায় আসিয়া পূর্ণানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সনির্ব্বন্ধে কহিলেন—"হে তপস্বি! আমার নয়নের মণি সুধাংশুবালাকে আনিয়া দেখাও।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"তাহা ত সম্ভব নহে যুবক! যে যায় সে কি আর আসে? তোমার সুধাংশুবালা নাই!"

নলিনীকান্ত বলিলেন—"নাই? অসম্ভব। সে যে ছায়ামূর্ত্তিতে কতবার আমাকে দেখা দিয়াছে। সে আছে—নিশ্চয়ই আছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"সে আর নাই ইহা ঠিক্—তবে মা আছেন। তুমি তাঁহাকেই দেখিয়াছ।"

"মা কে?"

"জগজ্জননী। শোননি কি তিনি 'সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে?' এই যে কোটি কোটি জগৎ, কোটি কোটি বস্তু—এই যে 'সর্ব্ব' এ সবই মার বিকাশ, তাঁর এক একটি স্থূল দেহ। তিনি লীলাময়ী। যখনই ইচ্ছা করেন তখনই বাহিরের প্রকাশটিকে সংহরণ ক'রে নিজের মধ্যে মিশিয়ে ফেলেন। তাই বল্‌ছি, তুমি জগজ্জননীর পূজা কর।"

নলিনীকান্ত তীব্র কণ্ঠে কহিলেন—"আমি জগজ্জননীকে চাই না—দেব-দেবীতে আমার বিশ্বাস নাই।"

সন্ন্যাসী মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন—"তুমি না চাইলে কি হয় যুবক? মা যে তোমাকে সর্ব্বদাই চান। তুমি আর তিনি কি ভিন্ন? তাইত শুম্ভ-বধের পর দেবগণ মার স্তুতি গাইতে গাইতে বলেছিলেন—'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা'—এই জগতের আধার-শক্তিরূপিণী তুমি জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী —'বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া',—বিশ্বের অসংখ্য কোটি পরমাণু তোমাতেই অবস্থিত আছে তাই তুমি 'অনন্তবীর্য্যা'। কিন্তু যখনই মায়া-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হও তখনই সমস্ত বিশ্বকে সম্মোহিত করিয়া রাখ—তুমি 'পরমাসি মায়া', 'সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ।' সুধাংশুবালারূপে তুমি মার মায়িক মূর্ত্তি দেখেছ, সুধাংশুবালাকে দেখনি—সুধাংশুবালা ব'লে কেহ ছিলও না—কেহ নাইও। দেবতারা আরও স্পষ্ট ক'রেই বলেছিলেন—'সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ'—যা কিছু দেখি তা' তোমারই (ভেদাঃ) বিভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' 'বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র তুমিই পরম পুরুষ, আর 'সমস্তরূপে' (অর্থাৎ) জগৎরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, সে সমস্তই স্ত্রী—সে সমস্তই তোমার প্রকৃতি, তোমার শক্তি, তোমার ইচ্ছা, তোমার ব্যবহার। সমস্তরূপে (জগৎরূপে) যা' কিছু প্রতীতিগোচর হয় সে সবই চৈতন্যরূপে, অস্তি-ভাতিরূপে, সত্ত্বারূপে তোমারই 'কলা' বা অংশের সঙ্গে নিত্য বিদ্যমান (সকলা)। তাই ত মা, 'ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ'—এ বিশ্ব একা তোমার দ্বারাই মাতৃরূপে পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে—তুমি ছাড়া কেউ নাই, কিছু নাই। 'কা তে স্তুতিঃ'—কি ব'লে তোমার আর স্তব কর্‌বো মা, তুমিই যে সব—তুমি যে তাই সকল স্তব-স্তুতির পরপারে—'স্তব্যপরা'—কি আর নূতন আছে মা, যা' ব'লে তোমার স্তব কর্‌বো—তুমি যে মা "পরোক্তি"—বাক্য-মনের

অগোচর তুমি, তোমাকে স্তব কর্‌বার বাক্য কৈ? ভাষা কৈ? তাই বলি সেই 'স্তব্যপরা' 'পরোক্তি' বিশ্বমাতার সাধনা কর, তাঁকেও পাবে—আর যাকে তুমি সুধাংশুবালা ব'লে মনে কর তাকেও পাবে।"

নলিনীকান্তের মনে হইল তিনি যেন একটা পথ পাইলেন। কহিলেন—"তাঁকে পাই বা না পাই কিছু আসে যায় না, সুধাংশুবালাকে ত পাবো?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"নিশ্চয়। দুই-ই পাবে। একরূপে মা, অন্য রূপে সুধাংশুবালা।"

নলিনীকান্ত কহিলেন—"দয়া ক'রে তবে আমাকে সাধন-মন্ত্র দিন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি ত তোমার গুরু নই। গুরুর সন্ধান কর, তিনি তোমায় দীক্ষা দিবেন।"

সেই দিন হইতে গুরুর সন্ধান আরম্ভ হইল।

(২)

'কৈ গুরু! কোথায় গুরু! এসো—কেমন করিয়া সাধনা করিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দাও'—দিবানিশি এই চিন্তা করিতে করিতে নলিনীকান্ত নানা স্থানে ঘুরিলেন। কিন্তু 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ'—তিনি ত পত্র-পুষ্পের মত সহজলভ্য নহেন, কাজেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না। নলিনীকান্তের আকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গুরু-বিহনে জীবন যখন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল তখন একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তিনি সহসা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়াই দেখিলেন—সম্মুখে জটাজূটমণ্ডিত একজন সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী কহিলেন—"এই দীক্ষা লও।" নলিনীকান্ত যন্ত্রচালিতবৎ বাহু প্রসারণ করিবামাত্র সন্ন্যাসী তাঁহার করে একটি বৃক্ষপত্র প্রদান করিয়া নিমেষে অন্তর্হিত হইলেন। নলিনীকান্ত ক্ষিপ্রকরে দীপ জ্বালিয়া দেখিলেন, একটি বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে বীজমন্ত্র

লিখিত আছে। কিরূপে সেই মন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে তাহা জানিবার জন্য তিনি বার বার ডাকিলেন—"সন্ন্যাসি! সন্ন্যাসি!" কেহ কোন উত্তর দিল না। বিল্বপত্রটি লইয়া নলিনীকান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন। পরদিন কুমিরায় কাছারি-বাড়ীর আমলাবর্গ গত রাত্রির বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝাইতে লাগিলেন—'ও কিছু নয়, মনের ভ্রম মাত্র। লোকে স্বপ্নে অমন কত কি পায়।' নলিনীকান্তের মন এই প্রবোধবাক্যে শান্ত হইল না। তিনি বিল্বপত্রটি সযত্নে রক্ষা করিয়া মন্ত্রের সাধনোপায় জানিবার জন্য নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও মনোরথ সিদ্ধ হইল না। যোগ্য গুরু পাইবার আশায় তিনি কাশীতে আসিলেন—ঘাটে ঘাটে, পথে পথে, আশ্রমে আশ্রমে কতই ঘুরিলেন—সাধু-সন্ন্যাসীও অনেক দেখিলেন কিন্তু সেই বীজমন্ত্রের সাধনোপায় কেহ বলিতে পারিল না। নলিনীকান্ত তখন সঙ্কল্প করিলেন পরলোকতত্ত্ব যখন অজ্ঞাতই রহিয়া গেল তখন ভাগীরথীগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। তাহা হইলে মৃত্যুর পর পরলোকে তাঁহার বাঞ্ছিতরত্ন মিলিবে—সুধাংশু-বালাকে নিশ্চিতই পাইবেন। জীবনত্যাগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যখন তিনি অবসন্নদেহে গঙ্গার ঘাটে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন তখন স্বপ্নে দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিকটে আসিয়া স্নেহ-করুণ-কণ্ঠে কহিলেন—'যুবক! প্রাণত্যাগ করিবে কেন? আত্মহত্যা মহাপাপ। তুমি বীরভূমির তারাপীঠে যাও। সেখানে সিদ্ধ সাধক বামা-ক্ষ্যাপাকে পাইবে। তিনি কৃপা করিলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।'

কালবিলম্ব না করিয়া নলিনীকান্ত তারাপীঠে আসিলেন। সে এক মহাশ্মশান। সে শ্মশানে চিতার অনল নির্ব্বাপিত হয় না। সেই অনির্ব্বাণ চিতানল প্রদক্ষিণ করিয়া উলঙ্গ বামা-ক্ষ্যাপা দুর্দ্দান্ত ভৈরবের মত ঘুরিয়া বেড়ান এবং এক একবার গর্জ্জন করেন—"তারা! তা—রা—!"

সে গর্জ্জন কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র লোকে স্তম্ভিত হইয়া যায়। ভয়ে কেহ শ্মশানের দিকে অগ্রসর হয় না।

শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতেই নলিনীকান্ত দেখিতে পাইলেন একটি হরিদ্রা-করবী গাছের শাখা ধরিয়া জটাভারমণ্ডিত একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন—যেন একটি জীবন্ত শঙ্কর। তাঁহাব নয়ন তুইটি অগ্নি-পিণ্ডবৎ জ্বলিতেছে। নলিনীকান্ত ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় সেই শঙ্করের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন!

* * * *

বামা-ক্ষ্যাপা ছিলেন আশুতোষ। নলিনীকান্তের করে শ্রীশ্রীতারা-মাতার বীজমন্ত্র দেখিয়া তিনি প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া মহাশক্তির সাধনার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কহিলেন—"শক্তি ত তোব মধ্যেই আছে। আগে তাকে জাগিয়ে তোল্ তবে ত শক্তিময়ীর সাধনায় সফল হবি।" যোগীগুরুর কৃপায় নলিনীকান্তেব হৃদয়ে শক্তি-সাধনার বল প্রতিদিন জাগ্রত হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরু সকল আয়োজন করিয়া শিষ্যকে লইয়া শ্মশানে চলিলেন এবং কিরূপে শব-সাধনা করিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিয়া কহিলেন—"কোন ভয় নাই। হাজার হাজার বিকট উপদ্রব এসে দেখা দিবে! কিছুতে টলিস্ না। মার মন্দিরে ব'সে আমি তোর জন্য প্রার্থনা করব। জীবন পণ ক'রে আজ সারারাত সাধনা কর্। তোর সিদ্ধিলাভের দিন আজ, এ কথা যেন ভয় পেয়ে ভুলিস্‌নে। বেটি কি সহজে দেখা দেয়—জোর ক'রে টেনে আন্‌তে হয়! তবে সে আসে। ভূত প্রেত, ডাকিনী যোগিনী পাঠিয়ে দিয়ে সাধককে তাড়াতে পার্‌লে সে ছাড়ে না! মাভৈঃ। আমি আছি উত্তর-সাধক। এক মনে লেগে যা!"

শিষ্যকে আসনে স্থাপিত করিয়া ক্ষ্যাপা 'তারা—তা—রা' বলিয়া

ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান করিলেন। শ্মশানভূমি অসহ্য নীরবতায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বাতাসও বুঝি সেখানে বহে না—আকাশের তারাও বুঝি সে শ্মশানের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহে না! কি বিকট ভীষণ ঘন অন্ধকার সেখানে—মনে হয় যেন পুঞ্জীভূত অন্ধকারে শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে! তাহা হইলে কি হয়? পরলোকের সুদৃঢ় বহিঃপ্রাচীর চূর্ণ করিয়া সুধাংশুবালাকে যে উদ্ধার করিতেই হইবে—নলিনীকান্ত ধ্যানে বসিলেন।

একটার পর একটা করিয়া উপদ্রব আসিতে লাগিল। কি বিকট—কি ভীষণ—কি লোমাঞ্চকর সে সকল দৃশ্য! তাহা দেখিলে অতি বড় বীরের হৃদয়ও বেতসপত্রের মত কম্পিত হইয়া উঠে।

মাঝে মাঝে কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল ক্ষ্যাপার তীক্ষ্ণ গম্ভীর উচ্চ কণ্ঠস্বর—'মাভৈঃ মাভৈঃ!' সে স্বর যেন ঘনপ্রাবৃটের বজ্রের মত বাজিয়া উঠিতে লাগিল—এক একবার কাল-বৈশাখীর গর্জ্জনের মত শ্মশানের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল!

ক্ষ্যাপার হুঙ্কার নলিনীকান্তের হৃদয়কে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি নিবিষ্টচিত্তে জপ করিতে লাগিলেন।

জপ করিতে করিতে হঠাৎ একবার চক্ষু চাহিলেন। এ কি এ? এত আলোক! উজ্জ্বল তীব্র স্থির জ্যোতির একটা প্রস্রবণ যেন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারই সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া শতধারে ঝরিয়া পড়িতেছে!

বিস্মিত সাধক নির্নিমেষ নয়নে সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি জীবন ভুলিলেন, তিনি মৃত্যু ভুলিলেন। তিনি সংসার ভুলিলেন, তিনি শ্মশান ভুলিলেন। মন-প্রাণ সেই আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিল। দেখিলেন জ্যোতিঃ-ঝর্ণাধারা ক্রমেই ঘন হইতেছে। আরও ঘন—ওই আরও ঘন! উহা শেষে মানবীর আকার লইল। ক্রমে চরণযুগল, বাহুযুগ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে লাগিল।

মানবী ক্রমে দেবীর রূপ ধরিলেন। দেবী—দে—বী! কে এ দেবী? নলিনীকান্ত চিনিলেন এ যে তাঁহারই সুধাংশুবালা। আহা মরি মরি! পরলোকে গেলে কি রূপ এতই বাড়ে!

নলিনীকান্ত বিগলিত হৃদয়ে কহিলেন—"সুধাংশুবালা! তুমি এসেছ? এত রূপ কোথায় পেলে সুধাংশুবালা?"

দেবী কহিলেন—"আমি সুধাংশুবালা নই, আমি তা—রা!"

চমকিত কণ্ঠে নলিনীকান্ত কহিলেন—"তুমি—তু—মি—তা-রা! কৈ গুরুদেব ত তোমার এমন মূর্ত্তির কথা বলেন নাই? বল—বল—সত্য বল—তুমি কি সুধাংশুবালা নও? আমি যে তাকেই চাই—!"

উত্তর হইল—"না আমি সুধাংশুবালা নই—আমি তারা। তোমার ইষ্টদেবী।"

কম্পিতকণ্ঠে নলিনীকান্ত বলিলেন—"কি বল্‌লে? আমার ইষ্টদেবী তারা? তবে সুধাংশুবালার রূপ নিয়ে এসেছ কেন?"

দেবী বলিলেন—"তুমি যে সেইরূপেই আমায় চেয়েছ। ভক্ত যা, চায় আমি তাকে তা-ই দিই। অনন্ত রূপ আমার—যখন যা' ইচ্ছা আমি তাই ধরি—নৈলে ভক্তের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হ'বে কেন? আমি তোমার সাধনায় তুষ্ট হয়েছি। বর চাও সাধক! বর চাও। তুমি যা' চাইবে—তা-ই পাবে।"

জড়িতকণ্ঠে নলিনীকান্ত কহিলেন—"কি আর চাইব—তা'ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যদি তুমি সত্যই আমার ইষ্টদেবী, তবে এই বর দাও,—যখনই তোমায় ডাক্‌ব, তুমি তখনই আমার এই মনোহারিণী সুধাংশু-বালার মূর্ত্তি নিয়ে এসো।"

দেবী কহিলেন—"তথাস্তু। তবে আমি যাই।"

ব্যাকুল হইয়া নলিনীকান্ত কহিলেন—"যাবে? না—না যেও না।

একটু দাঁড়াও। তুমি বল্‌ছ তুমি আমার ইষ্টদেবী—তবে ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি আমায় একবার দেখাও।"

দেবী একটু হাসিলেন, যেন শিশিরসিক্ত শেফালী ঝরিয়া পড়িল। কহিলেন—"সে রূপ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে?"

ব্যগ্র কণ্ঠে নলিনীকান্ত কহিলেন—"হাঁ পার্‌ব।"

উত্তর হইল—"তবে দেখ।"

অমনি ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময়ী সুধাংশুবালা নিস্তরঙ্গ জ্যোতিঃসাগরে বিলীনা হইলেন। ধীরে ধীরে একটি জ্যোতির্মণ্ডল মহাশূন্যে গঠিত হইয়া উঠিল। নলিনীকান্ত দেখিলেন, সেই মণ্ডলের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া সুপ্রকাশিতা হইলেন—প্রত্যালীঢ়পদা কালহৃদয়সংস্থিতা ফুল্লেন্দীবর-লোচনত্রয়যুতা কর্ত্রী-খড়্গধারিণী সর্পাদিবেশোজ্জ্বলা সদ্যশ্ছিন্ননরমুণ্ডমালিনী দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা ভীমবদনা শ্রীশ্রীতারা!

সেই দুঃসহদর্শনে নলিনীকান্ত হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন!

উত্তরসাধক বামা-ক্ষ্যাপার গভীর নিনাদ আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া ধ্বনিয়া উঠিল—"মাভৈঃ মাভৈঃ।"

(৩)

চাহিবার মত করিয়া জগজ্জননীর নিকট যে যাহা চায় সে তাহাই পায়—মা যে বৃদ্ধিকারিণী ও সিদ্ধিস্বরূপিণী, তিনি কল্যাণী—"কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কূর্ম্মো নমোমঃ।" "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে আমাকে যে-ভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই ভজি। শুধু সাধকের ভজনায় কিছু হয় না—সাধকের তীব্র ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি যদি সাধককে ভজনা করেন তবেই সাধক তাঁহাকে পায়—"যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈবলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে

তনূং স্বাং।" ঋষিগণ পঞ্চবিধ ভাবে উপাসনা করিবার আদেশ দিয়াছেন—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর। বৈষ্ণব-মহাপ্রভুগণ মধুর ভাবের উপাসনা-পদ্ধতিকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন—অন্য চারিটি "এহ বাহ্য" বলিয়া মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মধুর ভাবের উপাসনার নামান্তর পত্নীভাবে উপাসনা—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ এবং জগতের অন্য সমস্তই নারী বা তাঁহার পত্নী। প্রাণের ব্যাকুলতা লইয়াই কথা। যে-ভাবে ভগবান্‌কে ডাকিলে যাহার হৃদয় আকুল হয়—যে দুরন্ত 'আমি'-টা আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে, যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ডাকিলে সাধক সেই মহাবল 'আমি'টাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারে, সে সাধকের পক্ষে সেই ভাবই সর্ব্বোত্তম। সহজ কথায়—যে ভাব যত বেশী ব্যাকুলতা আনিয়া দেয় সেই ভাবে উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। (১) নলিনীকান্তের হৃদয়, মন, চিন্তা—তাঁহার সর্ব্বস্ব—পত্নী সুধাংশুবালার সহিতই তখন এক হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি স্বামী পূর্ণানন্দকে বলিয়াছিলেন 'জগজ্জননীতে আমার প্রয়োজন নাই, আমি শুধু আমার সুধাংশুবালাকেই চাই।' তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তারাপীঠে তাহাই পাইলেন। এই সাধনাও মধুর ভাবেরই সাধনা।

(১) "পরমাত্মাকে পতিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করা যেরূপ মধুর ভাব, পরমাত্মাকে পত্নীরূপে উপাসনা করাও ঠিক সেইরূপ মধুর ভাব।...চণ্ডীতে শুম্ভের বাক্য হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রাণতোষিণী প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক স্থানে এইরূপ ইঙ্গিতমাত্র আছে।...যিনি আত্মা, যিনি আমার আমি, যিনি আমার সর্ব্বস্ব, যিনি না থাকিলে আমি-র অস্তিত্ব থাকে না—তাঁহাতে সকল ভাবেরই আরোপ একান্ত সম্ভব। পুত্র কিংবা কন্যা বলিয়া আত্মাকে আদর করিতে গেলে (বাৎসল্য ভাব) যেরূপ তাঁহার গৌরবের কিছুই হানি হয় না......ঠিক এই রূপই পত্নী বলিয়া—প্রিয়তমা ভার্য্যা বলিয়া সবটা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে গেলেও তাঁহার বিন্দুমাত্র মহত্ত্বের অপলাপ হয় না।"—সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য, তৃতীয় খণ্ড। সাধন-সমর আশ্রম বরাহনগর, কলিকাতা। "শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর এই সকলের মধ্যে একটা ভাব আশ্রয় না করলে তাঁকে লাভ করা যায় না।" ভক্ত বিল্বমঙ্গল তাঁর প্রেম-নায়িকা বেশ্যাকে বলিয়াছিলেন—"কি ক'রে ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়, তা তুমিই আমায় শিখিয়েছ।" —ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই সাধনার কালে নলিনীকান্ত যে ভগবান্-লাভের জন্য জানিয়া-শুনিয়া এই ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অগ্নি দহন করে ইহা না জানিয়াও অগ্নিতে হাত দিলে হাত পোড়ে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ইচ্ছা করিয়া গঙ্গায় নামিলেও গঙ্গাস্নান হয়—আবার কেহ ধাক্কা দিয়া গঙ্গায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেও সেই গঙ্গাস্নানেরই ফল হয়—ইহা গঙ্গারই মাহাত্ম্য। সুতীব্র পত্নীপ্রেম নলিনীকান্তকে সেদিন ধাক্কা দিয়াই গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিল বলিয়া তিনি সেই পত্নীর রূপে বিশ্ব-মাতাকে পাইয়াছিলেন। উপনিষৎ বলেন—"যমেবৈষবৃণুতে তেনৈব লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং"—আত্মাকে যে বরণ করে সে-ই শুধু আত্মাকে পায়, কারণ আত্মাও তখন তাঁহাকে সেইভাবে ভজনা করেন। কন্যা যেমন একান্তে পতিকে বরণ করে সেই ভাবে আত্মাকে বরণ করা চাই—নতুবা আত্মা লভ্য নহেন। যে বস্তুর প্রতি যাহার আসক্তি নাই সে তাহাকে বরণ করে না। দুই দণ্ডের জন্য প্রিয়তমকে চাওয়া এবং কাছে রাখার আকাঙ্ক্ষা এক জিনিষ আর—'হৃদয়ের মাঝে পরাণ যেখানে সেখানে লুকায়ে থোব'—এই ভাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্য জিনিষ; একটি সাধারণ কামনা মাত্র এবং অন্যটি সুগভীর সাধনা বা সুতীব্র উপাসনা। উপাসনার সাধারণ অর্থ—সর্ব্বদা নিকটে থাকা, ভগবানের সান্নিধ্য চিন্তা করা—অর্থাৎ নিয়ত স্মরণ-মনন। 'সাধনশাস্ত্র' বলেন—'সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ—"সাধন-স্মরণ লীলা" (শ্রীল নরোত্তম দাস)। নলিনীকান্তের পত্নীপ্রেম ছিল সর্ব্বদা স্মরণ-মনন রূপ সুতীব্র উপাসনা। সে উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি পরমানন্দে কর্ম্মস্থল কুমিরায় ফিরিয়া আসিলেন। আবার অখণ্ড আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কারণ মা যে আনন্দরূপিণী তুষ্টিরূপিণী—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।' পরমানন্দে দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

ইচ্ছা মাত্রেই সুধাংশুবালা বার বার আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন—হাসিতেন, কথা কহিতেন, প্রেম নিবেদন করিতেন, এক শয্যায় উপবেশন করিতেন। নলিনীকান্ত ছিলেন তখন বয়সে নবীন, প্রেমোৎসাহে প্রবীণ—তখন সাধনা করিয়া হারানিধি কুড়াইয়া পাইয়াছেন—'নিধন পাওল ধন অনেক যতনে'—সদাই মনে হয় দেখি, আবার দেখি—আবারও দেখি। এমন করিয়া ক্রোড়ে রাখি যে, হৃদয়ের ব্যবধানও যেন না থাকে—তাহা হইলে ত আর হারাইবার ভয় রহিবে না—

"কোর সুতল পিয়া অন্তরো ন দেঅ হিয়া
কে জানে কএোন দিগ গেল।"

তখন প্রতিদিন—এমন কি দিনে শতবার না দেখিতে পাইলে মনে হইত—"পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।" নলিনীকান্ত যখন পরে বৈদান্তিক স্বামী নিগমানন্দ হইয়াছিলেন তখন এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া শিষ্যদিগকে বলিতেন—'মূর্ত্তি দেখে মা ব'লে মনে হ'ত না—স্ত্রী ব'লেই মনে হ'ত। তার কাছে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব কি? লজ্জাই হ'ত, স্ত্রীর কাছে আবার তত্ত্বকথা? মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধর্‌বার জন্য ইচ্ছা হ'ত।" (১)

এই ভাবে যখন তৃষ্ণা-মাকে লইয়া, স্মৃতি-মাকে লইয়া,—ভ্রান্তি-মাকে লইয়া, তুষ্টি-মাকে লইয়া দিন যাইতেছিল (২) তখন মা তাঁহার হৃদয়ে

(১) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি—শ্রীশিশিরকুমার বসু।

(২) যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

চিন্তারূপে—জ্ঞানরূপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত করিলেন। সুধাংশুবালাব প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তাহা একদিন সহসা দূর হইয়া গেল! মন জিজ্ঞাসা করিল—নলিনীকান্ত! ভাবিতেছ কি একবার—

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ
কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পবিভাবয় সর্ব্বমসাবং
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্॥

কে তুমি—পত্নীপ্রেমোন্মত্ত যুবক নলিনীকান্ত? কোথা হইতে আসিয়াছ? যাইবেই বা কোথায়? কে তোমার পত্নী সুধাংশুবালা?

কস্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ।

ইহারই নাম আত্মজিজ্ঞাসা—ইহাকেই উপনিষৎ বলিয়াছেন—আত্মা কর্ত্তৃক বরণ। তিনি দয়া করিয়া বরণ না করিলে কে তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে? ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিতেন—'ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা কর—হে দয়াল! তোমার করের দীপটি তোমার নিজেব মুখের উপর একবার ধর, সেই আলোকে আমি তোমায় দেখি।' মা তাঁহার করধৃত জ্ঞানপ্রদীপ নিজের মুখের উপর ধরিলেন। সেই আলোকে নলিনীকান্ত দেখিলেন চিদানন্দস্বরূপিণী মা তাঁহাকে ডাকিতে-ছেন—ওরে পথ-ভোলা অবোধ, আয় রে, আয় রে—আয়।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
—শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবীদূত সংবাদঃ।

নলিনীকান্ত কুমিরা ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে মার সন্ধানে ছুটিলেন। মা যে সুধাংশুবালাব কান্তি ও মূর্ত্তি লইয়া তাঁহার অন্তরেই বিরাজ করিতেছিলেন তখনও তিনি ইহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক সুধাংশুবালার সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে সকল আসক্তিও দূর হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত প্রাণ আর্ত্তের মত কাঁদিয়া উঠিল—মা-মা-মা! কোথায় তুমি মা চেতনারূপিণী, শক্তিরূপিণী, বুদ্ধিরূপিণী—কোথায় তুমি মা ক্ষান্তিরূপিণী, শান্তিরূপিণী, শ্রদ্ধারূপিণী—কোথায় তুমি মা দয়ারূপিণী, মাতৃরূপিণী, চিতিরূপিণী—নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। ক্ষমা কর, দয়া কর—অন্ধকার গহনে পথ দেখাও মা—পথ দেখাও!

"ভোগান্ত না হ'লে ব্যাকুলতা হয় না।" সেই ভোগান্তের পর নলিনীকান্ত আত্মার সহিত পরিচিত হইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্ব্বত্যাগ কর্তে পারে, তা হ'লে সাক্ষাৎকার হ'বে। জ্ঞানপথেই থাক্, আর ভক্তি-পথেই থাক্—সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়।......যদি ব্যাকুলতা থাকে তবে ভুল-পথে গিয়ে পড়্লেও দোষ নাই। যদি ব্যাকুলতা থাকে তিনিই আবার ভাল-পথে তুলে লন।......আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জান্তে চাইবে তারই হ'বে—হ'বেই হ'বে। যে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না তারই হ'বে। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হ'লে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়। ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'লো। পূর্ব্ব দিক লাল হ'লো। তার পর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।"

বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরমার্শ উপেক্ষা করিয়া দরিদ্র নলিনীকান্ত চাকুরি পরিত্যাগ করিলেন—পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বন্ধু, একদণ্ডে সকলকে

ছাড়িলেন এবং নয়নের মণি সুধাংশুবালাকেও এক মুহূর্ত্তে বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি দেশে দেশে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী-গুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কারণ, মহাপুরুষ বামা-ক্ষ্যাপার সেই-রূপই উপদেশ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—যদি আত্মস্বরূপ জানিতে চাও তবে সন্ন্যাসী হও। আমি অবধূত। আমি তোমাকে সে সন্ন্যাসের দীক্ষা দিতে পারিব না।"

নলিনীকান্ত সর্ব্বত্যাগী হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন। নানা স্থানে নানা প্রকার সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎও ঘটিল কিন্তু মনের মত গুরু মিলিল না। দেখিলেন, গৈরিকবসন ও জটাভারে ভারতের তীর্থাদি পরিপূর্ণ বটে কিন্তু সেই সজ্জার অন্তরালে ভক্তি ও জ্ঞানের দীপ্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে-কোনও তীর্থক্ষেত্রে গেলেই সদ্‌গুরু লাভ হইবে—কিন্তু তাহা হইল না। "মানুষের কি সাধ্য, অপরকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে! ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্ত্তা। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কাণে—আর জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই; যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।"(১) যখন সময় হয় তখন সচ্চিদানন্দ গুরুরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। নলিনীকান্ত তীর্থে তীর্থে যতই বিফলমনোরথ হইতে লাগিলেন ততই গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। যেখানে ব্যাকুলতা সেখানেই সফলতা। তিনি আজমীরে সেই সফলতা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। অকস্মাৎ একদিন দেখিলেন,

(১) ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কুমিরায় বিল্বপত্রে লিখিয়া তারামন্ত্র দান করিয়াছিলেন, অদূরে একটি বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া সেই জটাজূট-মণ্ডিত তেজঃপুঞ্জকান্তি ব্রাহ্মণ শত-সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন! নলিনীকান্ত উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর পদলগ্ন হইলেন।

ইহার পর বহুদিন অতীত হইল। সেই মহাপুরুষ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর পদলগ্ন নলিনীকান্ত প্রাণান্ত গুরুসেবায় তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন—"ভুষির রুটি, খাট্টা ও মাঠা" আহার করিয়া দিনের পর দিন নানা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। গুরুর কঠোরতা যতই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতে লাগিল, তাঁহার গুরুভক্তিও ততই প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিল। গুরু শেষে প্রসন্ন হইলেন এবং নলিনীকান্তকে কৃপা করিলেন। ১৩০৯ সালের ১১ই ভাদ্র পত্নীপ্রেমোন্মত্ত নলিনীকান্তের মৃত্যু হইল এবং সেই চিতাভস্ম হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন নিগমের গূঢ় রহস্যবিদ্ শাস্ত্রজ্ঞ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী নিগমানন্দ। কিছুকাল পর গুরুর আদেশ লইয়া নিগমানন্দ ভারতের চারিধাম প্রদক্ষিণ করিবার জন্য গুরুদেবের পুষ্কর-আশ্রম ত্যাগ করিলেন। প্রথম ধাম ত্যাগক্ষেত্র বদরিকায় গমনকালে গুরু সচ্চিদানন্দও সঙ্গে ছিলেন। পার্ব্বত্যপথে চলিতে চলিতে একদিন রাত্রিতে তাঁহারা যোগিনী গৌরী-মার আশ্রমে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে আবার দুর্গম পথে শৈল হইতে শৈলান্তর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বদরিকা ও তন্নিকটবর্ত্তী দুর্গম তীর্থসমূহ দর্শন করিলেন। কঙ্করে কণ্টকে স্বামী নিগমানন্দের চরণদ্বয় তখন ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। সেদিকে তখন তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি ছায়ার ন্যায় গুরুর অনুগমন করিয়া মানসসরোবরে আসিলেন। মানসসরোবর তুষারকিরীটী হিমাচলের

বক্ষে কোহিনুর সদৃশ। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের মধ্যে নিগমানন্দ প্রতি-পাদক্ষেপে চতুর্দ্দিকে শ্রীভগবানের জীবন্ত সত্ত্বা হৃদয়ে-হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ভগবৎপ্রেমে পাগল হইয়া উঠিলেন।

মানসসরোবর হইতে প্রত্যাগমনকালে গুরু সচ্চিদানন্দ পুষ্কর-আশ্রমে রহিয়া গেলেন এবং নিতান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শিষ্যকে একে একে অবশিষ্ট তিনটি ধাম দর্শন করিবার জন্য বিদায় দিলেন। আশ্রম-প্রান্তে আসিয়া বৈদান্তিক কঠোর তপস্বী সচ্চিদানন্দ একদৃষ্টে শিষ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন একটি সঞ্চারিণী দীপশিখা পশ্চাতে অন্ধকার রাখিয়া পুরোপ্রদেশ আলোকমণ্ডিত করিতে করিতে ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে।

চারিধাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিগমানন্দ যখন পুষ্করে আসিয়া গুরুর চরণে প্রণত হইলেন তখন সেই শুষ্ক বৈদান্তিকের হৃদয়ও আনন্দে গলিয়া গেল। শিষ্য কহিলেন—'হে গুরু, আমি সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মকে বিচারের দ্বারা বুঝিয়াছি। আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন যাহা পাইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি—তাঁহার সত্ত্বায় আমার সত্ত্বাকে নিমজ্জিত করিতে পারি।'

গুরু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—'আচ্ছি বাৎ হ্যায়।' তুমি তবে অবিলম্বে কোনও যোগী-গুরুর সন্ধান কর। যোগবল ভিন্ন সত্বর সে সৌভাগ্য কাহারও ঘটে না। আমার নিজের পন্থা দুঃখবহুল ও দীর্ঘ—'যোগপ[illegible] সহজ ও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত।'

স্বামী নিগমানন্দের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল! এত কষ্টে যে ব্রহ্মবিদ্ গুরু লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় আবার বনে বনে, তীর্থে তীর্থে, পথে পথে যোগী-গুরু খুঁজিয়া বেড়াইবেন! বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে তিনি যে একটি বিন্দু সদৃশ! সেই ক্ষুদ্র বিন্দু কিরূপে সিন্ধুর

সন্ধান করিবে—পথহীন অনন্ত-পথে কেমন করিয়াই বা সে একমাত্র ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া অনিশ্চিত-মণির সন্ধানে অগ্রসর হইবে!

স্বামী সচ্চিদানন্দ শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ধ্যান-স্তিমিত-নয়ন হইলেন এবং পরক্ষণেই কহিলেন—"ভয় কি? অগ্রসর হও। যোগী-গুরু তুরন্ত মিল্ যায়ে গা।"

আবার নিগমানন্দের অনির্দ্দেশ-যাত্রা আরম্ভ হইল।

(৪)

ঘুরিতে ঘুরিতে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিগমানন্দ স্বামী দেবীতীর্থ কামাখ্যায় আসিলেন। সেখানেও যোগীগুরু মিলিল না। শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি ও কণ্টকলতাবেষ্টিত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিতে করিতে তিনি যখন পরশুরামতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—চরণ আর চলিতে চাহে না। যেদিন অতি কষ্টে ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইলেন সেদিন সত্য সত্যই চরণদ্বয় চলিতে অসম্মত হইল। প্রবল জ্বরে ও আমাশয় রোগে কাতর হইয়া তিনি বনবাসী পার্ব্বত্য-জাতির আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। সরলবিশ্বাসী পাহাড়িয়াদের ভক্তি ও প্রীতি-পূর্ণ সেবায় একমাস পর যখন নিগমানন্দ চলচ্ছক্তি ফিরিয়া পাইলেন তখন প্রাকৃতিক শৈলশোভা দেখিতে দেখিতে আপনার অজ্ঞাতে এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। যখন বুঝিলেন পর্ব্বতের শিখর হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া সন্ধ্যাদেবী তাঁহার রক্তবর্ণ চেলাঞ্চলখানির সুকোমল স্পর্শে পার্ব্বত্যভূমির বনস্পতিগুলির নিবিড় পত্রাবলী হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছেন তখন পাহাড়িয়াদিগের গ্রামে যাইবার পথ আর খুঁজিয়া পাইলেন না। অনতিবিলম্বেই বনস্থলী অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অশ্রান্ত ঝিল্লিরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল! নিগমানন্দ

সেই ছেদশূন্য অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইলেন এবং ক্ষুধিত শার্দ্দূলাদির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি উচ্চচূড় বৃক্ষে উঠিয়া সমস্ত রাত্রি ইষ্টধ্যানে কাটাইয়া দিলেন।

প্রভাতে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে একজন প্রশান্তবদন তেজঃপুঞ্জকান্তি সন্ন্যাসী! তাঁহাকে অনুগমন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলেন। বনভূমি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটি নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিলেন। উহাই ছিল সেই স্বনামখ্যাত যোগিরাজ স্বামী সুমেরদাসজির আশ্রম। জনমানবশূন্য কাননপরিবেষ্টিত সেই আশ্রমে থাকিয়া নিগমানন্দ যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধনা শেষ হইলে পর সুমেরদাসজি কহিলেন—"এখন কোনও সম্পন্ন গৃহস্থের আশ্রয়ে গিয়া বাকিটুকু সাধন কর। সে সাধনাকালে তোমার দেহকে রক্ষা করিতে পারেন এমন কোন গৃহস্থের আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন। আসামের এই বনে সে সুবিধা দেখিতেছি না।'

নিগমানন্দের আবার যাত্রা আরম্ভ হইল।

আসামের নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি বাঙ্গালার পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং ভক্তিমান্ গৃহী শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে [illegible]যোগের সাধনা আরম্ভ করিলেন। ধৌতি, বস্তি, নেতি—নৌলিকি, ত্রাটক, কপালভাতি প্রভৃতির সাধনা যখন চলিতেছিল তখন কৌতূহলী গ্রামবাসীদিগের দৃষ্টি তাঁহার উপর আসিয়া পতিত হইল। একে-একে, দুইয়ে-দুইয়ে লোকে সাধু দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। নিগমানন্দ দেখিলেন সাধনা ক্রমেই বিঘ্নসঙ্কুল হইতেছে। নিরুপায় হইয়া একদিন তিনি সারদাবাবুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কামাখ্যা

গমন মানসে গৌহাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় রাজসাহী জেলার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস গৌহাটীতে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি দেখিলেন একজন যুবক সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহের নিকট দিয়া যাইতেছেন—যেন তরুণ অরুণ উদিত হইতেছে। সে সন্ন্যাসী আবার বাঙ্গালী! যজ্ঞেশ্বর বাবু কৌতূহলী হইয়া সন্ন্যাসীকে নিজের গৃহে ডাকিয়া আনিলেন এবং কিছুক্ষণ শাস্ত্রালোচনার পরই বুঝিতে পারিলেন বয়সে নবীন হইলে কি হয়, সন্ন্যাসী জ্ঞানে অত্যন্ত প্রবীণ। যজ্ঞেশ্বর বাবু এবং তাঁহার পত্নী এই যুবক সন্ন্যাসীকে কিছুতেই অন্যত্র যাইতে দিলেন না। একজন সম্পন্ন বাঙ্গালীর আশ্রয়ে একজন বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর তপশ্চরণ আরম্ভ হইল। তপস্যা করিতে করিতে এইখানেই তাঁহার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইল—আবার এইখানেই অল্পকালমধ্যে একদিন তিনি মহাশূন্যে চিৎসত্ত্বার মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইলেন—প্রত্যক্ষ করিলেন, তিনি আদিহীন, অন্তহীন অখণ্ড চিন্মাত্র—অনন্ত জ্যোতিঃ-সমুদ্রের তিনিও একটি অংশ। ইহারই নাম—যোগিজনের পরম কামনার ধন নির্ব্বিকল্প সমাধি।

'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে জীবন্মুক্ত স্বামী নিগমানন্দ গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। মনে হইতে লাগিল সেই কারাগার ত্যাগ করিয়া স্বাধীন মুক্ত নির্ম্মল আকাশের নীচে আসিয়া তিনি এতদিনে স্বচ্ছন্দে শ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন! সেবার (১৩১২ সাল) প্রয়াগে কুম্ভস্নানের যোগ ছিল। স্বামী নিগমানন্দ পরমানন্দে কুম্ভে চলিলেন। সেই সপ্তবিংশতি মাত্র বয়সের তীব্র অগ্নিশিখাটিকে যে দেখিল সে-ই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। স্বামীজি অনায়াসে কুম্ভের সাধুমহামিলন-ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং গুরু সচ্চিদানন্দের দর্শন পাইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন—"গুরুদেব, তোমার আসন অক্ষয়

হোক্। তোমার কৃপায় দাসের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়াছে। জয় গুরু—জয় গুরু—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব।"

পরমহংস সচ্চিদানন্দ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া শিষ্যকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার করধৃত দণ্ডটি লইয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে ভাসাইয়া দিয়া কহিলেন—'নিগমানন্দ! আর তুমি দণ্ডী নও। এখন তুমি পরমহংস। কুম্ভের পরে শ্রীশ্রীগৌরীমার আশ্রমে যাইয়া প্রণাম করিয়া আইস। এখনও যে মহাবস্তু লাভ করিতে পার নাই তাহা আছে সেইখানে।'

শিষ্য যুক্তকরে কহিলেন—'কি সে মহাবস্তু প্রভু?' মনে হইল, উত্তরে শুনিলেন—সে বস্তু মহাপ্রেম। যে প্রেমে মানব দেবতা হয়, দেবতা বিভু হন সেই প্রেম—যে প্রেমে গৌরীশঙ্কর পাগল—যে প্রেমে মত্ত হইয়া বিশ্বের নারায়ণ অনন্তকাল ধরিরা যমুনাতটে বংশীবটে রাধা রাধা বলিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন—এ সেই প্রেম—যে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া একেশ্বর পরমব্রহ্ম "বহু স্যামঃ" বলিয়া বহু হইয়াছেন, বহুকে বক্ষে রাখিয়াও বিরহের আশঙ্কায় বহুর পরে বহু—তারপর আবার কতবার—দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বহুতর হইতেছেন, শ্রীশ্রীগৌরীমার কাছে সেই প্রেমের দীক্ষা লইতে যাও—মা যে তোমার জন্য দুই বাহু প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একই বহু, বহুই এক। প্রেমের প্রলেপ না দিলে বহু এক হয় না। মার কাছে সেই প্রেমের কণিকা চাহিয়া লও—সেই প্রেমে

মানবের গুরু হইতে পারিবে। তখন দেখিবে—যিনি মাতা, তিনিই দুহিতা, তিনিই বনিতা। একে তিন তিনে এক—স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু— !"

কুম্ভস্নানযোগের অবসানে পরমহংস নিগমানন্দ হিমালয়ের কুক্ষি-মধ্যে অবস্থিত মহাভাবময়ী শ্রীশ্রীগৌরীমাতার নীরব নির্জ্জন বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির আবরণের মধ্যে লুক্কায়িত শান্ত শুদ্ধ আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে ভাবলোক সম্বন্ধে কত কথাই মাতা তাঁহাকে সাদরে বুঝাইলেন। কহিলেন—"এই ভাবলোক সগুণ-নির্গুণের সন্ধি বা সংক্রমণ-স্থানে অবস্থিত। এখানে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, কান্তা ইত্যাদি জগতের সমস্ত ভাবের উৎকর্ষ হইয়া পরিস্ফুট বা মূর্ত্ত হইয়াছে। ......নিত্যে যাহা প্রতিষ্ঠিত, এ জগতে গৃহস্থধর্ম্মে তাহার আভাস বা ছায়া।......ভাবলোকে যাহা সূক্ষ্ম, এ জগতে তাহা স্থূল হইয়া অনেকটা কদর্য্য হইয়াছে। প্রেমিক ভাবুকের কাছে এই আস্তরণপট উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সুতরাং সে আর (তখন) এ জগতের লোক নয়—সে ভগবানের পরিবারভুক্ত হইয়া যায়—যেমন তোমাদের গৌরাঙ্গ হইয়াছিলেন। তাঁহার কিসের অভাব ছিল—তবু নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া নিত্যলোকের লীলারসে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।" (১)

ভাবময়ী শ্রীশ্রীগৌরীমাতার স্বল্প পরিচয় "শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি" নামক পুস্তকে আছে। সেই পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে পরমহংস নিগমানন্দ উহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতার বয়স যে কত তাহা কেহ বলিতে পারে না। তিনি "দেখিতে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের দেহের গঠনের

(১) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি—শ্রীশিশিরকুমার বসু।

ন্যায়, বয়স অনুমান ২৭।২৮।” প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার বয়স এত বেশী যে, শুনিলে বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না—হয়ত সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরেরও অধিক হইবে। যাহা হউক গৌরীমাতা কহিলেন—

“আমি তোমাকে প্রেম শিক্ষা দিব, কিন্তু তুমি কি আমায় ভালবাস্‌তে পার্‌বে? ভালবাসার ভিতর দিয়া ভিন্ন কিছু সঞ্চারিত করা যায় না। ……আমি সারা জীবনটা তোমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছি, কবে তুমি আস্‌বে। কবে এ প্রেমপ্রবাহ জগতে প্রবাহিত কর্‌বে। আজ তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। যে নর দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আর যে নারী হ্লাদিনীর স্বারূপ্য লাভ করেছে, তাদের উভয়ের মিলনে আজ এ স্থান কৈলাস বা বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়েছে।…… গৌরী আজ রাসেশ্বরীর ভাবে ভরপূর। সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়স মাত্র ১৬।১৭ বৎসর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ষোড়শীর ন্যায় অঙ্গাবয়ব লক্ষিত হইল।…… সে গৌরী আর নাই। যে রূপ যোগের কঠোর সাধনায় তাঁহার (স্বামী নিগমানন্দের) স্মৃতিপট হইতে দুই বৎসর মুছিয়া গিয়াছে, এ যে ঠাকুরের (স্বামী নিগমানন্দের) পূর্ব্বাশ্রম নলিনীকান্তের প্রাণোন্মাদকারী মনোময়ীর রূপ গৌরী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আকৃতি তাহার হইলেও তদপেক্ষা সহস্রগুণ জ্যোতির্ম্ময়ী—যেন সোহাগ-সুখের অভিমানে গরবিনী প্রেমময়ী—নয়নে মুক্তাফল ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া পড়িতেছে। জগৎ-সংসারটা যেন একটা প্রহেলিকার ন্যায় ঠাকুরের (স্বামী নিগমানন্দের) পদতল হইতে সরিয়া গেল। যেন আর কিছু নাই—শুধু ঠাকুর ও ঠাকুরাণী—ভাবে প্রেমে মাতোয়ারা। বহুদিনের পর যেন দেখা—কোন কথা নাই—চোখের জলে বেদনার বিনিময়।” (১)

(১) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি—শ্রীশিশিরকুমার বসু।

পরমহংস নিগমানন্দ চৈতন্য হারাইলেন। পরদিন যখন চৈতন্য হইল তখন তিনি প্রেমের মাতাল। টলিতে টলিতে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গগন তখন মধু হইয়াছে—পবনে তখন মধু ঝরিতেছে—ফলে মধু—ফুলে মধু—জলে মধু—স্থলে মধু—তখন সকলই হইয়াছে "মধুবাতা ঋতায়তে।" বৃক্ষের শাখায় শাখায় তখন ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত বিহগকুল কেবলই গাহিতেছে—

"প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে।
কঠিনে মেশে না সে—
মেশে রে যে তরল হ'লে।"

(৫)

প্রেমস্বপ্নাবিষ্ট পরমহংস নিগমানন্দ লোকালয়ে ফিরিলেন—আপন মনে হাসিতে-হাসিতে নাচিতে-নাচিতে গাহিতে-গাহিতে ফিরিলেন। যেদিকে চাহিলেন সেই দিকেই দেখিলেন তাঁহারই প্রেমময়ীর—মনোময়ীর হাসির জ্যোৎস্নায় সবই আলোকিত হইয়া আছে—প্রেমানুলিপ্ত কুসুম-রাশি বৃক্ষে বৃক্ষে ঝল্‌মল্ করিতেছে—প্রেম যেন জলে স্থলে, স্থাবরে জঙ্গমে মানবে মানবীতে রূপ লইয়াছে। এই ভাবসমাধির মধ্যেই তিনি বেশী ক্ষণ থাকিতেন—কখন-কখনও বা অল্প কালের জন্য বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত।

কিছুকাল পর একদিন তিনি গৌহাটী ত্যাগ করিয়া আসামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে ভাবিলেন, সংসারে যাহারা আপনাদিগকে বেশী বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক ভাবে তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া সরলপ্রাণ পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে বাস করিবেন—তাহারা হয়ত তাঁহার প্রেমোন্মত্ততাকে পাগলামী বলিয়া মার্জ্জনা করিবে। সে মত্ততাকে রোধ করিবার শক্তি ত তাঁহার ছিল না, হৃদয় যে তখন সর্ব্বদা

ভাবে ডগমগ হইয়াই থাকিত। স্বামীজির প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র তাই কোদাল-ধোয়ার হাজংদিগের পল্লীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি ক্ষুদ্র একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া হাজংদিগের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাহাড়িয়ারা জানিল এক উন্মাদ "পণ্ডিতজি" তাহাদিগের মধ্যে বাস করিতেছেন। তাহারা সেই উন্মাদকে ভয় করিত না—ভাল-বাসিত এবং ভক্তি করিত।

"এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নিভৃত টিলার উপরে বৃহৎ বিল্ববৃক্ষের নিম্নে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরটি ছিল প্রেমিকের বাসর ঘর—বাঁশের মাচার উপর কম্বল বাসর-শয্যা।···মহাভাবময়ী ঠাকুরের (স্বামী নিগমানন্দের) সম্মুখে আবির্ভূতা হইতেন অস্থিচর্ম্মময় স্থূল শরীর রচনা করিয়া। তিনি আসিতেন বিশ্বের সমস্ত প্রেম লইয়া—বিশ্বের সব হাসিরাশি অধরে ধরিয়া, বিশ্বের সব যৌবনভার বক্ষে বহন করিয়া—বিশ্বের সব কারুণ্য হৃদয়ে লইয়া শুধু ঠাকুরকে অর্ঘ্য দিতে। প্রেমিক নিভৃত পর্ণকুটীরে প্রেমিকাকে দেখিতেন আর কেবলই কাঁদিতেন।" (১)

একদিন প্রেমময়ীর আদেশ হইল, এভাবে নির্জ্জন পর্ব্বতে পার্ব্বত্য-জাতিকে অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইলে চলিবে না। এই বনের বাহিরে যে বিরাট বিশ্ব আছে সেইখানে যাইয়া অসংখ্যের মধ্যে, কোটীর মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। পরমহংস নিগমানন্দ সেই আদেশই শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, কিন্তু চিত্ত তখন বড়ই উদ্বেলিত হইয়াছিল। সর্ব্বদাই ভাবিতেছিলেন—"হায় হায়, ভগবান্ যদি প্রেমময়ীর রূপ ধারণ করিয়া স্ত্রীভাবে না আসিয়া একটি ছোট মেয়ে ভাবে আসিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে কন্যা বলিয়া বুকে লইয়া শুইয়া থাকিতাম।"

(১) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি—শ্রীশিশিরকুমার বসু।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি একদিন স্বপ্নগঠিত প্রেমময়ীকে কুটীরে রাখিয়া একবার বাহিরে গিয়াছিলেন, পুনরায় কুটীরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—সে প্রেমময়ী ত আর নাই, কম্বলের উপর শয়ানা রহিয়াছে একটি সুন্দরী বালিকা! বালিকা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তিনি তাহাকে পরম যত্নে হৃদয়ে ধরিলেন, বক্ষে করিয়া সেই মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই বালিকাটি তাঁহার বক্ষের উপরই বয়সে ও আকৃতিতে বড় হইতে আরম্ভ করিল! দেখিতে দেখিতে সে ত্রয়োদশী হইল—পরক্ষণেই সে চতুর্দ্দশী! চক্ষু পালটিতেই চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী হইয়া উঠিল—পঞ্চদশী ক্রমে ষোড়শী, সপ্তদশীরূপে তাঁহার বক্ষের উপর শোভা পাইতে লাগিল। নিগমানন্দ বিমূঢ় হইলেন। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, দেখিলেন বালিকা তাঁহার সেই বিস্মৃতা পত্নী সুধাংশুবালার মূর্ত্তি লইয়াছে!

তারপর? একি? সপ্তদশী যুবতী যে প্রৌঢ়া হইয়া উঠিল—প্রৌঢ়া দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল—সঙ্গে সঙ্গে দেহের সে লাবণ্য আর রহিল না—সে কৃষ্ণকেশের রাশি শ্বেত হইয়া উঠিল—নির্ম্মল বদনমণ্ডল ভাঙ্গিয়া গেল—কপালের চর্ম্ম বালুময় ভাগীরথীতটের মত কুঞ্চিত, তরঙ্গায়িত, শোভাহীন ও কাকপক্ষাঙ্কিত হইয়া উঠিল! পরমহংস নিগমানন্দ প্রবল একটি ধাক্কা দিয়া বৃদ্ধাকে নিজের বিস্তৃত বক্ষ হইতে নামাইয়া দিলেন। নারী ঝঙ্কারহীন হাস্যে মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার গর্ভধারিণী জননী মাণিক সুন্দরী! সমস্ত কুটীরে—কুটীরের বাহিরে নতোন্নত প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণের পরে তরঙ্গায়িত শৈল শ্রেণীতে—সর্ব্বত্র এক সঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—"মা—মেয়ে—স্ত্রী—দেহের বিকার মাত্র—তিনে এক—একে তিন।" নিগমানন্দের অন্তরের বীণা ভুবনময় গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে

লাগিল—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ॥ নমস্তস্যৈ॥ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

(৬)

পরমহংস নিগমানন্দ মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে সকল সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। মনে পড়িল সেই তান্ত্রিক তারাপীঠের মহাশ্মশানের কথা, যেদিন জগন্মাতা সাধনায় তুষ্ট হইয়া সুধাংশুবালারূপে দেখা দিয়াছিলেন। সেদিন নিগমানন্দের মন গর্ব্বে ও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল। তিনি তৎপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, জগজ্জননীকে চাহি না—সুধাংশুবালাকেই চাই! শ্মশান-সাধনার অন্তে যখন তাহাকেই পাইলেন তখন নিজের শক্তি দেখিয়া তিনি নিজেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। আবার যেদিন আজমীরের পর্ব্বতে বেদান্তের আলোকে হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেদিন দেখিলেন সবই মায়া—সবই মিথ্যা! জগজ্জননী মিথ্যা, সুধাংশুবালা মিথ্যা—জগৎও মিথ্যা! তাই যখন পুষ্করে গুরু সচ্চিদানন্দের আশ্রমে গুরুদেবের পিত্তল নির্ম্মিত নারায়ণ-বিগ্রহটি প্রতিদিন মার্জ্জনা করিতেন তখন সেই প্রকাণ্ড মিথ্যার বদনে ঘন ঘন চপেটাঘাত করিলে তবে তাঁহার তৃপ্তি হইত! মনে মনে শতবার বলিতেন—জগন্মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।

ইহার পর যখন যোগসাধনায় তৎপর হইয়া অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি লাভ করিলেন, তখন সহসা যেন একটি মনোময় জগৎ তাঁহার ভিতরে আলোক-সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল, বুঝিলেন যাহা আছে ভাণ্ডে তাহাই আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে। তাহার পর আসিল সেই দিন যেদিন গৌহাটীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যজ্ঞেশ্বর বাবুর গৃহে সাধনা করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়া গেলেন। তখন দেখিলেন, সৃষ্টিলীলা কি বিচিত্র! বুঝিলেন তান্ত্রিক সাধনায় তিনি তারাপীঠে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা মায়া নহে, মিথ্যা নহে—স্বপ্ন-কুহেলী নহে—তাহা সত্য। বুঝিলেন, পুরুষ ও

প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি এক—বুঝিলেন ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ—দুইই। বুঝিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পরপারে নিরাকার ব্রহ্মের সিংহাসন—সে ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর—বিষয়াসক্ত মন তাঁহাকে ধরিতে পারে না, জানিতে পায় না। তিনি শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর, অন্যের গোচর নহেন। তাঁহাকে লাভ করিলে যে পরমানন্দ হয় সে আনন্দ যে কেমন তাহা কেহ বলিয়া বুঝাইতে পারে না। "যে ব্রহ্মবস্তু হ'তে এই জগৎ ও জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির উদয় হয়েছে, তাঁর স্বরূপই হচ্ছে—অস্তি ভাতি প্রিয় বা সৎ চিৎ আনন্দ। যখনই আমাদের যে জিনিষের অস্তিত্ব বোধ হ'ল (অস্তি), তখনই অমনি সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিষটা আমাদের কাছে দীপ্তিমান ব'লে বোধ হ'ল (ভাতি) আর অমনি সেটা আমাদের প্রিয় বস্তু ব'লে বোধ হ'ল।" (প্রিয়)।(১)

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—"যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম। আর যখন তিনি তিন গুণের (স্বত্ত, রজঃ তমঃ) অতীত, তখন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। সাংখ্য-দর্শনের মতে পুরুষ অকর্ত্তা, কিছু করেন না। প্রকৃতিই সকল কাজ করেন। প্রকৃতির ঐ সকল কাজ পুরুষ সাক্ষী হ'য়ে দেখেন। প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে কোনও কাজ করিতে পারেন না।······ভক্তের আমি-রূপ আর্শিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তির দর্শন হয়। নির্ম্মল জলেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্ব-সূর্য্যই ব্রহ্ম-আদ্যাশক্তি। সেই প্রতিবিম্বকে ধ'রেই সত্য সূর্য্যের দিকে যেতে হয়। সগুণ ব্রহ্মই প্রার্থনা শুনেন।" তবে "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন চাই। শ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুন্‌তে হয়; তারপর মনন—অর্থাৎ, বিচার

---

(১) ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

ক'রে মনে মনে পাকা কর্‌লে। তারপর নিদিধ্যাসন—অর্থাৎ মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ ক'রে সদ্‌বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগাতে হয়। শুধু শুন্‌লে বুঝ্‌লে—কিন্তু যেটা মিথ্যা, সেটাকে ত্যাগ কর্‌তে চেষ্টা না কর্‌লে বস্তু লাভ হয় না।" (১)

পরমহংস নিগমানন্দের সাধনস্তরের শেষ স্থান ভাব। ভাবলোকে উপস্থিত হইয়া তিনি মনে প্রাণে বুঝিলেন, জগৎ মধুময়—এখানে শুধু হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ। যোগ পরমাত্মাকে দেখায়, বেদান্ত ব্রহ্মকে জানায়—দুইই জ্ঞানের পথ। "যতক্ষণ বোধ ঈশ্বর সেথা-সেথা ততক্ষণ অজ্ঞান, যখন হেথা-হেথা তখনই জ্ঞান।...আগে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে হয়, পরে তাঁর লীলা আস্বাদন।......এই দেহ-মন্দির অন্ধকারে রাখ্‌তে নাই। জ্ঞান দীপ জ্বেলে দিতে হয়। জ্ঞান দীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখনা। অজ্ঞান লোক যেন মাটীর ঘরে বাস করে—ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভেতরটা দেখ্‌তে পায়। আর জ্ঞানী ব্যক্তি সার্সির ঘরে বাস করে—ঘরের ভেতরও দেখ্‌তে পায়, আবার বাহিরের জিনিসও দেখ্‌তে পায়।" (২) ভাবলোকে প্রবেশ করিয়া নিগমানন্দ দেখিলেন—"ভক্তি দ্বারাই মাকে দর্শন হয়। সে ভক্তি এলেই মা যেমন ছেলেকে, ছেলে যেমন মাকে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসা আসে।...যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ কাঁচা ভক্তি। তাঁকে ভালবাস্‌তে পার্‌লে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভক্তির দ্বারাই সব পাওয়া যায়।...ভক্তির মানে কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায়ে—অর্থাৎ, চক্ষে তাঁর মূর্ত্তি দেখা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, হাতে তাঁর পূজা সেবা, আর কাণে তাঁর নাম-গুণকীর্ত্তন শোনা।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-সার—শ্রীকুমার কৃষ্ণ নন্দী।
(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-সার—শ্রীকুমার কৃষ্ণ নন্দী।

মনে—অর্থাৎ তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা, সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা। বাক্যে—অর্থাৎ তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন ও স্তব স্তুতি করা।......ভক্তের (তখন) একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই।......শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখ্‌লে—আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল।...ভক্ত তাঁকে ভেবে ভেবে অহং-শূন্য হ'য়ে যায়; আবার দেখে তিনিই আমি, আমিই তিনি।...প্রেম, অনুরাগ না হ'লে ভগবান্ লাভ হয় না।..আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না, তবু ভালবাসে। আর ভালবাসে বলেই দেখ্‌তে আসে। একেই বলে অকারণ ভালবাসা। ভগবানের উপর এই রকম ভালবাসা চাই। কেন ভালবাসি তা' জানিনে—ভালবাসি ব'লে ভালবাসি।" (২)

এইরূপ প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পরমহংস নিগমানন্দ লোকগুরু রূপে বাঙ্গালা দেশে অবতীর্ণ হইলেন। ত্যাগী না হইলে কেহ প্রেমিক হইতে পারে না, কারণ প্রেম তাহার দক্ষিণাস্বরূপ ষোলা আনা প্রাণকেই চায়—ষোল আনার এতটুকু কম হইলেও সে লয় না! ত্যাগ শুধু ভিতরে নহে—যেমন ভিতরে তেমনি বাহিরে—দুই দিকেই ত্যাগ প্রয়োজন। যিনি সর্ব্বত্যাগী তিনিই শুধু প্রেমিক—তাঁহার বাণীই লোকের মাননীয়, গণনীয় ও পালনীয় হয়। বাঙ্গালার নিমাই তাই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন—বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ তাই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

লোকশিক্ষক রূপে অবতীর্ণ হইয়া পরমহংস নিগমানন্দ ভক্তবৃন্দে পরিবৃত হইতে লাগিলেন। ফুল ফুটিতেই ভ্রমরকুল আপনা হইতেই আসিয়া জুটিতে লাগিল—কেহ কাহাকেও ডাকিয়া আনিল না। লোক-গুরুও কহিলেন না—'আমার নিকটে আইস, ভক্তি পাইবে, মুক্তি

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-সার—শ্রীকুমার কৃষ্ণ নন্দী। "যাঁহা প্রেম উঁহা নিয়ম নাহি, যাঁহা নিয়ম উঁহা প্রেম নাহি।"—শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি।

পাইবে—জ্ঞান পাইবে, সাধন পাইবে।' তিনি কহিলেন—যে যাহার ভাবে বিশ্বাস কর, বিশ্বাসী হইয়া অগ্রসর হও, যাহা চাহিতেছ তাহাই পাইবে। সব নদীই সাগরে যায়—সকল পথই শ্রীবিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ-তলে যাইয়া পৌঁছে। যে পথটি ধরিয়াছ তাহা ছাড়িও না। এই বিশ্বে মানুষের অপেক্ষা শক্তিশালী আর কেহ নাই। মানুষ তাহা জানে না। সেই শক্তিকে জাগ্রত করার নামই সাধনা। সে সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য যে ফুল-ফল-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যই চাই তাহা নহে—তাহার জন্য যে যম নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামই চাই তাহাও নহে—তাহার জন্য যে মৎস্য-মাংস-মদ্য-মৈথুনই চাই তাহাও নহে। চাই শুধু প্রাণ—শুধু ভাব—শুধু প্রেম। ভাবিও না, জড়ভরত হইয়া নিমীলিতনেত্রে বসিয়া থাকিলেই শ্রীভগবান্ কৃপা করিবেন। তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু বটে, কিন্তু সেই কৃপা অর্জ্জন করিতে হয়—ভিক্ষার দানের মত উহা লভ্য নহে। ভাল-বাসা, ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের দ্বারাই লোকে কৃপাসিদ্ধ হইয়াছে—অনুষ্ঠানের দ্বারা উপচারের দ্বারা কোন দিন কেহ কিছু পায় নাই।

তিনি কহিলেন—"নির্ভরতার অপেক্ষা বড় সাধনা আর নাই—কঠিন সাধনাও আর নাই। নির্ভর কর, তিনি তোমাকে আশ্রয় দিবেন। তোমরা আদর্শ আদর্শ বলিয়া অস্থির হইতেছ—কিন্তু ভাবিতেছ না যে, একই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া সকলে পথ চলিতে পারে না—যাহার যেমন মন সে সেইরূপ আদর্শ চায়। জীবন্মুক্তের উপাসনা কর। সে উপাসনা আশু ফলপ্রদ। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির চিন্তা, সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, শিক্ষা প্রভৃতি আকাশের চিত্রপটে সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত আছে। তাঁহাদিগকে মনে প্রাণে চিন্তা কর, তাহা হইলে সেই গুপ্ত রত্নরাশির তেজ তোমাদিগের অন্ধকার হৃদয়কে আলোক-সমুজ্জ্বল করিয়া দিবে—তোমরা মুহূর্ত্তে অমৃত হইয়া যাইবে। সামাজিক

জীবনের জন্য আদর্শবাদের প্রয়োজন আছে, অধ্যাত্ম-জীবনে উহার মূল্য বড়-বেশী নয়। মনে রাখিও সাধনার বাহিরের দেহটিকে যত বেশী রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিবে, উহার অন্তরটাকে ততই শূন্যগর্ভ করিয়া তুলিবে। কিন্তু তোমার একান্তই প্রয়োজন সেই অন্তরটির, বহিরাবয়বের নহে।"

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল পরমহংস নিগমানন্দ শুধু বাঙ্গালায় নহে—আসামে, উড়িষ্যায়, রাজপুতানায়, মধ্যভারতে, ইন্দোরে, গুজরাটে, বহু প্রবাসী-বঙ্গ-নরনারীর প্রাণের ঠাকুর হইয়া উঠিলেন। কোনও ভক্ত-সম্মেলনে একদিন যখন বলা হইল,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পর তিনিই বাঙ্গালার পরবর্ত্তী অবতার-পুরুষ—তখন তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"লীলা বা যুগ-প্রয়োজন অনুসারে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছা যখন মূর্ত্ত হ'য়ে স্থূলে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখনই তাঁকে অবতার বলা যায়। আর সাধারণ জীব জন্ম জন্মান্তরের কঠোর সাধনা দ্বারা শেষ জন্মে যখন পূর্ণত্ব পান তখন তাঁর ঐ বাসনা-কামনা-শূন্য শুদ্ধ আধারে জগৎগুরুর যে ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়, তাকে সদ্‌গুরু বলা যায়।······তোমাদের গুরু অবতার নন্, সদ্‌গুরু একথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।" (১) এই নিরভিমান সদ্‌গুরুকে দর্শন করিতে আসিয়া মহাপুরুষ শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দ গিরি-মহারাজ পর্য্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াছেন, ভারতমান্য ঋষিপ্রতিম বাবা গম্ভীরানাথ-জি, বড়হজের মহাপ্রভু অনন্তানন্দ-জি, নেপালী বাবা অনন্তানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ গৃহস্থ বেশধারী কৌপীনকমণ্ডলুহীন বাঙ্গালার এই ধর্ম্মগুরুকে দেখা মাত্র প্রণতি জানাইয়া সম্মান দেখাইতেন—জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, সদর-ওয়ালা মুন্সেফ, উকীল জমীদার, অধ্যাপক ও

(১) আর্য্যদর্পণ—কার্ত্তিক, ১৩৪৬।

নিরক্ষর ব্যক্তিদিগের ত কথাই ছিল না। কি করিলে স্বামী নিগমানন্দের যথোপযুক্ত সেবা হইবে ইহাই ছিল তাঁহাদিগের নিত্য কামনার বস্তু। জলের স্রোতের মত অর্থের স্রোত বহিয়া আসিত, দিনের পর দিন কর্ম্মীর দল আসিয়া আদেশের অপেক্ষায় তাঁহার শ্রীচরণতলে অপেক্ষা করিত—অর্ঘ্যভার বহিয়া কত ভক্ত-নরনারী তাঁহার মন্দিরতলে সমবেত হইত, কেহ বা নয়ননীরে ভাসিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া থাকিত।

স্বামী ভোলানন্দ গিরি-মহারাজ বলিতেন, যদি আদর্শ সন্ন্যাসী হইতে চাও তবে আগে আদর্শ গৃহী হও। স্বামী নিগমানন্দও সেই বার্ত্তাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন—"তোমরা আদর্শ গৃহী হও, ইহাই আমার কামনা। গৃহস্থ লইয়াই সমাজ। সমাজকে জাগাইতে হইলে আদর্শ-গৃহীর বিশেষ প্রয়োজন। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সমাজের সে অভাব পূরণ কর। আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ ভ্রাতার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আদর্শ-গৃহীরূপে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হও। আমিও সেই কামনা লইয়া এই গুরুগিরির অভিমান বহন করিতেছি!......আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন প্রতিষ্ঠাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন যুগে ইহা ছিল বলিয়াই তখন শান্তি, প্রীতি, আনন্দ ঘরে ঘরে ছিল, দেশ সব দিক্ দিয়া তখন শীর্ষ স্থানে গিয়াছিল। আজ তাহা নাই বলিয়াই এই অধঃপতন। প্রাচীন-ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত পথে চলিয়া আবার তোমরা আদর্শ-গৃহস্থ হও, ইহাই আমার আশা এবং আশীর্ব্বাদ। ......জীবনকে করিতে হইবে আনন্দময়, মধুময়। দুঃখে-কষ্টে রোগে-শোকে, জন্ম-মৃত্যুতে সর্ব্বাবস্থায় নিজের আনন্দ-স্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যাহারা সে জীবনের সংস্পর্শে আসিবে, তাহাদিগকেও আনন্দে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে।......সকলকে ভালবাসিয়া আনন্দ দিয়া তাহাদের জীবনকেও মধুময় করিয়া তুলিতে হইবে যে। ইহাই হইল

আদর্শ-গৃহস্থের কর্ত্তব্য। কর্ম্মফলে বিশ্বাস, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং ভগবন্নির্ভরতা আদর্শ-গৃহস্থের অঙ্গের ভূষণ। যাবতীয় কর্ম্মকে—সংসার ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যকে ভগবৎসেবারূপে গ্রহণ করাই······সাধনা।" তিনি প্রায়ই বলিতেন—"সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌযুগে।" কলিকালে সঙ্ঘশক্তি ভিন্ন কোন প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কি সংসারিক, কি সামাজিক, কি বৈষয়িক, কি আধ্যাত্মিক—সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে সঙ্ঘশক্তির উপর।······ভাব-বিনিময়, আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠন ও সঙ্ঘ-শক্তি—প্রতিষ্ঠার রসায়ন স্বরূপ।······এইজন্য যেখানেই অন্ততঃ তিনজন ভক্ত আছেন, তিনি সেইখানেই এক একটি পল্লী-সারস্বত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় নিয়মিত সাপ্তাহিক অধিবেশনে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে সুষ্ঠু আলোচনার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।······শুধু মৌখিক ভাব-প্রচারেই দেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। যাহাতে যুগ যুগ ব্যাপিয়া তাঁহার আদর্শ, উদ্দেশ্য, মতবাদ, ও ভাবধারা দেশের বুকে অবাধভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র রূপে 'আর্য্য-দর্পণ' মাসিকের প্রবর্ত্তন, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূলক 'যোগী-গুরু', 'জ্ঞানী-গুরু', 'তান্ত্রিক-গুরু' ও 'প্রেমিক-গুরু' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ-রাজির প্রণয়ন এবং তাহাদের প্রচারকেন্দ্ররূপে সেবা, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের সমবায়ে গঠিত 'সারস্বত মঠ, আশ্রম ও সঙ্ঘসমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়া······অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ষষ্টিসহস্রাধিক মুদ্রাব্যয়ে সংস্থাপিত কুতুবপুর 'শ্রীনিগমানন্দ সেবাসদন, সারস্বত বিদ্যার্থীভবন এবং সারস্বত মন্দির তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি।"

এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ বারবার বাঙ্গালার যুবকদিগকে বলিয়া গিয়াছেন—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। যদি সেই

বল চাও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। এই সুরে সুর মিলাইয়া পরমহংস নিগমানন্দও যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিয়াছেন ঃ— "আজকাল ভারতের কল্যাণার্থ ও সংস্কারের জন্য সমাজে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত।·· এ পর্য্যন্ত অনেক কথাবার্ত্তা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য এখনও আরম্ভ করা হয় নাই।...প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের মতে জীবের জন্মসংস্কারই প্রধান সংস্কার। লোক ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গার্হস্থ্যাবলম্বী হইলে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ নিশ্চয়ই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, সৎসাহসী, দীর্ঘজীবী ও ধার্ম্মিক হইবে। তাহা হইলে সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মনীতির উন্নতি—সকল উন্নতিই আপনা আপনি হইবে।...এইরূপ হইলে ক্রমে এই ভারত হইতে তমোগুণ পলায়ন করিবে এবং সত্ত্ব ও রজোভাবের আবির্ভাব হইবে, সোনার ভারত আবার সোনার ভারত হইবে—আর শ্মশানভূমি থাকিবে না। তাই বলিতেছি ছাত্র-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত -পালনই সর্ব্বরোগপ্রতিষেধক, সর্ব্বদুঃখবিমোচনের এবং ভারতের পুনরুত্থানের একমাত্র বীজমন্ত্র।...জাতীয় উন্নতি বা অবনতির মূলই ছাত্রগণ; তাহারা যেরূপ ভাবে গঠিত হইবে, জাতীয় উন্নতি বা অবনতি ঠিক সেইরূপ হইবে। অতএব, ছাত্রগণের যাহাতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই প্রধান কর্ত্তব্য।" (১)

বাঙ্গালার নিমাই ঘোষণা করিলেন—প্রেম ও নাম। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করিলেন—যত মত তত পথ, আর পরমহংস নিগমানন্দ সরস্বতী কহিলেন—কলিযুগে শঙ্করের মত ও শ্রীগৌরাঙ্গের পথ, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ ও প্রেম এবং নামই শ্রেষ্ঠ। তিনি যে সকল আশ্রম

(১) ব্রহ্মচর্য্য-সাধন—পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী।

প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন সেগুলি তাঁহার আদেশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মতের অনুবর্ত্তী। তিনি ছিলেন শৃঙ্গেরী মঠের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী সরস্বতী, সুতরাং ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যই ছিলেন তাঁহার আদর্শ। তিনি শিখাইয়া গিয়াছেন, জ্ঞানের সহিত প্রেমের বা ভক্তির সংমিশ্রণ কবিতে পারিলেই শ্রীভগবানের কৃপা সহজলভ্য হয়। তিনি শুধু প্রেমিক ছিলেন না, তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন এবং শুধু প্রেমিক ও জ্ঞানীই ছিলেন না—কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের ত্রিবেণী। কর্ম্মের অবসানে এই বাঙ্গালী পরমহংস-মহারাজ একদিন তাঁহার রোগশয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। নেত্রদ্বয় স্থির হইয়া রহিল—দেহ নিস্পন্দ হইল! সেবক-ব্রহ্মচারী উদ্বিগ্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—"ঠাকুব ' ঠাকুর— !" ঠাকুরের নয়নদ্বয় মুদিত হইয়া গেল, দিবাবসানে রক্তবর্ণ স্থলকমল যেরূপ মুদিত হয় সেইরূপ। তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন— "আর কেন ডাক! আমাকে ভেতরে ডুবে যেতে দাও!"

অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে শেল হানিয়া তিনি অখণ্ড অনন্ত জ্যোতিঃ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। হালিসহর তাঁহার নশ্বর দেহকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র হইয়া রহিল।

বাণী

১। ভগবান্ যেভাবে যেখানে রাখিবেন সেইভাবে সেখানে থাকিয়া তাঁহাকে ডাক। তাঁহার নাম কর, তাঁহার জন্য পাগল হও। তিনি আপনি সাধিয়া সাধিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। নতুবা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাঁহার সন্ধান মিলিবে না। আর তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার জয় উচ্চারণ কর; তিনি তোমার সারা হৃদয় জুড়িয়া প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীভগবান্ যাহাকে কোলে টানিয়া লইবেন, সংসার তাহাকে কোন দিনই বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

৩। কামের ছলনায়, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় যাহারা দাম্পত্যজীবন কলুষিত করে, তাহারা পশু ও সমাজের শত্রু!...বীর না হইলে সংসার করা কাপুরুষের কর্ম্ম নয়।

৪। সুখ ভোগে নাই—সুখ ত্যাগে বা যোগে। বাহ্য-বিষয় সংযোগে যে সুখ হয় তাহা আসক্তি-পাপে কলুষিত। মনের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধিই প্রকৃত নির্ম্মল ও পবিত্র সুখ।...লোকের ভালবাসায় সুখ খুঁজিলে অশান্তি সার হইবে। সুতরাং সকল বাসনা কামনা ভুলিয়া, সুখ-দুঃখ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে আত্ম-নির্ভর করিয়া থাক।

৫। ধন থাকিলে মন হয় না।

৬। কার্য্য ব্যতীত, পড়িয়া-শুনিয়া কি বিশ্বের প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া যায়? বৎস! জাগ, উঠ, কাজে লাগিয়া যাও।

৭। অধ্যাত্ম উন্নতি, শ্রীভগবান্ তথা শ্রীগুরুর কৃপাসাপেক্ষ। তপ, জপ, যোগাদি সাধন-ভজন উপলক্ষ মাত্র। তবু ইহাদের প্রয়োজন, সেই কৃপা আকর্ষণের হেতু।

৮। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের যে অবস্থা তাহাতে সাধু-বাক্য কখনই কাহারও মনঃপূত হয় না। মন যোগাইয়া কথা না বলিলে মনের মত হওয়া যায় না।

৯। যাহাতে ভাবের পরিণতি ও পরিপুষ্টি হয় কায়মনোবাক্যে তাহাই করা কর্ত্তব্য।

১০। নিজের মতলব-সিদ্ধি হইল না বলিয়া শ্রীভগবানের দয়ায়, শক্তিমত্তায় বা বিচারে সংশয় ঘোর অজ্ঞানতা মাত্র।

১১। ভগবান্ বা গুরু-কৃপা মানে ইহা নয় যে, সংসারে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বেশ আরামে দিন কয়টা কাটাইয়া দেওয়া। বিধি-নির্দ্ধারিত প্রারব্ধ ভোগ করতঃ মদন-মবণের মধ্য দিয়া হাসিমুখে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়াই যথার্থ সদ্গুরু বা ভগবানের কৃপা।

১২। বাহিরের আশা যার যত কমিয়া আসিয়াছে, সে তত ভিতরে খোঁজ আরম্ভ করিয়াছে।

১৩। মানবজীবনটা স্তর বিশেষ। মাটির ভিতর স্তরগুলি যেরূপ সজ্জিত থাকে, জীবের জীবনও তদ্রূপ। সুতরাং যখন যে স্তরের বিকাশ হইবে, তদনুযায়ী ক্রিয়াও নিশ্চয় হইবে। তুমি তাহাতে চঞ্চল হইবে কেন?

১৪। সাধন-ভজন না করিতে পারিলেও স্মরণ-মনন ছাড়িও না।

১৫। কাহারও অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিবে না—সেটা কাপুরুষের লক্ষণ। তোমরা কাহারও উদ্বেগের কারণ হইবে না। কিন্তু কেহ উদ্বিগ্ন করিলে ন্যায়পথে থাকিয়া যথাসাধ্য প্রতিকাব করিবে।

১৬। ভগবান্‌কে অনুযোগ করিও না। ক্ষুদ্র মানব তাঁহার কার্য্যের গতি কি বুঝিবে? তিনি মঙ্গলময়, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি—সমান স্নেহ।

১৭। বাহ্য দেহ দ্বারা বাহ্যিক কাজ করিবে, অন্তরে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে। অন্তরে যেন বাহ্য পদার্থের দাগ না পড়ে।

১৮। দুঃখী হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।····· যে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে দুঃখী বলিয়া জানিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ভগবানের বুকে।

১৯। প্রত্যেক বিষয়ে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব কর্‌বি, তাহা হইলে বৃহত্তে ডুবিয়া যাইবি।

২০। প্রেমের পথেই প্রেমময়কে লাভ করিতে হইবে। ব্যাকুলতাই সে পথের পাথেয়।

২১। পথের দূরত্ব দেখিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলে কখনও গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না।

২২। যেটা করা কর্ত্তব্য বুঝিবে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

২৩। সৃষ্ট বস্তু মাত্রই অপূর্ণ।......অপূর্ণ বস্তু লাভ করিয়া অভাব মিটিবে না।......যার যত অভাব কম হয়, তার তত শান্তি।

২৪। প্রবৃত্তি-স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়া রক্ষা করিতে বলিলে কেহ রক্ষা করিবে না।

২৫। কতকগুলা কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত-বিক্ষেপ বৃদ্ধি হয়।......সরল-ভাবে জপ, ধ্যান ও প্রার্থনায় মনস্কাম সিদ্ধ হইতে পারে।

২৬। আমার কত শিষ্য সংসারে বাস করিতেছে। সবাই সন্ন্যাসী হউক এই ইচ্ছা আমি করি না; বরং সংসারে রাখিতেই চেষ্টা করি।

২৭। সাংসারিক সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে ম্রিয়মাণ না হইয়া মনের সাম্যভাব রক্ষা করতঃ উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতে অভ্যাস কর।

২৮। কখনও ভুলিও না—ভগদ্ভক্তি ব্যতীত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, শারীরিক বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্তই বৃথা। কেবল আত্ম-প্রবঞ্চনা ও শঠতার পরিপোষক মাত্র।

২৯। হৃদয়ে ইষ্ট-দেবতার চিন্তা করিয়া তাঁহার চরণ লক্ষ্য পূর্ব্বক যথাসাধ্য জপ করিও।......একমাত্র মন্ত্রজপেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। নিয়মিত জপ ব্যতীত—সদা সর্ব্বদা খেতে শুতে ঘুমাইতে, চলিতে, শুচি-অশুচি সর্ব্বাবস্থায় নিঃশ্বাসের তালে তালে মন্ত্র জপ করিও।

৩০। কয়দিনের জন্য সংসার? কে কার? এই অমূল্য বাক্য কখনও ভুলিও না।

৩১। উৎসাহ, ধৈর্য্য, নিশ্চিত-বিশ্বাস সাধন-পথের একমাত্র অবলম্বন।

৩২। যেন মনে থাকে—প্রত্যেক কার্য্য ঠাকুরের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঘর-বাড়ী ইত্যাদি সব ঠাকুরের, সংসার ঠাকুরের। তোমরা সেবক মাত্র।......প্রত্যেক নিঃশ্বাস যেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়।......মায়াকে দূর করিয়া তাহাব স্থানে প্রেমেব প্রতিষ্ঠা কর।

৩৩। বিপদ্ ব্যতীত তাঁহার করুণা উপলব্ধির অবকাশ কৈ?

৩৪। সাধু ও গৃহীর একই কার্য্য, উভয়েই পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

৩৫। সাধন-ভজনে শক্তি বাড়ে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভক্তি ভিন্ন উপায় নাই।

৩৬। ভালবাসাই স্বভাব কর। পাপী, তাপী, দুঃখী, দরিদ্রকে ভালবাস—আপন ভুলিয়া পরের সেবা কর—ভগবান্ কোলে তুলিয়া লইবেন। মন্ত্র-তন্ত্র, যোগ-যাগের প্রয়োজন নাই।

৩৭। এ জগতে আমরা খাটিতে আসিয়াছি, সুতরাং রক্ত-মাংসের দেহের দ্বারা যতটা পবের কাজ করিয়া যাইতে পারি ততই মঙ্গল।

৩৮। যে পরের দুঃখ দূর করিতে চাহে না, তাহার দুঃখ কেহ দূর করে না।

৩৯। মন ও মুখে এক হওয়া প্রয়োজন, নতুবা বৃথা প্রার্থনা।......প্রার্থনার সময় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে।

৪০। প্রাণ বুঝিয়া পথ ধর।......মন যেন তোমায় প্রতারিত না করে।

৪১। সংসার-আশ্রমই জীবের উন্নতির সোপান।......মায়ের

শরণাগত হইয়া সংসার-আগুনে পুড়িতে থাক, মা-ই রাস্তা খুলিয়া দিবেন।

৪২। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অশান্তির মধ্যেও শান্তি পাওয়া যায়।

৪৩। অভিমান গেলেই দীনতা আসিবে। তখন দীনের সখা অবশ্য দেখা দিবেন।

৪৪। নিঃস্বার্থভাবে, অকপট হৃদয়ে যে-কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ তাহার সহায় হন।

৪৫। শিষ্যের প্রাণে গুরুর বিকাশ না হইলে শিষ্যত্ব বৃথা।

৪৬। ভগবান্ ন্যায়বান্ না হইয়া মাত্র দয়াবান্ হইলে জীব স্বেচ্ছায় অধঃপাতে যাইত।

৪৭। ভগবৎস্বরূপ লাভ করিতে হইলে, ভগবানের জগৎসেবার আদর্শ সাধকের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

৪৮। তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে সকল স্থানেই তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়।

৪৯। ধ্যান কালে, মূর্ত্তিপূজা করিতে পূজক ও মূর্ত্তি যেরূপ ভাবে থাকে, সেইরূপে ইষ্টমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া চিন্তা করিবে।

৫০। অন্য সাধন অপেক্ষা গৃহীর অনবরত নাম লওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে, মনে অন্য চিন্তার আদৌ অবসর থাকে না।

৫১। বিধবা হওয়া পাপ নহে, বরং পুণ্যেরই উদ্বোধন। তোমার স্বামী জগৎস্বামীতে লীন হইয়াছেন; সুতরাং জগৎস্বামীকেই স্বামী বলিয়া চিনিয়া লও, আর রক্তমাংসধারী মানবের দাসীত্ব করিও না।

৫২। নিজকে হীন বা দুর্ব্বল মনে করিও না; সর্ব্বদা ভাবিবে, তুমি ব্রহ্মময়ীর সন্তান—মায়ের ছেলে, তুমি অধম কিসে?

৫৩। গুরু ও শিব অভেদ, সুতরাং শিবকেই গুরুরূপে চিন্তা করিবে।

৫৪। যে অন্যকে ক্ষমা করিতে জানে না, সে ভগবানের নিকট ক্ষমা পাইবার যোগ্য নহে।

৫৫। কাঁদিয়া এ জগতে আসিয়াছি, কাঁদিতে হইবে; কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইব। যাহাকে যে বোঝা চাপাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা বহিতেই হইবে। তবে পরে কি হইবে তাহা ভাবিবার অবসর কৈ? কেবল বর্ত্তমান! ভূত-ভবিষ্যৎ নাই—কেবল অন্ধকার।······যে মরে তাহাকে মরিতে দাও, যে থাকে তাহাকে বুকে জড়াইয়া রাখ।

৫৬। ভক্তিই জীবনে একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু।··সর্ব্ব কামনা বাসনা একমুখী করিয়া নিয়ত 'ভক্তি দাও' 'ভক্তি দাও' রবে প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই পাইবে। (১)

(১) শ্রীমৎ পরমহংস নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজের 'পত্রাবলী' হইতে 'বাণী' সঙ্কলিত হইল।

"বাঙ্গালার ধর্ম্ম-গুরু," প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

* * * আপনার 'বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু' বইখানা আমরা পড়িয়াছি এবং পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, পুস্তকখানার একটি বিশদ সমালোচনা আমাদের পত্রিকাতে প্রকাশ করিব। কিন্তু সময়াভাবে আজ পর্য্যন্ত উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত।

আপনার রচনাভঙ্গী এতই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে পুস্তকখানা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া উহা ত্যাগ করিতে মন চায় না। ধর্ম্মগুরুগণের জীবনেতিহাস হইতেছে ধর্ম্মেরই ইতিহাস—অথচ এই নাতি বৃহৎ পুস্তকে ভারতের অলোকসামান্য পঞ্চদশজন মহাপুরুষের চরিত্রালোচনা করিতে গিয়া আপনি এতই নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন যে, কি ভাবের দিক দিয়া—কি ভাষার দিক দিয়া কোন স্থানেও এক ঘেয়ে দোষে দুষ্ট হয় নাই এবং সেইজন্যই ৪১৬ পৃষ্ঠার পুস্তকখানা পড়িতে আমরা একটুও ক্লান্তি বোধ করি নাই। এই সকল লোকোত্তর চরিত্র অবলম্বনে একখানা বৃহৎ পুস্তক রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আপনার এই পুস্তক রচিত তাহা কিন্তু তাহাতে সিদ্ধ হইত বলিয়া আমরা মনে করি না। কর্ম্মক্লান্ত ধর্ম্মপিপাসু বাঙ্গালী—যাঁহাদের সময় ও সামর্থ্যের অভাবে বৃহৎ পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার সুযোগ কোন সময়েই হইত না—তাঁহারাও অবসরের ফাঁকে আপনার এই অমূল্য পুস্তকের সাহায্যে এই সকল ভাগবৎ জীবনের রসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইবেন। ভারতের ধর্ম্মগগনে বিভিন্ন যুগে এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে কেন্দ্র করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম ও সাধন-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিলেও এই সকল ভাগবৎপুরুষগণ যে সেই এক সচ্চিদানন্দ পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্ত বিগ্রহ—তাঁহারা যে সেই সনাতন সত্যকেই নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া জগৎকল্যাণের জন্য স্ব স্ব ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন—কালের ব্যবধান ও নাম-রূপের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা যে সেই এক সনাতন

ধর্ম্মমহীরুহেরই পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা আপনার রচনাকৌশলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব যে ধর্ম্ম-সমন্বয়-বার্ত্তা এবার বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং যে সত্যকে পৃথিবীর ধর্ম্মপিপাসু জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার ভার তাঁহার পার্ষদগণের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন সেই মহান্ সত্যকে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পরিবেশন করিতে সাহায্য করিবে আপনার এই যুগোপযোগী অমূল্য পুস্তকখানা। ইহাতে দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, আর আপনিও যুগাবতারের অশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি।

আপনার 'বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আজ বিশেষ করিয়াই মনে পড়িতেছে সেই একটি দিনের কথা, যেদিন আপনি নিজে আসিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজি-মহারাজের করকমলে ধর্ম্মগুরুর প্রথমভাগখানা অর্পণ করিয়া নতি জানাইয়াছিলেন। তাঁহাকেই উৎসর্গীকৃত পুস্তকখানা—সুন্দর কাগজে ঝর্‌ঝরে ছাপা ও মনোরম বাঁধাই পুস্তকখানা হাতে করিয়া, সেদিন তিনি কতই না আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ইহার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে সেইদিন কতই না উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ড যে প্রকাশিত হইবে এবং সকলের প্রশংসা লাভ করিবে তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু বিলম্বে প্রকাশিত হইলে আপনি যে উহা প্রথম খণ্ডের মত তাঁহার শ্রীকরে অর্পণ করিয়া আবার নতি জানাইবার সে সুযোগ পাইবেন না—এই ভাবিয়াই কি তিনি সে দিন "ধর্ম্মগুরুর" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য ঐরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন? ইহার উত্তর কে দিবে? * * * ইতি।

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১০।৯।৪০

শুভাকাঙ্ক্ষী—সদ্রূপানন্দ
প্রেসিডেণ্ট্ দার্জ্জিলিং বেদান্তমঠ এবং
সম্পাদক—বিশ্ববাণী

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক সুলেখক রাজেন্দ্রলালের 'বাংলার ধর্ম্মগুরু' পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইলাম! "ধর্ম্মগুরু" সম্পর্কে লিখিতে বসিলে যে শ্রদ্ধা—যে জ্ঞান ও যে ভাষা আবশ্যক, লেখক তাহার অধিকারী। বাংলার ইতিহাস সম্যক্ বুঝিতে হইলে—বাংলার ধর্ম্ম-গুরুদের জানিতে হয়। যুগের প্রয়োজনেই ধর্ম্ম-নেতা ধর্ম্মের দিশারীসকল যুগে যুগে দেশে আবির্ভূত হন। ইহারও একটা পারম্পর্য্য আছে—আছে ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য। আজিকার দিনে যে অতীতহীন, বর্ত্তমানে শ্রদ্ধাহীন, ভবিষ্যৎ বিষয়ে অন্ধতা লইয়া নাস্তিক্যবুদ্ধি মূঢ়তার আস্ফালনকে প্রতিভার জয়যাত্রা বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাতে "বাংলার ধর্ম্মগুরু"র সন্ধান আবশ্যক। বাংলার বাঙ্গালীকে এই সকল প্রতিভাশালী মহাপুরুষ—যাঁহারা ভেদের মধ্যে নয় পরন্তু সামঞ্জস্যের মধ্যে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা জানিতে হইবে। বাঙ্গালীকে জানিব—দেশকে জানিব—অথচ জানিব না তাহার ধর্ম্ম-গুরুদের,—ইহা অজ্ঞতাবই কথা। বাংলার এই সকল ধর্ম্মগুরু ধর্ম্মকে মানুষের জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন নাই, ধম্মেব দ্বারা জীবনকে পূর্ণতর করিয়াছেন। সুপণ্ডিত লেখক রাজেন্দ্রবাবু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বাংলার ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের সাধনার স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। আমবা "ধর্ম্ম-গুরু" পাঠ করিয়া বাঙ্গালী হিসাবেও গৌরব বোধ করি। এ-দিনে এমন গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জীব মত অবস্থান করুক।

সোনার বাংলা ৯ই ভাদ্র, ১৩৪৬ সাল।

বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু প্রথম খণ্ড। কাপড়ের মজবুদ ভাল বাঁধাই। আটখানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত।......মূল্য দুই টাকা। ছাপাই কাগজ অতীব মনোরম। পাইকা হরফে ছাপা। পাঠের পক্ষে বড়ই সুকর। রঙীন মলাটাদি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।...বাংলার ঘরে ঘরে এবং বাহিরে যেখানে যেখানে বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষা- নুরাগিবৃন্দ আছেন, আশা করি সকলেই ইহার পরম সমাদর করিবেন। এ প্রকার গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন। জাতির মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য ইহা দ্বারা পরিপুষ্ট হইবে।...বৈশেষিক ভিন্ন ভারতের পঞ্চদর্শনমতেই—আপ্ত এক মস্ত প্রমাণ। সেই হিসাবেও এই সমুদয় ঋষি-চরিত্র ও সিদ্ধবচন আলোচনার সামগ্রী, নিত্য অনুধ্যেয় অনুস্মরণীয় ও সত্যলাভের বিশেষ সহায়-স্বরূপ।......সর্ব্বোপরি মুক্তকণ্ঠে বলিব সকল

জীবন-বিবরণীগুলিরই সুন্দর, সংযত ও সাবলীল সাধু ভাষা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। গ্রন্থকারের সাধু উদ্যম সফল হউক। বঙ্গসাহিত্য-দরবারে এই সুন্দর গ্রন্থকে আমরা উপসংহারে স্বাগত অভিবাদন করি।

উদ্বোধন, শ্রাবণ—১৩৪৭ সাল।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রসিদ্ধ কয়েকজন বৈষ্ণবাচার্য্য ও সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাধনার ইতিহাস বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত আরো কতিপয় বিশিষ্ট লোকগুরুর সাধন-ভজন প্রণালীর কাহিনী গ্রন্থকার সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। লিখিবার ধরণও ভাল।

প্রধানতঃ রূপ, সনাতন, জীব, নরোত্তম ঠাকুর, নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈত প্রমুখ প্রাচীন বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের লোকনাথ ব্রহ্মচারী তৈলঙ্গ স্বামী, ভোলানন্দগিরি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং সন্তদাস বাবাজী প্রমুখ সাধকবর্গের অধ্যাত্ম সাধনার বৃত্তান্ত এই পুস্তকে সুচারুরূপে আলোচিত হইয়াছে।

আনন্দবাজার ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৬ সাল।

BANGLAR DHARMA-GURU, PART I: BY RAI SAHEB RAJENDRALAL ACHARYA, B.A. *Published by Students' Library, 57/1, College Street, Calcutta. Pp. 416. Price Rs. 2.*

This is the first part of a book intended to depict the lives of those great souls whose grace and influence have built up the spiritual life of Bengal. The book opens with the life of Sri Krishna whose influence on the religious life of Bengal is inestimable. The author has quoted profusely and very aptly from the writings of Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi and others and from the sayings of Sri Ramkrishna to bring out clearly the full significance of the life and gospel of Sri Krishna. Then follow the lives of the great Vaishnava saints and devotees such as Sri Advaita, Nityananda, Haridas, Sanatan Goswami, Rupa Goswami and others who came with Sri Chaitanyya and after him and flooded the land of Bengal with